॥ বাংলা কাব্য ও সাহিত্য পরিচয় গ্রন্থমালা ।   ১ম খণ্ড
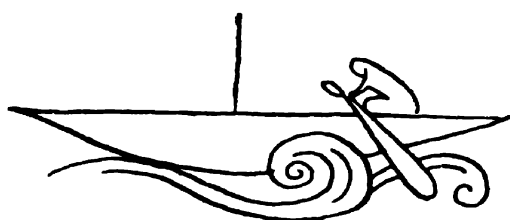
॥ চর্য্যাপদ ॥

॥ অতীন্দ্র মজুমদার ॥
অধ্যাপক : মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় : অস্ট্রেলিয়া

নয়া প্রকাশ ॥ কলিকাতা ছয়

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

বাংলা কাব্যপরিচয় গ্রন্থমালায় নাতিদীর্ঘ চারটি খণ্ডে চর্যাপদ থেকে আধুনিক বাংলাকাব্যের যে-আলোচনা করবার পরিকল্পনা নিয়েছি, তার প্রথম গ্রন্থ "চর্যাপদ" আমার দুঃসাহসী প্রকাশক বন্ধু শ্রীবারীন্দ্র মিত্রের আনুকূল্যে প্রকাশিত হল। পরবর্তী তিনটি খণ্ডে যথাক্রমে বৈষ্ণবপদাবলী ও মঙ্গলকাব্য; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবিদের বিষয়ে আলোচনা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রী এবং বাংলা কাব্য সম্পর্কে উৎসাহী সাধারণ পাঠকদের জন্যেই এই গ্রন্থমালার সব কটি খণ্ড রচিত হয়েছে ॥

চর্যাপদ বাংলাকাব্যের উষালগ্নে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছাড়া সাধারণ পাঠকের আগ্রহ এই গীতি-সমষ্টি সম্পর্কে খুব আশাব্যঞ্জক নয়। হয় নিছক ধর্মগ্রন্থ, নয় বাংলা ভাষাতত্ত্বের উপাদান—এই দুই ভাবেই চর্যাপদের বিচার এবং আলোচনা ও তার গুরুত্ব নির্ধারণ হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ বা ভাষাতত্ত্বের দিকে চর্যাপদের নিঃসংশয়ে গুরুত্ব আছে। কিন্তু চর্যাপদ তো বাংলা গীতিকাব্যেরও আদি রূপ। সেইজন্যে চর্যাপদের কাব্যমূল্য সম্বন্ধেও আমাদের ভাববার আছে, আলোচনার অবকাশ আছে। আমি আমার এই গ্রন্থে চযাপদের আধ্যাত্মিক এবং ভাষাতত্ত্বগত গুরুত্বের দিক ছাড়াও সাধারণভাবে চযাপদের কাব্যমূল্যের দিকেই ঝোঁক দিয়েছি বেশি। চর্যাগানের সংশোধিত পাঠ, পাঠান্তর, আধুনিক বাংলায় রূপান্তর, রূপকার্থ, কঠিন কঠিন কোনো কোনো শব্দের অর্থ ও টীকা এবং একটি সংক্ষিপ্ত শব্দসূচীও দিয়েছি পরিশিষ্টে—যাতে গান-গুলির সঙ্গে সাধারণ পাঠক পরিচিত হতে পারেন এবং বইটিও সম্পূর্ণ হয়। সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্যেই এই বই বলে আলোচনা যাতে নীরস না হয়ে পড়ে সেদিকেও আমার সাধ্যমত নজর রেখেছি। এখন, যাদের জন্যে এই আলোচনা তাঁরা যদি এই গ্রন্থ পড়ে প্রাচীন বাংলা কাব্য সম্পর্কে উৎসাহিত এবং আগ্রহী হন তাহলেই জানব আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ॥

তত্ত্ব এবং তথ্যের দিক দিয়ে আমি নতুন কথা কিছু বলি নি।

আমার নমস্য পূর্বসূরীরা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসু—ইত্যাদি জ্ঞানতপস্বী বিভিন্ন সময়ে চর্যাপদের যতদিকের আলোচনা করেছেন, আমি পরম শ্রদ্ধায় সেই আলোচনাগুলিকেই আমার গ্রন্থে অবলম্বন করেছি। চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য এবং চর্যাপদের অনুবৃত্তি এই দুটি অধ্যায়েই আমার নিজের কিছু কথা বিনীতভাবে বলবার চেষ্টা করেছি মাত্র। আধ্যাত্মিক অর্থ, ভাষাতত্ত্ব এসব ব্যাপারে আমার পূর্বসূরী আচার্যরা যা বলেছেন, এখনও পর্যন্ত তার বাইরে কিছু বলবার আছে বলে আমি মনে করি না। এই সব শ্রদ্ধেয় আচার্যের ঋণ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ॥

এই গ্রন্থ রচনার সময় নানাজনে নানাভাবে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, আমাকেই উপকৃত ও বাধিত করার জন্য। সামান্য ধন্যবাদে তাঁদের ঋণ শোধ হয় না। এই পরিকল্পনার প্রথম থেকেই যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত কুলভূষণ চক্রবর্তী, কবি-অগ্রজ প্রেমেন্দ্র মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর অবন্তী সান্যাল, কবি-বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আরো একজন আছেন। তিনি এই গ্রন্থের শুধু নয়, আমার সমস্ত রকম সাহিত্যকর্মের পিছনে থেকে, সাংসারিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে, নিজের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করে আমার সাহিত্যকর্মের ধারাটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে সর্বতোভাবে আমাকে দীর্ঘকাল সাহায্য করে আসছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান বাধা ॥

এই গ্রন্থের উন্নতির জন্য শ্রদ্ধেয় পাঠক-বন্ধুরা যদি তাঁদের অভিমত আমাকে জানান, কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংযোজন করবার চেষ্টা করব ॥ —অতীন্দ্র মজুমদার

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

'চর্যাপদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অনেকদিন আগেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে, কিন্তু এই বছরের গোড়ার দিকে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ফলে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ছাপার কাজ একদম বন্ধ ছিল। সেজন্যেই এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ॥

'চর্যাপদ' গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনার বই নয়; তথাপি অল্পদিনেই এর সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে, এই বইয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বাঙলাদেশের সহৃদয় পাঠকসমাজ সমর্থন করেছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছিলাম, চর্যাপদের ভাষাতত্ত্বঘটিত গুরুত্ব ছাড়াও অন্যান্য দিকের সামগ্রিক বিচারই এই বইয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সুখের কথা, সেই ধরনের বিচারের দিকে অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। আমি 'চর্যাপদ'-এ যে-ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করেছি, ইদানীং কেউ কেউ সেই-ধারায় চর্যাপদের বিচার করেছেন—সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত চর্যাপদের উপর রচিত আলোচনাগুলি তার প্রমাণ। এটাই হয়ে থাকে, এবং এটাই হওয়া উচিত। মৎপ্রণীত সামান্য গ্রন্থখানি অন্য অনেকের মনে যে নতুন ভাবে চর্যাপদ আলোচনার অথবা বহু পুরাতন বইয়ের নতুন ভাবে সম্পাদনার প্রেরণা এনে দিয়েছে—এটাই তো লেখকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ॥

ভারতবর্ষের যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা আছে সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বাঙলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ যেভাবে এই বইখানিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তা সত্যিই অভূতপূর্ব। ভারতের বাইরেও, যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-বিদ্যা (Indian Studies) বিভাগ আছে, সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ভারতীয় এবং বিদেশী অধ্যাপকও এই বইয়ের প্রতি প্রচুর সাধুবাদ বর্ষণ করেছেন। বাঙলাদেশের উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাগুলিও সমালোচনার মাধ্যমে বইটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। স্বদেশের এবং বিদেশেরও বহু ছাত্রছাত্রী চিঠিপত্র মারফৎ এই বইটি যে তাঁদের উপকারে লেগেছে—তা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়

সংস্করণের ভূমিকা লেখার সুযোগে এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ॥

এই সংস্করণে নতুন কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা যোগ করা হল। তবে তাতে আলোচনার মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় নি। প্রথম সংস্করণের মতো এই সংস্করণও পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব ॥

—অতীন্দ্র মজুমদার

॥ তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা ॥

এই বইয়ের প্রতি বহু ব্যক্তির উৎসাহ ও সমর্থনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিমধ্যে আমার অস্ট্রেলিয়া প্রবাসকালে 'চর্যাপদে'র একটি ইংরেজী সংস্করণ (The CHARYĀPADA) প্রকাশ করেছি অর্থাৎ আমার এই প্রকাশকই করেছেন।

এ বই আমি পণ্ডিতদের জন্যে লিখি নি, লিখেছিলাম সাধারণ পাঠকদের জন্যেই। তাই ইদানীংকালে এই বিষয়ে এবং ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমার মনে যে-সব নতুন প্রশ্ন জেগেছে সেগুলি এখানে যোগ না করে—এই বইয়ের আকার আগের মতোই রাখলাম।

ধন্যবাদ দিবার ব্যক্তির সংখ্যা আরও বেড়েছে। নাম না করেও তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানো রইল।

ভারতবিদ্যা বিভাগ
মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় —অতীন্দ্র মজুমদার

॥ সূচীপত্র ॥

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

—শ্রদ্ধাস্পদেষু।

॥ চর্যাপদের পরিচয় ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে একখানি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করে আনেন। এই ঘটনার দশ বছর পরে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামের ঐ পুথির বিষয়বস্তু নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে ঐ সংগ্রহ-গ্রন্থটিতে ছিল দুই ধরনের জিনিস—একটি ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ-বিষয়ক কিছু গান, অন্যগুলি দোহা। ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধগুলির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'—অর্থাৎ ধর্মসাধনার ব্যাপারে কোন্‌গুলি আচরণীয় এবং কোন্‌গুলি অনাচরণীয়, তারই নির্দেশ। দোহাগুলির রচয়িতা সরোজবজ্র এবং কৃষ্ণাচার্য। এই চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাপদ এবং বৌদ্ধ ধর্মাচার্য সরোজবজ্র এবং কৃষ্ণাচার্য রচিত দোহাগুলি একসঙ্গে একই গ্রন্থের অন্তর্গত বলে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার নাম দিয়েছেন 'বৌদ্ধগান ও দোহা'॥

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সংস্কৃত টীকাও পরে ঐ নেপালেই পাওয়া যায় এবং তার কিছুদিন পরে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদগুলির একটি তিব্বতী অনুবাদও একই দেশে আবিষ্কার করেন। চর্যাপদগুলির সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যাওয়ার পর সেগুলির মূল্য এবং প্রামাণিকতাও নিঃসংশয়ে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেল॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের যে-পুথিখানি সংগ্রহ করে আনেন, তাতে পদের সংখ্যা ছেচল্লিশটি, একটি পদ খণ্ডিত—মোট তাহলে হল সাড়ে ছেচল্লিশটি। আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের যে-তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন তাতে পদের সংখ্যা মোট একান্নটি। মনে হয়, চর্যাপদের সংখ্যা মোট একান্নটিই ছিল, পরে হয়তো কোনো কারণে তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে॥

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল থেকে একশোটি নতুন চর্যাপদ সংগ্রহ করে এনেছেন। এই চর্যাগুলির সন্ধান তিনি পান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আনন্দ

বাকের কাছ থেকে। ডক্টর বাকের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে তিনি কুড়িটি চর্যাপদ টেপ রেকর্ডারে তুলে নিয়ে আসেন। ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্যারিস থেকে ২৫.৩.৬৩ তারিখে লিখিত একটি পত্রে বলেন—

> "একটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ আছে। নেপালে মুখে মুখে বজ্রাচার্যগণ এখনও চর্যাসংগীত গান করেন। এ জাতীয় প্রায় কুড়িটি সংগীত লণ্ডন হইতে যোগাড় করিয়াছি। স্থানে স্থানে চর্যাগুলির সঙ্গে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মিলিয়া যায়। একই ভাব ও ভাষা। গানগুলিও সংগ্রহ করিয়াছি এবং সবগুলিই টেপরেকর্ড করিয়া আনিয়াছি।"

এই সংবাদ কলকাতায় এলে এখানকার পত্র-পত্রিকা মহলে কিছু উত্তেজনা এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ডঃ দাশগুপ্ত দেশে আসার পর ১৯৬৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে এই চর্যাগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করেন।

নেপালে ডক্টর দাশগুপ্ত যেসব পদের সন্ধান পান তাদের আনুমানিক সংখ্যা আড়াইশত। এদের মধ্যে বাছাই করে একশোটি চর্যাপদ তিনি যোগাড় করে এনেছেন। এগুলি এখনও মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি। তবে ডঃ দাশগুপ্তের এই সংগ্রহ সম্পর্কে যে-বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত, তাতে জানা যায়, যে-পুথিগুলি থেকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এইসব চর্যাগীতি সংগ্রহ করেছেন সেগুলির অধিকাংশই বিকৃত। বহু পাঠান্তর মিলিয়ে তিনি এগুলির মোটামুটি একটা পাঠনির্ণয় করেছেন। পুথির বহু জায়গায় 'ত' এবং 'ট' বর্গের, ও 'র' এবং 'ল'-এর মধ্যে স্থানচ্যুতি ঘটেছে। এই একশোটি পদকে সংগ্রাহক তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এর প্রথম পর্যায়ে আছে ১৯টি গান--এগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত প্রাচীন পদগুলির সমধর্মী। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রেখেছেন ৪৫টি গান, সংগ্রাহকের মতে সেগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। তবে তিনি এখনও নিশ্চিত হতে পারেন নি এগুলি কোন্ অঞ্চলে রচিত। আর বাকি ৩৬টি গানকে তিনি মনে করেন আরও পরবর্তী কালের রচনা এবং সেগুলি নেপালেই রচিত। এইগুলিতে বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত এবং নানা দেবদেবীর বর্ণনা প্রকাশিত।

এই চর্যাপদগুলি সম্পর্কে সংগ্রাহক আরও যে-সব তথ্য দিয়েছেন তাতে জানা যায়, এই গানগুলি এখন নেপালে বজ্রাচার্যরা 'নৃত্যগীত সহযোগে' নিবেদন করেন। নাচগানের সময় পুথি ব্যবহার করা হয় এবং এইরকম ব্যবহারে পুথি নষ্ট হয়ে গেলে আবার নকল করে নেওয়া হয়। এই নকল করার সময়েই মূল পাঠ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, কারণ, নকল যাঁরা করেছেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গানগুলির বিষয়গত অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই পুথিগুলি তুলট কাগজে নেপালী

অক্ষরে লিখিত, তবে লিপির ঢং অনেক ক্ষেত্রেই দেবনাগরী অক্ষরের মতো। ভাষার দিক দিয়ে কয়েকটি চর্যায় পরবর্তীকালের ব্রজবুলির বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। 'এই শ্রেণীর পদে সর্বত্রই কোমল ও মধুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পদগুলির ভাষা, শব্দচয়ন ও বিন্যাস এবং ছন্দ-কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।'

ডঃ দাশগুপ্ত এই পদগুলির মধ্যে 'বাচ্ছলী' নামে একটি দেবীর উল্লেখ একাধিকবার দেখতে পেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বাসলী' দেবীর উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন "বাসলী" শব্দটি এসেছে "বিশালাক্ষী" থেকে, আবার অন্য মতে তা এসেছে "বজ্রেশ্বরী" থেকে। ডঃ দাশগুপ্তের অনুমান এই বাচ্ছলী শব্দটি এসেছে "বৎসলা" থেকে।

এই চর্যাগুলি যতদিন না মুদ্রিত আকারে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের নিজস্ব মতামতসহ প্রকাশিত হচ্ছে ততদিন এই নব-সংগৃহীত চর্যাগুলি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা সংগত হবে না। সংবাদপত্রে এই চর্যাগুলি সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে—কেবল সেইটুকুই এখানে বলা হল। এরপর নব-আবিষ্কৃত চর্যাগুলি আমাদের সামনে এলে তার আলোচনা নিশ্চয় আমরা এই গ্রন্থে করব—কেন-না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা, বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিচার—এইসব নানা দিক থেকে এই চর্যাগীতিগুলির গুরুত্ব এবং মূল্য অসীম। এই পর্যন্ত বলে, আমরা এখন পর্যন্ত যে-সব চর্যাপদ পাওয়া গেছে সে-গুলির সাধারণ পরিচয় পাঠকদের দেব॥

চর্যাপদগুলি ধর্মাচরণের বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর রচিত হলেও মূলে সেগুলি গান এবং কাব্যাকারেই তা লিপিবদ্ধ। সুতরাং ধর্মসাধকদের কাছেও ধর্মগ্রন্থ হিসাবে তার অন্য মূল্য থাকলেও গীতিরসপিপাসু কাব্য-পাঠকদের কাছেও তার অন্য সার্থকতা এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্মাচরকরা এই চর্যাপদগুলির মধ্যে বিধৃত ধর্মোপদেশ বা ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে কী কী আচরণীয় এবং কোন্‌গুলিই বা অনাচরণীয়—সে-সম্বন্ধে কতখানি নির্দেশ পেয়েছেন বা সেই নির্দেশ শুদ্ধ চিত্তে পালন করে কতটুকু লাভবান হয়েছেন, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু কাব্য-পাঠক হিসাবে যাঁরা চর্যাপদের রস আস্বাদন করতে চেয়েছেন এবং এখনও তা করছেন—তাঁরা এর কাব্যমূল্য নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই সাধারণ পাঠকদের কাছে আজও চর্যাপদের প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ কাব্য হিসাবে, ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নয়॥

চর্যাপদের কবিতাগুলি পদ্যাকারে গ্রথিত গান, সেইজন্য চর্যাপদের অপর নাম চর্যাগান বা চর্যাগীতি। একজন কবি যেমন এই পদগুলি রচনা করেন নি, তেমনি

এক সুর এবং তালে এগুলি গেয় নয়। যে-সমস্ত পদকর্তার পদ চর্যাগীতি সংগ্রহের মধ্যে সংকলিত হয়েছে তাঁরা সবাই সিদ্ধাচার্য। মোট ২৩ জন সিদ্ধাচার্যের রচিত এক বা একাধিক পদাবলী নিয়ে চর্যাপদের সংকলন সমাপ্ত। এই তেইশ জন সিদ্ধাচার্যের কে কটি গান রচনা করেছেন তার তালিকাটি হবে এইরকম—কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য ১৩; ভুসুকুপাদ ৮; সরহপাদ ৪; কুক্কুরীপাদ ৩; লুইপাদ, শবরপাদ, শান্তিপাদ প্রত্যেকে ২টি করে এবং আর্যদেব, কঙ্কনপাদ, কম্বলাম্বর, গুণ্ডরী বা গুড্ডরীপাদ, চাটিলপাদ, জয়নন্দী, ডোম্বীপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ, তন্ত্রীপাদ, তাড়কপাদ, দারিকপাদ, ধামপাদ, গুঞ্জরীপাদ, বিরুবাপাদ, বীনাপাদ, ভদ্রপাদ, মহীধরপাদ—প্রত্যেকের একটি করে গান চর্যাপদের মধ্যে সংকলিত হয়েছে ॥

চর্যাপদ-রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের সকলের জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই সিদ্ধাচার্যরা সকলেই 'চুরাশী সিদ্ধাচার্যদের' অন্তর্ভুক্ত। আবার পদকর্তাদের নামের মিল দেখে তাঁরা-যে সবাই চুরাশী সিদ্ধাচার্যদের অন্তর্ভুক্ত—একথাও কি জোর করে বলা যাবে! শান্তিপাদ, শান্তিদেব, শান্তদেব ছিলেন তিনজন, তিনজনেই সিদ্ধাচার্য—এঁদের মধ্যে শান্তিপাদ ছিলেন রত্নাকর-শান্তি, তিনি ১৮টি তান্ত্রিক গ্রন্থ এবং 'সুখদুঃখদ্বয়-পরিত্যাগ দৃষ্টি' নামে অন্য গ্রন্থও রচনা করেছেন। তারানাথের মতে তিনি ছিলেন মগধের লোক, বিক্রমশিলা বিহারের আচার্য এবং সিংহলে কিছুদিন ধর্মপ্রচারক। অন্যদের মতে ভুসুকুপাদ ও শান্তিপাদ একই লোক। সরহপাদের জন্ম সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে, তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে ডাকিনীর গর্ভে প্রাচ্যদেশে রাজ্ঞী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কুক্কুরীপাদ ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ হন। কম্বলপাদ, কাহ্নপাদ ইত্যাদির জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সিদ্ধাচার্য শবরপাদ সম্বন্ধে অনুমান, তিনি জাতিতে শবর ছিলেন। তাঁর পদে শবর-জীবনের বর্ণনা থাকায় এই অনুমান। লুইপাদ ছিলেন দ্বারিকপাদের শিষ্য। জয়নন্দী বীনাপাদ চাটিলপাদ ইত্যাদিরও সঠিক পরিচয় এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে এইসব সিদ্ধাচার্যের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এটুকু বলা চলে, এঁরা সকলেই পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এঁরা সকলেই বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি বৌদ্ধ সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। এঁদের সাধারণ জন্ম সময় খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছেন, চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাংলা গান। মতের সমর্থনে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুও দেখিয়েছেন, চর্যাপদের ৩, ৯, ১৯, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩ সংখ্যক গানগুলিতে সহজযানী

বৌদ্ধ মতের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক বসু আরও মনে করেন, অনেকগুলি চর্যাতে মহাযানী বৌদ্ধ মতেরও প্রত্যক্ষ আলোচনা আছে। আগেই বলা হয়েছে, চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় একজন কবির লেখা কাব্যসংকলন নয়। এতে তেইশ জন সিদ্ধাচার্যের রচনা একত্রে গ্রথিত; এই সিদ্ধাচার্যরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধধর্মের নানা শাখা-প্রশাখা, নানা মত ও যানের সাধক ছিলেন। মহাযান, হীনযান, সহজযান, বজ্রযান, ইত্যাদি নানা যান এবং তন্ত্রের সাধনাও কোনো কোনো সিদ্ধাচার্য করেছেন—তাই সহজিয়া মত, তান্ত্রিক মত, বিভিন্ন যৌগিক সাধনার চর্যাও এই সংগ্রহ-গ্রন্থে সংকলিত। বৌদ্ধ ধর্মের নানা অভিব্যক্তির পরিচয় এই চর্যাপদের মধ্যে ছড়ানো আছে বলে যারা ধর্মবিষয়ে গবেষণাকারী তাঁদের কাছেও চর্যাপদের মূল্য অপরিসীম॥

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদগুলি প্রকাশিত হবার পর সেগুলির প্রামাণিকতা, ভাষাতত্ত্বঘটিত বিশেষত্ব, বিষয়গত অর্থের গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়ে যে-সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে History of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। ১৯২৬ সালে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করে সেগুলি-যে বাংলা ভাষার আদিরূপ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha। এতে তিনি চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। এরপর ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের Obscure Religious Cults and Background of Bengali Literature। এই গ্রন্থে ডঃ দাশগুপ্ত সহজযান প্রসঙ্গে চর্যাপদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Journal of the Department of Letters-এ (২৮শ খণ্ড) "দোহাকোষ" প্রকাশ করে চর্যাপদের কয়েকজন কবি ও দোহাকোষের পরিচয় দেন। ১৯৩৮ সালে ডক্টর বাগচী উক্ত জার্নালের ৩০শ খণ্ডে Materials for Critical Edition of the Old Bengali Charyapadas সংকলনে বাংলা অক্ষরে সংগৃহীত চর্যাপদ, তার সংস্কৃত অনুবাদ এবং তিব্বতী অনুবাদের উল্লেখ করেন। পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নও চর্যাপদ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেন এবং তিনি বহু প্রবন্ধে চর্যাগীতি সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য এবং তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর এইসব গবেষণার কিছু অংশ ফরাসীভাষায় অনূদিত হয়ে Journal Asiatic-এর ১৯৩৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া ডক্টর শহীদুল্লাহ্-র Buddhist Mystic Songs, ডক্টর সুকুমার সেনের "চর্যাগীতি

পদাবলী" এবং মণীন্দ্রমোহন বসুর "চর্যাপদ"—চর্যাগীতিগুলির পাঠান্তর এবং অর্থ-নির্দেশের পক্ষে ভালো বই। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের Old Bengali Language and Text। এই গ্রন্থে ডক্টর মুখোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষার শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন॥

উপরে যে-বইগুলির কথা বলা হল সেগুলি মুখ্যত চর্যাপদের ভাষা, ব্যাকরণ, পাঠান্তর, অর্থ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে রচিত। প্রধানত তার সাহিত্যমূল্য নিয়ে অর্থাৎ কাব্য হিসাবে চর্যাপদকে ধরে নিয়ে তার সাহিত্যমূল্যের সমীক্ষা বাংলা-ভাষায় ইতিপূর্বে হয় নি। আমি আমার এই গ্রন্থে সেই দিকটার উপরেই জোর দিয়েছি বেশি॥

দশম শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই বাঙলাদেশে ধর্মসংক্রান্ত পদাবলী জন-সমাজে গীত হোত, আধুনিক কালের মতো পঠিত হোত না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই রীতিই বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোত। মন্দিরা, মৃদঙ্গ, নুপূর ও চামর সহযোগে একাকী বা দলবদ্ধভাবে সমস্ত কাব্য-কবিতাই-যে গীত হোত—এই রকম কথা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ লিখে গিয়েছেন। বস্তুত আমাদের সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে দুশ বছর আগে পর্যন্ত রচিত কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করা কোনোদিনই প্রচলিত ছিল না। বৈদিক সূক্তগুলি ত্রিষ্টুভ, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্টুভ, বিরাজ ইত্যাদি নানা ছন্দে রচিত হলেও সেগুলি কখনও পাঠ করে শোনানো হোত না, গান করে শোনানো হোত। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—নানা পাঠভঙ্গি অর্থাৎ গীতিভঙ্গি সেখানে ব্যবহৃত হোত। সংস্কৃত কাব্যগুলিও গান গেয়ে শোনানো হোত, কিংবা নাটক আকারে অভিনীত হোত। এই ভারতীয় ধারাটি বিশেষভাবে বাঙলা দেশে অভিব্যক্ত হয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। কৃষ্ণরাধার লীলারসময় পদবন্ধ, কিংবা ভক্তিরসময় আত্মনিবেদনের গভীরতাময় পদাবলী—সবই গানে। প্রেমে, নামে, শ্রমে, ধর্মে—সর্বত্রই বাঙালী গীতপ্রেমিক। এই গীতধর্মী মন সবচেয়ে বিকশিত হয়েছে বাঙালী কবি রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে। ভাব এবং বাহ্যিকরূপ—দুই দিক দিয়েই চর্যাপদেও সেই আদি লক্ষণ সুস্পষ্ট। তাই মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন:

> (চর্যাপদের) গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্যাপদ। সে-কালেও সংকীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলিত।

প্রত্যেকটি চর্যাপদের মাথায় সিদ্ধাচার্যদের আর কোনো নির্দেশ থাকুক না-থাকুক—একটি নির্দেশ সুস্পষ্ট: সেটি রাগরাগিণীর উল্লেখ। মল্লার, মালশী,

বঙ্গালী, পটমঞ্জরী, গবড়া, ধনসী (ধানশ্রী ?), কামোদ—ইত্যাদি বহু পরিচিত এবং অপরিচিত রাগের উল্লেখ প্রতিটি চর্যার শুরুতেই সিদ্ধাচার্যরা দিয়েছেন। চর্যাপদে এই ধরনের রাগরাগিণীর মোট সংখ্যা ষোলটি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে পটমঞ্জরী রাগটি—এতে পদের সংখ্যা মোট বারোটি। বাকী রাগ-রাগিণীতে গেয় পদসংখ্যা সর্বনিম্ন এক থেকে চার-পাঁচ পর্যন্ত। এদের মধ্যে কতকগুলি রাগ হিন্দুস্থানী মার্গ-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলির উল্লেখ আছে মার্গসংগীতের শাস্ত্রে—কিন্তু তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারেন নি। চর্যাপদে একাধিক গানের সুর গবুড়া। এই রাগ বা রাগিণীর কোনো উল্লেখ সংগীত-শাস্ত্রে নেই। গায়ন-পদ্ধতি নিয়েও সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, চর্যাগীতিগুলি সমসাময়িক লোচন পণ্ডিতের রাগ-তরঙ্গিণী বা কিছু পরবর্তীকালের শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকরের পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হোত কি-না, বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায়, প্রতিটি গানে ধ্রুবপদ থাকায় সম্মেলক বা যৌথগান হিসাবে এগুলি গীত হোত এবং সেইদিক দিয়ে পরবর্তী কীর্তন বা বাউল গানের গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে এর মিল থাকা হয়তো সম্ভব।

সেই জন্যই পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন, চর্যাপদগুলিই বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। কথাটাকে আরেকটু বিস্তৃত করে বলা চলতে পারে, বাংলা গীতিকাব্যের আদি লক্ষণ যদি কোথাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে থাকে—তবে তা চর্যাপদে। তাই বাংলা কাব্যের উষালগ্নে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো কিরণ দিচ্ছে চর্যাপদ—এবং সেই আলোকেই উদ্ভাসিত পরবর্তী বাংলা গীতিকাব্যগুলি। এই গীতিকাব্যের ধারা বাংলা সাহিত্যে আজও অম্লান॥

॥ চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ ॥

চর্যাপদগুলি যে-সময় রচিত হয়েছে—খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী—সেই দুশ' বছর বাঙলা দেশের সামগ্রিক ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সময়। এই দীর্ঘ দুশ' বছরের ইতিহাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে—এই সময়েই পতন হয়েছে পালরাষ্ট্রের, ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য পেয়েছে সেন-বর্মন রাষ্ট্র; এবং সেন-রাজত্বকালও আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে, মুছে নিয়ে গিয়েছে বাঙালীর ইতিহাসে হিন্দু আধিপত্যের গৌরবময় তিলকচিহ্ন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আধিপত্যের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, একদিকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার; অন্যদিকে আর্যপূর্ব-সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার জীবনবিন্যাস ও জীবনাদর্শের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা; দারিদ্র্য অভাব অনশন অত্যাচার পীড়ন শোষণ; অন্যদিকে বিলাস ব্যসন কামচর্চা কাব্যানুশীলন চিত্রচর্চা; একদিকে জ্ঞানসাধনা ধর্মসাধনা কঠোর চরিত্রানুশীলন; অন্যদিকে বিশ্বাসের অভাব, মনোজগতে নৈ-রাজ্যের আবহাওয়া, মানবতাবোধে অবিশ্বাস। এই আলোড়ন উত্তেজনা সৃষ্টি রক্ষা ধ্বংস, আবার নতুন জীবনবোধ নবতর জীবনাদর্শ—সব নিয়ে উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতোই এই দুশ' বছরের বাঙলা দেশের ইতিহাস অস্থির ঘটনা-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকর্তা রাজাদের সময়ের একটি নিয়মনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল সমাজ-বিন্যাস ও শাসন-পদ্ধতি থেকে পাল-সেন-বর্মন রাজাদের রাজত্বকাল পার হয়ে তুর্কী আমলের অধ্যায়ে উত্তরণের সময়ের মধ্যবর্তী যুগসংক্রান্তি বা transition-এর সময় এই দুশ' বছর। চর্যাপদগুলি এই দুশ, বছরের বিস্তৃতিতে বিভিন্ন সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত হয়েছে বলে চর্যাপদের সামাজিক পটভূমিকা হিসাবে এই দুশ' বছরের তো বটেই, তারও আগেকার বাঙলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচিত হওয়া উচিত॥

অতি প্রাচীনকালে আর্য আমলে যখন বর্ণাশ্রম প্রথার জন্ম হয়েছিল, তখন থেকে বর্ণাশ্রম প্রথা-জাত বর্ণবিন্যাসই আমাদের সমাজবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে। পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাকেই নানাভাবে পরিবর্তিত করে, কিন্তু মূল কাঠামোটি ঠিক রেখে, ভেঙে সাজিয়ে নূতন নূতন রূপ দিয়েছিল এবং ভারতীয় সমাজের উচ্চকোটি এবং বিশেষভাবে প্রভাবশালী সমাজে

তা স্বীকৃত হয়ে প্রথমে উত্তর-ভারতে এবং ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে বিস্তৃত ও গৃহীত হয়েছিল। তাই একদিক দিয়ে বর্ণাশ্রমের সামাজিক বিস্তৃতির ইতিহাস, ভারতবর্ষে আর্য-সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস—ঐ সংস্কার ও আদর্শের মধ্যেই সর্বকালের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমস্ত অর্থ নিহিত। বর্ণাশ্রম শুধু আর্যসমাজের হিন্দুধর্মানুশীলনকারীদেরই জীবন ও সমাজের মূল ভিত্তি ছিল না, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মাচারীরা তাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও সেইভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। এই বর্ণাশ্রমগত সমাজ-বিন্যাস একদিক দিয়ে যেমন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের প্রধান বিশেষত্ব, অন্যদিক দিয়ে এমন গভীর অর্থবহ ও সর্বগ্রাসী সমাজ-ব্যবস্থাও পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। ভারতের সমস্ত প্রদেশে সমস্ত মানুষের মনে বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক সমাজ-বিন্যাসের সংস্কার আজও সুদৃঢ়। প্রাচীন বাঙলার সামাজিক ইতিহাসেও তাই এই যুগপ্রচলিত সমাজ-বিন্যাসের সংস্কার ছিল কঠোর ভিত্তির উপরে স্থাপিত॥

প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা যখন বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাসকে যুক্তি-পদ্ধতির দ্বারা বাঁধতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁরা বোধ হয় একবারও ভেবে দেখেন নি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যেই সমস্ত ভারতীয় সমাজকে বাঁধা কত কঠিন। তাঁরা হয় তো চিন্তাও করেন নি, এই চারটি প্রধান বর্ণের বাইরে কত অসংখ্য বর্ণ, জন, কোম—আবার তাদের মধ্যেও কত অগণিত স্তর-উপস্তর, শ্রেণী-গোষ্ঠী, দল-উপদল। চতুর্বর্ণের সর্বশেষ স্তর শূদ্র বলে ঢালাও ফতোয়া দিলেও চণ্ডাল, শবর, মেদ, কপালী, ব্যাধ প্রভৃতি যে অসংখ্য জন কোম এবং গোষ্ঠী ভারতের সর্বত্র নানাভাবে বিদ্যমান ছিল, তাদেরকে কীভাবে মনু-যাজ্ঞবল্ক্য থেকে পরবর্তীকালের রঘুনন্দন পর্যন্ত এক গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারেন বোঝা দুষ্কর। শুধু এই নয়। উচ্চবর্ণের এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মিলনে জাত যে-বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ এবং আরো বিচিত্র সংকরবর্ণের উদ্ভব হয়েছিল, কোন্ যুক্তি-পদ্ধতি দিয়ে তাকে একটা গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যাবে! কিন্তু এত অসংগতি এবং বর্ণাশ্রম ও চাতুর্বর্ণ্যের অলীকত্ব থাকলেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, স্মৃতিকারদের এই চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার বাস্তব সমস্যাগুলির একটা সমাধান এবং ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছিল—এবং আজও বাঙলাদেশে আদি চাতুর্বর্ণ্যের যুক্তি ও কাঠামো অনুসরণ করেই বর্ণ ব্যাখ্যা এবং হিন্দুসমাজের বিচিত্র বর্ণ উপবর্ণ ও সংকরবর্ণের সামাজিক স্থান ও মর্যাদা নির্দেশ করা হয়ে থাকে॥

সেই সঙ্গে পাঠককে একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সর্বত্র এই বর্ণ উপবর্ণ সংকরবর্ণ একরকম ছিল না, এবং সেই জন্যে এদের সঙ্গে ব্যবহার কী

রকম হলে তা শাস্ত্রসম্মত হবে এমন নির্দেশও সার্বিকভাবে কোনো স্মৃতিগ্রন্থে লেখা নেই। আবার বাঙলা দেশেও কোনো স্মৃতিগ্রন্থ অন্তত দশম-একাদশ শতকের আগে লিখিত হয়েছে—এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেজন্য বাঙলা দেশে চর্যাপদ রচিত হওয়ার আগে বর্ণবৃত্ত কেমন ছিল তা কোনো স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়ার উপায় নেই॥

সমকালীন দেশ ও সমাজের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান থেকেই আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে। চর্যাপদ এই জটিল এবং বিচিত্র সমাজ-ইতিহাসের নানা উপাদান কাব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছে॥

বহুকাল আগে থেকেই বাঙলাদেশ এবং বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভারতভূমির উত্তর অঞ্চলের আর্যদের মনে কিছুটা-বা ভীতি, কিছুটা-বা সংশয় ছিল। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে একটি পদে বলা হয়েছে, 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা'। এই পদে বঙ্গ মগধ চের এবং পাণ্ড্যকোমের লোকদের অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে বয়াংসি বা পক্ষীবিশেষাঃ বলে, তারা-যে আর্যসংস্কৃতির বাইরে এরকম সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বলে, কেউ কেউ মনে করেন। উদ্ধৃত পদটিতে এই অবজ্ঞাসূচক মনোভাব কতখানি খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের যে 'দস্যু' বলা হয়েছে—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্পে আছে—ঋষি বিশ্বামিত্র একটা ব্রাহ্মণ-বালককে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, পরে তাকে দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্যে যজ্ঞে আহুতি দেবার আয়োজন হচ্ছে দেখে তাকে যজ্ঞস্থল থেকে উদ্ধার করে আনেন। এতে বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশটি পুত্র চটে যান। তাঁদের উপর রাগ করে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দেন, তাঁদের সন্তানেরা পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে সর্বনিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয়ে জীবন যাপন করবে।—এরাই নাকি শবর, পুলিন্দ, অন্ধ্র, মূতিব, পুণ্ড্র কোমের জন্মদাতা—এরাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কথিত 'দস্যু'। মহাভারতের এক-জায়গায়, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে, বাঙলাদেশে যারা সমুদ্রতীরে বাস করত তাদের বলা হয়েছে 'ম্লেচ্ছ'। ভাগবত-পুরাণে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, যবন, খস, আভীর ইত্যাদি কোমের লোকদের বলা হয়েছে 'পাপ'। বোধায়নের ধর্মসূত্রে পাঞ্জাব (আরট্ট), উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড), দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ (সৌবীর), পূর্ব বাঙলা (বঙ্গ) প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের বলা হয়েছে 'সংকীর্ণ যোনয়ঃ', বলা হয়েছে এরা আর্যসংস্কৃতির বাইরের লোক। এইসমস্ত জায়গায় কিছুদিনের জন্যে কেউ গেলেও তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হোত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ঐ

সব সময়ে বাঙলাদেশের সঙ্গে পরিচয় হলেও এবং সময়ে সময়ে সেখানে যাতায়াত থাকলেও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের চোখে বাঙলাদেশ ও বাঙালী অবজ্ঞাত, ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত। শুধু আর্য-ব্রাহ্মণের চোখেই নয়, প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধগ্রন্থেও বাঙলাদেশ ও বাঙালীদের সম্বন্ধে এই ঘৃণা এবং অবজ্ঞা সুপরিস্ফুট। আচারঙ্গসূত্রের একটি গল্পে পথহীন রাঢ়দেশে মহাবীর জৈন এবং তাঁর শিষ্যরা বাঙালীদের হাতে উৎপীড়িত হন, তাঁদেরকে অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়—এই রকম ঘটনার বর্ণনা আছে। আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প গ্রন্থেও বাঙালীর তৎকালীন ভাষাকে বলা হয়েছে অসুর ভাষা। ব্রাহ্মণ্য, জৈন, বৌদ্ধ গ্রন্থে বাঙালীকে এই অবজ্ঞার চোখে দেখার প্রধান কারণই হচ্ছে, আর্যসংস্কৃতির সম্পূর্ণ বাইরের একটা ভাবধারা, সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণ ছিল বাঙলাদেশের আদি অধিবাসীদের মধ্যে প্রবল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর তৎকালীন পোশাক, ভাষা, খাদ্য, ধর্মীয় আদর্শ, আচার-ব্যবহার, সামাজিক গড়ন—সবই ছিল আর্য সংস্কৃতির বাইরের জিনিস। সেই আচার-আচরণগুলি আর্য সংস্কৃতির তুলনায় ভালো ছিল কি মন্দ ছিল—সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কিন্তু আর্যরা-যে নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্যের চেয়ে উন্নত এবং পবিত্র মনে করত তার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি আর্যসংস্কৃতি-বহির্ভূত কোমগুলিকে পরম উন্নাসিকতা এবং অবজ্ঞার সঙ্গে ম্লেচ্ছ, পাপ, দস্যু, অসুর ইত্যাদি বলে সম্বোধন করায়॥

কিন্তু বেশিদিন এই উন্নাসিক মনোভাব স্থায়ী হল না; কালক্রমে উত্তর-ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর পরিচয় নিবিড়তর হয়ে উঠল। নানা বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এবং অপরিচিত ও অজানিতকে জানবার আগ্রহে ও উত্তেজনায় একদিন এই ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর, দস্যু লোকদের সঙ্গে আর্যভাষাভাষী এবং আর্যসংস্কৃতির ধারক ও বাহক লোকদের মেলামেশা শুরু হল। তার ইঙ্গিত পাই রামায়ণে বর্ণিত কাশী-কোশল-মৎস্য রাজবংশগুলির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ মগধ দেশের রাজবংশগুলির অযোধ্যার রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সংবাদে; বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের বলির স্ত্রীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম—এই পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের সংবাদে; রঘুর দিগ্বিজয়ের বিবরণে; মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ, ভীমের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনায়; জৈন আচারঙ্গসূত্রে বর্ণিত মহাবীর জৈনের গল্পে; আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প গ্রন্থে বর্ণিত বাঙলাদেশে ও বাঙলাদেশ-বাসী সম্পর্কিত নানা মতামতে। এই মিলন বা ভাবের আদান-প্রদান একদিনে একই ভাবে একই নীতিতে হয় নি, হয়েছে বহুদিন ধরে বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে, ততোধিক বিচিত্র নীতির প্রেরণায়॥

আর্য এবং আদি বাঙালীর এই মিলন-মিশ্রণের ফলে বাঙলাদেশের তৎকালীন সামাজিক গড়নের মধ্যে একটা নতুন রূপান্তর দেখা দিল। আর্যদের এই মিলন ক্রিয়ায় আর অতটা দর্পিত উন্নাসিক মনোভাব রাখলে চলে না, আদি বাঙালীকে 'জাতে তুলতে' গেলে নিজেদের সমান না হলেও অন্তত কিছুটা উন্নত পর্যায়ের সামাজিক সম্মান দিতে গেলে, আদি বাঙালীদের সম্বন্ধে খানিকটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নিতে হয়। এই বিবেচনা থেকেই আর্যরা বাঙলাদেশের আদি অধিবাসীদের, যাদের একদিন বলা হোত ম্লেচ্ছ, দস্যু, পাপ, অসুরভাষাভাষী—তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে ব্রাহ্মণ, কিছু বেশি সংখ্যক লোককে ক্ষত্রিয় হিসাবে গ্রহণ করে আর্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নিল। বেশ কিছু কোম, যেমন পৌণ্ড্রক এবং কিরাত, ক্ষত্রিয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েও আর্য-সংস্কৃতিকে পুরোপুরি মেনে না চলার অপরাধে আবার পূর্ব পর্যায়ে অবনমিত হল। মনুই বলেছেন যে, পৌণ্ড্রক ও কিরাতদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনেকদিন তারা ব্রাহ্মণ-দের সংস্পর্শে আসে নি, তাদের পূজো-আর্চাও তারা গ্রহণ করে নি। এই অপরাধে তাদের শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। মনু কৈবর্তদের বলেছেন 'সংকর-বর্ণ', কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, কৈবর্তরা ব্রাহ্মণ্যসমাজের বাইরের লোক। নিশ্চয় অন্যান্য কোমদের ক্ষেত্রেও এরকম উন্নয়ন-অবনমন প্রক্রিয়া চালু হয়ে থাকবে। আর এইভাবেই শক্তির আধিপত্যেই হোক বা ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের বুলি শুনিয়েই হোক, বাঙলাদেশে আস্তে আস্তে নানা বিরোধ ও সংঘর্ষে, আবার কখনও সত্যিকার ভালোবাসা ও মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে, এক সময় উগ্র কঠোর দ্রুত প্রবাহে, কখনও বা ধীর শান্ত গতিতে আর্য-ব্রাহ্মণ্যসংস্কার ও সমাজ-বিন্যাস গড়ে উঠে; আদি বাঙালী অধিবাসীদের নিজস্ব রীতিনীতি আচারব্যবহার সামাজিক ক্রিয়াকরণকে লুপ্ত করে দেবার দিকে আর্যদের প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য-সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্যসংস্কার উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেও সম্পূর্ণভাবে বাঙলা-দেশকে কোনোদিনই গ্রাস করতে পারে নি। আজও না। এতে বাঙলাদেশের ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে এ প্রশ্ন না তুলেও বলতে পারা যায়, এই আত্ম-সচেতনতা এবং নিজস্ব বিশেষত্ব রক্ষার প্রবণতার মধ্যেই বাঙালীর প্রাণশক্তি স্ফুরিত, বাইরের ভিতরের নানা চক্রান্তেও সে অটল এবং তার সংস্কৃতিকে আঘাতে কূট কৌশলে মুছে দেওয়া বোধ হয় কোনোদিনই সম্ভব হবে না॥

সামাজিক রূপান্তরের এবং আর্য-সংস্কৃতির কিছু পরিমাণে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ব্রাহ্মণের স্থানই সমাজে সবচেয়ে উপরে নির্ধারিত হল। ব্রাহ্মণদের পদবী হিসাবে সেই সময়ে যে-কটি প্রধান ছিল

তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শর্মা, স্বামী, ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য। ব্রাহ্মণেতর উচ্চ-বর্ণদের পদবীর মধ্যে বহুল প্রচলন ছিল চন্দ্র, নাগ, দাস, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, দেব, পালিত ইত্যাদির। গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ব্যক্তির নামের শেষে দত্ত, নাগ, বর্মা, মিত্র, ঘোষ ইত্যাদি পদবীর পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি-না সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ পোষণ করেছেন। পাল-পর্বের আগে পর্যন্ত এই ছিল ব্রাহ্মণদের পদবী পরিচয়, এবং সমাজে তাঁদের স্থান ছিল ভগবানের পরেই। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, গোদান, জলদান তখন অন্য বর্ণের পক্ষে অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য ছিল। ব্রাহ্মণ্য সাধনার রূপ যদিও ছিল সর্বভূতে বিরাজমান সত্যস্বরূপকে জানবার চেষ্টা করে অমৃত হওয়ার সাধনা, কিন্তু অষ্টম-নবম-দশম শতকে বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-সাধনা পূজানুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন, যাগযজ্ঞের পৌনঃপুনিক আচরণের মধ্যে দিয়ে একটা নিছক আচারসর্বস্বতায় পরিণত হয়েছিল। এই যুগের ব্রাহ্মণ্যসংস্কার ও সংস্কৃতির পরিচয় পাই হলায়ুধ মিশ্রের ব্রাহ্মণসর্বস্বের প্রথমে আত্মপ্রশস্তিমূলক এই শ্লোক দুটিতে :

পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্ বিজয়তে ক্বচিৎ ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
ধূপঃ ক্বাপি বষট্কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ ক্বাপ্যভূদ্
অগ্নে কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি মন্মন্দিরে॥

(হলায়ুধের নিজের বাড়িতে) কোথাও কাঠের (যজ্ঞ) পাত্র (ছড়িয়ে আছে) : কোথাও বা স্বর্ণনির্মিত পাত্র। কোথাও ইন্দুধবল দুকূলবস্ত্র, কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথাও ধূপের (গন্ধময় ধূম) : কোথাও বষট্কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। (এই-ভাবে হলায়ুধের নিজের বাড়িতে) অগ্নির এবং (তাঁর নিজের) কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।*

হলায়ুধের বাড়ির এই পরিবেশই সমকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবকল্পনা॥

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে এই ব্রাহ্মণ্য ভাবপরি-মণ্ডল সম্বন্ধে বলেছেন :

> কনক-তুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান তর্পণ পূজানুষ্ঠান : শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলা-কাঙ্ক্ষা ; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ ; গোত্র প্রবর গাঞী ইত্যাদির বিশদ বিস্তৃত পরিচয়োল্লেখ ; দূর্বাতৃণ লইয়া দানকার্য

---

* দ্রষ্টব্য : "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী"—সুকুমার সেন॥

সমাপন; নীতিপাঠক শাস্ত্যাগারিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উপর রাষ্ট্রের কৃপাবর্ষণ ইত্যাদির সামাজিক ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট—সে-ইঙ্গিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রচলন এবং পাল-চন্দ্র যুগের সমন্বয় এবং সমীকরণাদর্শের বিলোপ। বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত সমন্বয় নয়, ঔদার্যময় বিন্যাস নয়; এক বর্ণ এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মন যুগের একমাত্র কামনা ও আদর্শ। সে-বর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ। সে-ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এবং সে-সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যসমাজের আদর্শ। এই কালের স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসা গ্রন্থে······ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের জয়জয়কার।···সেই আদর্শই হইল সমাজব্যবস্থার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের শীর্ষে যাঁহারা আসীন সেই রাজারা এবং রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রধানতম সমর্থক সেই ব্রাহ্মণেরা দুইয়ে মিলিয়া এই আদর্শ ও মাপকাঠি গড়িয়া তুলিলেন; পরস্পরের সহযোগিতায়, পোষকতায় ও সমর্থনে মূর্তিতে-মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্রে সর্বথা সর্বউপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠি সবলে সোৎসাহে প্রচার করিলেন।

এই সময় থেকেই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ জন্ম মৃত্যু শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা উপসীমা, প্রত্যেকের পারস্পরিক আহার বিহার, বিবাহ ব্যাপারে নানা বাধা নিষেধ—দন্তধাবন, শৌচ আচমন, স্নান, সন্ধ্যাতর্পণ আহ্নিক, যাগযজ্ঞ পূজানুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ কাল বিচার, অশৌচ, আচার প্রায়শ্চিত্ত; বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তি; কৃচ্ছ্র তপস্যা; গর্ভাধান পুংসবন থেকে আরম্ভ করে উত্তরাধিকার স্ত্রীধন সম্পত্তি বিভাগ; বিচিত্র আহারের বিধি-নিষেধ; বিচিত্র দানের বিবৃতি, দানকর্মের বিচিত্রতর বিধিনিষেধ; তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার; দৈবিক বায়বিক ও পার্থিব বিচিত্র উৎপাত; লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়; বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের নিয়ম ও কাল—এককথায় সমাজজীবনের ও ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দিকে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বজ্রকঠিন প্রভাব সুবিস্তৃত ও সুগভীর ছিল। ব্রাহ্মণবর্ণের সকলেই আবার সমান সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ-দের মধ্যেও গ্রহবিপ্র বা গণক, ভট্টব্রাহ্মণ বা ভাটবামুন, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নানা ভাগ ছিল। গ্রহবিপ্ররা পতিত বলে গণ্য হতেন—বৈদিক ধর্মে তাঁদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গণনা করে দান গ্রহণ করার জন্যে। এঁদেরই একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, যাঁদের যজ্ঞকর্মে অধিকার নেই, কারণ এঁরাই প্রথম শূদ্রের কাছ থেকে এবং শ্রাদ্ধের পর দান গ্রহণ করে-ছিলেন। ভট্ট ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে সূত পিতা এবং

বৈশ্যমাতার গর্ভে এঁদের জন্ম, অন্য লোকের যশোগান করে বেড়ানোই এঁদের জীবিকা। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সংকর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণ ছাড়া আর কারো পূজানুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ করতে পারতেন না। করলে তাঁরা যজমানের বর্ণ বা উপবর্ণ প্রাপ্ত হতেন॥

এই ব্রাহ্মণদের জীবিকা ছিল কী? ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তি ছিল ধর্মকর্মানুষ্ঠান এবং অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রাধ্যাপনা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজা রাষ্ট্র ধনী অভিজাত সম্প্রদায় প্রদত্ত দান ও দক্ষিণা হিসাবে প্রচুর টাকা পয়সা জমি জায়গার অধিকারী হতেন, রাজকর্মও কেউ কেউ করতেন। সামন্ত-সেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি এমন কৃপাবর্ষণ করেছিলেন এবং সেই কৃপায় তাঁরা এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন যে, সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীরা যাতে মুক্তা, মরকত, মণি, রূপা, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাসবীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীজ এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য চিনতে পারেন সেই জন্য একদল নাগরিক রমণীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। পাল-আমলে দর্ভপাণি কেদারমিশ্রের বংশ, বৈদ্যদেবের বংশ; বর্মনরাষ্ট্রে ভবদেব ভট্টের বংশ; সেনরাষ্ট্রে হলায়ুধের বংশ রাজকার্যও করতেন আবার অন্যদিকে শাস্ত্র পাঠন, বৈদিক যাগযজ্ঞ আচারানুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করতেন—এবং এইভাবে রাজসভায় এবং সমাজে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হতেন। ব্রাহ্মণরা যুদ্ধে নায়কত্ব করতেন, যোদ্ধার জীবিকাও গ্রহণ করতেন। আবার ভবদেবের নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা, শূদ্রের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য শিল্পবিদ্যার চর্চা করতে পারতেন না। করলে পতিত বলে তাঁদের অবজ্ঞা করা হোত। কিন্তু কৃষিকার্য করা নিষিদ্ধ ছিল না, যদিও খুব কম ব্রাহ্মণই কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করতেন. কারণ ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারে দৈহিক শ্রম এবং শ্রমজাত উৎপাদন পদ্ধতিকে মোটেই উৎসাহ দেওয়া হোত না। রাজসভায় ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্যাধ্যক্ষ, সন্ধি-বিগ্রহিক—এইসবের কাজই বেশি করতেন॥

বৌদ্ধ রাজাদের আমলেও ব্রাহ্মণের এই উচ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সম্মানের আসন সমান মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছিল। তার কারণ বৌদ্ধরা বেদ-বিরোধী হলেও আর্য-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। আর্য-ব্রাহ্মণ সংস্কারে সমাজ-সৌধের উচ্চতম শিখরে যে-ব্রাহ্মণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, হাজার হাজার বছর ধরে যে-প্রতিষ্ঠাকে সাধারণ মানুষ এবং সমাজের পরিচালকরা অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে নিতে কোনো মনস্তাত্ত্বিক বাধা আছে বলে মনে করেন নি, বৌদ্ধ রাজারা সেই

সামাজিক ঐতিহ্যের স্রোতে বাঁধ দিয়ে জনমানসকে নূতন খাতে নিয়ে যাবার স্পর্ধা বা দুঃসাহস দেখান নি। তাঁরা যুগ যুগ ধরে সর্বজনস্বীকৃত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে একটা অলঙ্ঘ্য সামাজিক বিধান বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং সেই জন্যেই বৌদ্ধ আমলে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠায় কোনো বিঘ্ন হয় নি। বৌদ্ধবিপ্লব ব্রাহ্মণ্য সমাজ-বিন্যাস কিংবা বর্ণাশ্রম রীতিকে আঘাতও করে নি, অস্বীকারও করে নি। তাই বাঙলা দেশে যখন বৌদ্ধ রাজারা দেশ শাসন করছেন, তখনও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য সমাজশাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। পাল-রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণের সম্মান সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে ছিল সর্বাগ্রে করণীয়। পরমসুগত পাল রাজ্যশাসক-বৃন্দের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা প্রথম মহীপাল বিষুবসংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গাস্নান করে একজন ভট্টব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ কামরূপের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—কামরূপের অধিবাসীরা ছিল দেবপূজক, তাদের বৌদ্ধধর্মে কোনো বিশ্বাস বা অনুরক্তি ছিল না। শত শত দেবমন্দির এবং সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-সংস্কারের অন্তর্গত জনসাধারণের দ্বারা কামরূপ ছিল বিশেষভাবে অধ্যুষিত। মুষ্টিমেয় যে-কজন বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁদের ধর্মানুষ্ঠান হোত গোপনে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকারও বলেছেন, মাৎস্য-ন্যায়ের পর গোপালের অভ্যুদয়ের সময় সমুদ্রতীর পর্যন্ত স্থান তীর্থিক-দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, বৌদ্ধ মঠগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, লোকে সেগুলির ইটকাঠ কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি করত। ছোটবড় অনেক জমিদার তখন ছিলেন ব্রাহ্মণ, এবং গোপাল নিজেও ছিলেন ব্রাহ্মণানুরক্ত। এই গেল ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বাঙলা দেশের কথা। পরবর্তীকালেও যত লিপিগত সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি সর্বত্র সেখানে ব্রাহ্মণরা ভূমিদান লাভ করছেন বৌদ্ধ রাজাদের কাছ থেকে। হরিচরিত গ্রন্থের লেখক চতুর্ভুজের পূর্বপুরুষরা বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ গ্রাম ধর্মপালের কাছ থেকে দান হিসাবে পেয়েছিলেন। রাজা শূরপাল ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেদারমিশ্রের যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত থেকে অনেকবার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নতমস্তকে যজ্ঞের শান্তিবারি গ্রহণ করেছিলেন—'তাঁর (কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলের) হোমকুণ্ডোত্থিত অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করে দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হয়ে পড়ত।'[১] রাজা মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা অনুশাসনের সাহায্যে ভগবান পট্টবুদ্ধারককে উদ্দেশ্য করে শ্রীবটেশ্বর স্বামী শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বেদব্যাসের মহাভারত পাঠ করে শোনানোর দক্ষিণা হিসাবে একটি নিষ্কর গ্রাম দান করেছিলেন।[২] কুমার-

(১) প্রথম শূরপালের বাদল প্রস্তরলিপি—Journal of the Asiatic Society of Bengal N. S. Vol. IV. Page 108.

(২) মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন—ঐ, Vol. LXXIX. Part I. Page 68.

পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব বিষুবসংক্রান্তি একাদশী তিথিতে 'ধর্মাধিকার পদাভিষিক্ত শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতের অনুরোধে তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে, 'সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ' শ্রীধর নামে 'কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য সর্বাকারতপোনিধি এবং শ্রৌতস্মার্তশাস্ত্রের গুপ্তার্থবিৎ বাগীশ' এক ব্রাহ্মণকে শাসন দ্বারা ভূমিদান করেছিলেন।* এই-সমস্ত লিপিতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী, মন্দির, ব্রাহ্মণ্যপুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প ভাবকল্পনা, এমন কি উপমা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন—এদের ভাবাকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারের ভাবাকাশ। বৌদ্ধ-যুগে বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বর্ণের সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা-যে বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল, তার আরও প্রমাণ আছে। দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ধর্মপাল 'শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে (শাস্ত্র শাসন থেকে) বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন।'[১] এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, তখন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস অনুযায়ী প্রত্যেক বর্ণের যথানির্দিষ্ট স্থান ও সীমায় সুবিন্যস্ত করে সমাজ গঠিত করা হয়েছিল। ঠিক এই রকমটিই হয়েছিল চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রের শাসনাধীনে বাঙলাদেশে। সেখানেও ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, অর্থদান, গ্রামদান অব্যাহত ছিল। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ আগেই বলেছি, এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্ধরা মনুর অনুশাসন মেনে চলতেন। সংঘারামে যে-সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে প্রব্রজ্যা নিয়ে বসবাস করতেন তাঁদের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ প্রয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না, কিন্তু যাঁরা ছিলেন গৃহী বৌদ্ধ, বা বৌদ্ধধর্মের উপাসক অথচ সংসারে সমাজে বসবাসকারী, তাঁরা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে যুগপ্রচলিত ব্রাহ্মণ্য শাসন ও বিধি মেনে চলতেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ধর্ম নিয়ে বিতর্ক করতেন সত্যি, কিন্তু বৌদ্ধ সমাজবিধি বলে নতুন কিছু তাঁরা সৃষ্টি করেন নি। তারানাথ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যের মতে তখন থেকেই বোধ হয় মহাযানী বৌদ্ধ-ধর্ম আস্তে আস্তে তন্ত্রধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল—নতুন নতুন ধর্মাদর্শ, ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপ্রকরণ ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করল—তন্ত্রধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারস্পরিক আদান-প্রদানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বহু জিনিস বৌদ্ধতন্ত্র

* বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি : Epigraphica Indica, Vol II, Page 350.
গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১২৭ ॥

(১) গৌড়লেখমালা , পৃষ্ঠা ৩৩ ॥

ধর্মে প্রবিষ্ট হল এবং এইভাবেই বোধ হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভেদ ঘুচে যেতে থাকল ॥

কিন্তু ব্রাহ্মণ যারা নয়, সমাজে উচ্চতম সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা যারা নিতান্তই জন্ম-সূত্রের জন্যই অর্জন করতে পারে নি—তারা তখন কী অবস্থায় থাকত? সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে যারা অধমসংকর বা অন্ত্যজ নাম নিয়ে বাস করত—সেই মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড় (বাউরী ?), তক্ষণকার, চর্মকার, ঘট্টজীবী (পাটনি), ডোলা-বাহী (দুলে ?), মল্ল (মালো ?) এবং আরো নীচের স্তরের অধিবাসী পুক্কস পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর—এদের জীবন ছিল চূড়ান্ত অভাব, যন্ত্রণা, বেদনা, নিঃস্বতা, শোষণ এবং নিগ্রহের জীবন্ত ইতিহাস। রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কস, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণশিল্পী, স্বর্ণকার, শৌণ্ডিক ইত্যাদির অন্নগ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ। শূদ্রের অন্নগ্রহণও ব্রাহ্মণরা কিছুতেই করতে পারবেন না, এই রকম নির্দেশ ছিল। নির্দেশ অমান্য করলে প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য বিপদে পড়লে শূদ্রের হাতে তৈলপক্ব ভর্জিত দ্রব্য, পায়স ইত্যাদি খেতে ব্রাহ্মণদের নিষেধ ছিল না—সামান্য মনস্তাপ প্রকাশ করলেই দোষ কেটে যেত। তেমনি শূদ্রের হাতে ব্রাহ্মণ বিপদের সময় জলপান করলেও খুব একটা অপরাধের চোখে দেখা হোত না। শহরের প্রান্তে টিলায় ঘর বেঁধে এই অন্ত্যজরা বাস করত। অন্ত্যজদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য, তাদের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণদের পাপ হোত। স্পর্শবিচারের নানা বিধি-নিষেধ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে উদ্ধত উগ্রতায় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল ॥

বিবাহ ব্যাপারেও ছিল নানারকমের বিধিনিষেধ। এই-সমস্ত বিধিনিষেধ নিম্ন-বর্ণের পক্ষে যতটা প্রযোজ্য ছিল, ব্রাহ্মণের বেলায় তা ছিল না। ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের যে-কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারত, কিন্তু নিম্নবর্ণের কোনো পুরুষই উচ্চবর্ণের রমণীকে বিবাহ করতে পারত না। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে ব্রাহ্মণ বিবাহ করলেও সেই স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা কোনোক্রমেই ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সমান বলে মেনে নেওয়া হোত না। জীমূতবাহন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ নিজের সঙ্গে বিবাহিত নয় এমন নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করলে, বা তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গদোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হয় না ; সেই দোষও আবার সামান্য মনস্তাপ প্রকাশ করলেই খণ্ডিত হয়। ব্যভিচারকে এইভাবে একটা নিয়মের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই বেঁধে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 'নিজের সঙ্গে বিবাহিত নয়' কথাটিকে 'অপরের সঙ্গে বিবাহিত' বলে ব্যাখ্যা করেছেন জীমূতবাহনের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ।

অর্থাৎ এর দ্বারা পরোক্ষে বলা হচ্ছে, নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করার চেয়ে অন্যের সঙ্গে বিবাহিতা নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করা ব্রাহ্মণের পক্ষে কম দোষের। কৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে ব্রাহ্মণের আচরণের একটি কৌতুককর বিবরণ পাচ্ছি এই একটি শ্লোকে :

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলাকুলা সচ্ছোত্রিয়ানাং পুন-
র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি ততোধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালক-ভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত-
স্তৎ সম্পর্কবশন্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা ॥

এর অর্থ : আমার জননী তেমন সৎকুল থেকে আসেন নি। আমি কিন্তু সৎ শ্রোত্রীয় বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেছি। তাতে আমি বাবাকে টেক্কা দিয়েছি। আমার শালার ভাগিনেয়ের কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হওয়ায় সেই সম্পর্কের জন্য প্রেয়সী হলেও গৃহিণীকে আমি ত্যাগ করেছি ॥*

বস্তুত তখনকার বাঙলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদাই এই ধরনের বিচিত্র সামাজিক অনুশাসন এবং কদাচারের জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। প্রথম প্রথম নানা ধরনের বর্ণগত বিধিনিষেধ কেবল সাধারণভাবে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই বিধিও আবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিম্নতর বর্ণের লোকদের আহার বিহার বিবাহ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে এই-সমস্ত বিধিনিষেধ সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল এবং ব্রাহ্মণের অনুকরণে অন্যান্য বর্ণ এবং জাতি নিজেদের মধ্যে এবং তাদের নিম্নতর বর্ণের লোকদের সঙ্গে তাদের আহার বিহার বিবাহ কী হবে সেই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট নিয়ম এবং প্রথা গড়ে তুলল। নবম-দশম শতাব্দীতে রচিত নানা ধরনের স্মৃতিগ্রন্থে ও সেন-বর্মন রাজত্বের বিবরণ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, ব্রাহ্মণেরা সমাজের অন্যান্য বর্ণ এবং জাতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের উচ্চমঞ্চে, কিন্তু সাধারণ লোকের ভাবনা ধারণা চিন্তা কর্মের সংস্পর্শের বাইরে। গোটা সমাজ তখন তিনটি বৃহৎ প্রাচীরের দ্বারা বিভক্ত—সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক আর সবার পিছে সবার নীচে সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দীন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দুরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর। এমন কি, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নানা মেল বন্ধন, ভৌগোলিক-বাধা, বংশ ও কুলমর্যাদাজাত বিভেদের বিধিনিষেধের গণ্ডী টানা। এর পরিণতি তাই

* ডঃ সুকুমার সেন—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ অবিশ্বাস ঘৃণা এবং অপমানের ধূমকলঙ্কে মলিন পরিবেশ সেদিন বাঙলার সমাজজীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল ॥

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজে ব্রাহ্মণের কোনো ধনোৎপাদনের ভূমিকা ছিল না। বণিকসমাজ বলে যাঁরা সমাজে স্থিত তাঁরা আবার শূদ্র; অন্ত্যজশ্রেণীর সমাজ-শ্রমিকেরা সমস্ত রকম সামাজিক সম্মান থেকে বঞ্চিত, কৃষিনির্ভর কুটিরশিল্পনির্ভর নবম-দশম শতকের বাঙলাদেশে সমাজে ধনোৎপাদনের ভূমিকা নিয়েছিল যারা, তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল কায়িক শ্রম, এবং এই কায়িক শ্রম ছিল ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিন্দিত। কিন্তু সপ্তম শতকের আগে বণিক শ্রেষ্ঠীসমাজের স্থান দেশে এতটা হীন ছিল না। নানা শিলালিপি এবং দানবিক্রয়ের পট্টোলী অনুসরণ করলে দেখা যায়, সপ্তম শতকের আগে শিল্পী বণিক ব্যবসায়ী সমাজ ছিলেন স্থানীয় অধিকরণের প্রধান সহায়ক এবং স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সংব্যবহারী। শিল্পী ধীমান, বিটপাল, মহীধর, শশিদেব, কর্ণভদ্র, তথাগতসর ইত্যাদি; বণিক বুদ্ধমিত্র, লোকদত্ত, রাণক ইত্যাদি ছাড়াও তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, তক্ষণ-সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি শিল্পী এবং তৈলিক, তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, গান্ধিকবণিক, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, ধীবর ইত্যাদি বণিক ব্যবসায়ীদের সমাজে সম্মান এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য এই তিনটিই ছিল সপ্তম শতকের পূর্বের বাঙলাদেশের ধনোৎপাদনের প্রধান নির্ভর। কৃষিও সমাজে ধনোৎপাদনের কিছুটা উপায় হিসাবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু ধনোৎপাদন এবং ধনবণ্টনের উপায় হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা ছিল শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের। অষ্টম শতক থেকে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কমে এল এবং কৃষিনির্ভরতা বৃদ্ধি পেল। বণিক ব্যবসায়ীদের সমাজে স্থানও অনেক নেমে গেল, কারণ ধনোৎপাদন এবং বণ্টনের ব্যাপারে তাঁদের আধিপত্যও আর থাকল না। এই ব্যাপারে তাঁদের আধিপত্য থাকলে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাঁদের পতিত বা সামাজিক অবনতিকরণের বিষয়ে কঠোর মনোভাব নিতে পারত না। বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবনতি এবং কৃষির ব্যাপারে বাঙালীর নির্ভরতা দেখেই বোধ হয় গোবর্ধন আচার্য শক্রধ্বজোত্থান উৎসবপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে আক্ষেপ করে বলেছেন :

তে শ্রেষ্ঠীনঃ ক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাতনাস্তাং বিধিৎসন্তি ॥

—হে শক্রধ্বজ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি

সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়! ইদানীংকালের লোকেরা তোমাকে লাঙলের ঈষ অথবা মেঢ়ি (গোরু বাঁধার গোঁজ) করতে চাচ্ছে!

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমি খুব সংক্ষেপে যেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্মে কর্মে আচারে ব্যবহারে বিবিধ বিধিনিষেধে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে নানা কদাচার ও নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিয়েছিল। বাৎস্যায়নের নাগরজীবনের আদর্শ সমগ্র বাঙলাদেশের নাগরজীবনের আদর্শ হয়ে উঠল। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে নানা সূত্রে প্রদত্ত বিবরণ থেকে তা দেখতে পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন পরিষ্কারভাবে বলেছেন, গৌড়বঙ্গের রাজান্তঃপুরে মহিলারা নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী ও দাসভৃত্যদের সঙ্গে কামচর্চা কামষড়যন্ত্র ও কামসম্ভোগ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, কামচরিতার্থতার জন্য নগরে এবং গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখা হোত এবং ছিল বাররামা ও দেবদাসী।[১] বিত্তবানদের নিজেদের ভোগের জন্য যে দাসী রাখা হোত, এবং তারা-যে অস্থাবর সম্পত্তির মতো ক্রীতবিক্রীত হোত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে একাধিক ব্যক্তি যদি একটিমাত্র দাসীর অধিকারী হন, তবে সেই দাসী-যে প্রত্যেকের ভাগ অনুযায়ী পর পর প্রত্যেকের দ্বারা সম্ভুক্ত হবেন—এ রকম নির্দেশ আছে জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" গ্রন্থে।[২] বৃহস্পতি দুটি কারণের জন্য বাঙালী দ্বিজবর্ণের নিন্দা করেছেন—প্রথম, তারা মৎস্যভোজী আর দ্বিতীয়, তাদের সমাজের রমণীরা কামপরায়ণা। বাৎস্যায়নের সময়েই শুধু নয়, পরবর্তীকালেও দেখা যাচ্ছে, বাঙলাদেশে কামবাসনা চরিতার্থতার ব্যাপারে কোনো বর্ণের মধ্যেই সংযমের আভাস মাত্র নেই। তার প্রমাণ ধোয়ীর "পবনদূত", সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" ইত্যাদি। এই দুটো কাব্যেই অতি উচ্ছ্বসিত উৎসাহের সঙ্গে সভানর্তকী ও সভানন্দিনীদের স্তবগান করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায়, সমাজে, বিশেষ করে নাগর সমাজে এবং রাজসভায়—এদের আকর্ষণ এবং প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর ছিল॥

ধর্মের নামে যৌন-অনাচারও অষ্টম শতক থেকে বাঙলা দেশে উৎসাহ পেয়ে আসছে। কল্হনের "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে কমলা নামে পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো মন্দিরের প্রধানা দেবদাসীর কথা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] এই নর্তকী কমলা ছিলেন

(১) বাৎস্যায়ন—কামসূত্রম্—৫।৬।৩৮; ৫।৬।৪১; ৬।৪।৯; ৬।৫।৩৩॥

(২) জীমূতবাহন—দায়ভাগ—Ed. and Translated by Colebrooke, Page 7, 105, 148, 149.

(৩) রাজতরঙ্গিণী, ৪।৩৩২, ৪।৪২২॥

নৃত্য গীত বাদ্য ইত্যাদিতে বিশেষভাবে নিপুণা। অবশ্য দেবদাসীরা সবাই ছিলেন এই-সমস্ত গুণে পারদর্শিনী, কিন্তু কল্‌হন বলেছেন, এঁদের মধ্যে কমলা ছিলেন সকলের সেরা। দেবদাসীরা দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত হলেও আসলে তাঁরা ছিলেন পবনদূতে উল্লিখিত বাররামা বা দেববারবণিতা। পরবর্তীকালে এই দেববারবণিতারা স্পষ্টতই সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের কামনা এবং বাসনাপূরণের সঙ্গিনীতে পরিণত হয়েছিলেন। নতুবা ধোয়ী, সন্ধ্যাকর নন্দী, ভবদেব ভট্ট ইত্যাদি কবি এঁদের বিলাসলাস্য, সৌন্দর্যলীলা, বিচিত্র কামকলাভিজ্ঞতার ছন্দালংকারময় প্রশস্তি গান রচনা করতেন না। ভবদেব ভট্ট এই বাররামাদের প্রশস্তি গেয়ে বলেছেন, 'বিষ্ণুমন্দিরে উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসী যেন কামদেবতাকে আবার উজ্জীবিত করে তুলেছেন, তাঁরা যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সংগীত লাস্য এবং সৌন্দর্যের সভামন্দির!' শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়ে দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে একটা নৃত্যগীতবহুল উৎসবের প্রচলনের কথা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।* এই উৎসবের সময় গ্রামে নগরে নরনারীরা সামান্য গাছের পাতার পোশাক পরিধান করে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণের ছলনায় সারা গায়ে কাদা পাক মেখে নানারকম যৌনক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গী এবং কুৎসিত ভাষায় অশ্লীল যৌনবিষয়ক গান গেয়ে গেয়ে উন্মত্তের মতো নৃত্য করত। এই রকম না করলে না-কি দেবী দুর্গা তুষ্ট হবেন না—এই ছিল সমস্ত লোকের বিশ্বাস। এই রকম আচরণ করলে না-কি দেবীর সুখ উৎপন্ন হবে—এই নির্দেশ আছে "বৃহদ্ধর্মপুরাণে"। বসন্তকালে হোলী উৎসবের সময় এই রকম যৌন অঙ্গভঙ্গী এবং অশ্লীল নৃত্যগীত করলে কামদেবতা প্রীত হবেন এবং ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে—এই রকম বলা হয়েছে "কালবিবেক" গ্রন্থে॥

রাজসভায় যৌন-অনাচার যখন রাজা এবং সভাসদ্‌দের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত, সমাজের সর্বস্তরে তা কালক্রমে পরিব্যাপ্ত হবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। যৌন-অনাচার উচ্চ স্তরের লোকেরা করলে শাস্তি পেতে হোত খুব কম ক্ষেত্রেই। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী" গ্রন্থে "শেক শুভোদয়া" থেকে একটি কাহিনী তুলে দিয়েছেন। এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়, ক্ষমতাশালী রাজপুরুষরা যৌনাপরাধ করলে কীভাবে তাকে ক্ষমার চোখে দেখা হোত। লক্ষ্মণ সেনের এক শ্যালক, রাজমহিষী বল্লভার ভাই কুমার দত্ত, মাধবী নামে এক বণিক-বধূকে ধর্ষণ করবার চেষ্টায় মাধবার অভিযোগে রাজসভায় অভিযুক্ত

* বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫২৬॥

হলে রাজা, রাণী, সভাসদ কেউই কুমার দত্তের অন্যায়কে নিন্দা তো করেনই নি, বরং রাণী বল্লভা মাধবীকে চুল ধরে মাটিতে ফেলে ভাইয়ের নামে অভিযোগ আনার দুঃসাহসের জন্য পদাঘাত করেন। অবশ্য শেষকালে কুমার দত্তকে লক্ষ্মণ সেনের তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাকবি গোবর্ধন আচার্যের চেষ্টায় শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, মাধবী পেয়েছিল সুবিচার। চরিত্রহীনতা, বিলাস লালসাময় জীবন, স্তুতিবাদপূর্ণ আত্মপ্রশংসা শোনা আর সভানন্দিনীদের নিয়ে নিরঙ্কুশ ভোগ-বিলাসের পরিবেশে সে-কালের রাজসভাগুলি কোন্ স্তরে পৌছেছিল তার অসংখ্য নিদর্শন ছড়ানো আছে সমকালীন কাব্য-কবিতায়, চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, শিলালিপিতে ও দানপত্রে॥

এর বিপরীত অবস্থা সমাজের নিম্নস্তরে। সেখানে অবিচ্ছিন্ন অভাব-দারিদ্র্য শোষণ অত্যাচার অবিচার। চাটভাট প্রভৃতি উপদ্রবকারী, রাজপুরুষদের অর্থে ফলে শস্যে এবং দ্রব্যে করগ্রহণ, আচারান্ধ সমাজপতিদের নিদারুণ বিধান—এই-সমস্তের সর্বগ্রাসী পীড়নে ভূমিহীন, ভবিষ্যৎহীন, সামাজিক সম্মানহীন নেতৃহীন, অর্থসম্বল-হীন নিম্নশ্রেণীর বাঙালীর অবস্থা কী ছিল তা সহজেই অনুমেয়। "সদুক্তিকর্ণামৃতে'র একাধিক শ্লোকে এই ব্যাপক দারিদ্র্যের ম্লান ছবি অঙ্কিত। একটি শ্লোকে নাম-পরিচয়হীন এক বাঙালী কবি নিদারুণ দারিদ্র্যের যে-বলিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন তা এই :

ক্ষুৎকামা শিশবঃ শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে।
গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটায়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা॥

—শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-বান্ধবেরা প্রীতিবর্জিত, পুরানো জীর্ণপাত্রে স্বল্পমাত্র জল ধরে—এইসবও আমাকে তেমন কষ্ট দেয়নি যেমন দিয়েছিল, যখন দেখেছিলাম, আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্যে রুষ্টা প্রতিবেশিনীর কাছে সূচ চাইছেন।

আরেকটি শ্লোকেও এই রকম নির্মম দারিদ্র্যের বাস্তব ছবি :

বৈরাগ্যৈকসমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুংসমভ্যর্থিতা।
দীনা দুঃস্থ কুটুম্বিনী পরিগলদ্বাষ্পাম্বুধৌতাননা-
প্যেকং তণ্ডুলমানকং দিনশতঃ নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥

—বৈরাগ্যে তার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরিধানে ছিন্নবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কোটরাগত, পেট বসে গিয়েছে, তারা আকুলভাবে খাদ্য চাইছে। দীনা

দুঃস্থা গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছেন এক মান (মণ ?) চালে যেন তাদের একশ' দিন চলতে পারে।

সদুক্তিকর্ণামৃতে গ্রথিত আরো একটি শ্লোকে কবি তাঁর দারিদ্র্যপীড়িত ঘরের বর্ণনা দিচ্ছেন :

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

—কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে : কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

"প্রাকৃত-পৈঙ্গলে" সংকলিত কয়েকটি কবিতাতেও অষ্টম নবম দশম শতকের দরিদ্র বাঙালী ঘরের করুণ দুঃস্থতার চিত্র অঙ্কিত। একটি শ্লোকে পার্বতী দুঃখ করে বলছেন :

বাল কুমার ছঅ মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুই এক্কু ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারি
গই ভবিত্তি কিল কা হমারী॥

—আমার বালকপুত্র ছয় মুণ্ডধারী। আমি এক উপায়হীনা নারী। আমার ভিখারী (স্বামী) অহর্নিশ কেবল বিষ খায়। কী গতি হবে আমার !—এই উক্তি এবং চিত্রের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের উপায়হীনা গৃহিণীর করুণ আক্ষেপই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে॥

চর্যাপদের নানা কবিতায় এই অভাব এবং দারিদ্র্য নিদারুণ বাস্তবতায় আমাদের মনকে পীড়িত করে তোলে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামাঅ॥ (চর্যা: ৩৩)

—টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে (ব্যাঙের যেমন অসংখ্য ব্যাঙাচি বা সন্তান, তেমনি আমার সন্তানের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান)। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (যে খাদ্য প্রায় প্রস্তুত, তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে)। এই একটি পদাংশই সমকালীন দরিদ্র বাঙালীর নিত্য অভাব ক্ষুধা বেদনা আক্ষেপ-পীড়িত জীবনের বাস্তব করুণ চিত্রের নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট।

এই নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দারিদ্র্য সমাজের এক বৃহৎ অংশে পরিব্যাপ্ত ছিল বলে চর্যাপদের সাধকদের কাব্যে অবধারিতভাবে একটা নৈরাশ্য এবং শূন্যতার বোধ ছড়িয়ে আছে। চর্যাপদের বিভিন্ন গানের নানা পঙ্‌ক্তিতে লৌকিক জীবনের যে-সব খণ্ডচিত্র ছড়ানো রয়েছে সে-সব ছবির মধ্যে করুণ বেদনার রঙই প্রধান। এই গীতিকাব্যের প্রায় সর্বত্রই একটা দুঃখ ও নিরানন্দের ব্যথাময় সুর অনুরণিত। যে-সমাজে সাধারণ মানুষের কামনা বাসনা তথা সুখে জীবন ধারণের সামান্যতম প্রেরণাও নানা বাধা-নিষেধে বিঘ্নিত—সেখানে মন-তরুর বাসনা ছেদন করার জন্য নির্দেশ দেবেন সিদ্ধাচার্যরা, এটাই তো স্বাভাবিক। মানুষের মন সর্বদাই দৃশ্যমান সংসার, তার আশা আনন্দ, ভোগ ও কামনার দিকেই ছুটে যেতে চায়, মন-বৃক্ষ যখন নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত ও নানা ইচ্ছা ও বাসনার মুকুলে মঞ্জরিত, তখন সে জীবন এবং জীবন-সঞ্জাত সমস্ত ভোগের জিনিসকেই দুহাতে বুকে টেনে নিতে চায়—এবং এই ভাবেই জীবন উপভোগের আনন্দ বা কখনও কখনও বেদনাকেও অনুভব করতে চায়।—কিন্তু অসাম্য এবং অনিয়ম, কঠোর শাসন এবং নিপীড়ন, অত্যাচার ও অনাচারে জরাজীর্ণ দুঃসহ সমাজে সে তা কোথায় পাবে। সমাজ যেখানে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিহীন ; মানবিকতার মূল্য দিতে অনিচ্ছুক, সেখানে চর্যাপদের কবিরা 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণ কপাটের আস' (ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা ত্যাগ কর), মোহতরুকে ফেড়ে ফেলে নির্বাণের সাঁকো নির্মাণ কর, মূষিকরূপ চঞ্চল চিত্তকে নাশ কর, বিষয়স্পর্শ ত্যাগ কর— ইত্যাদি কথা ছাড়া আর কী বলতে পারেন! সুখ ও আনন্দের চেতনা, যা মানুষের জীবনে সদাজাগ্রত থাকে—তা থেকে সামাজিক কারণেই বঞ্চিত সে-যুগের সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষের ক্রন্দন ও বেদনার প্রতিকার করা সিদ্ধাচার্যদের দায়িত্বের মধ্যে আসছে না, কিন্তু এই ক্রন্দন ও বেদনার প্রতি তাঁদের হৃদয় সজাগ ছিল, সেজন্য জীবন-সম্ভোগের নানা সহজ সাধনার কথা যেমন তাঁরা বলেছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের নানা বিধি-নিষেধকে তাঁরা কঠোরভাবে বিদ্রূপ ও নিন্দাও করেছেন। বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে এবং নিষ্প্রাণ নিয়মসর্বস্বতার মধ্যে আবদ্ধ 'ব্রাহ্মণ নাড়িয়া'র (নেড়া বামুনের) প্রতি কৌতুক, ব্রাহ্মণের ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা, দক্ষিণা ও দান গ্রহণ—ইত্যাদির প্রতি নির্মম শ্লেষ—এসবই সাক্ষ্য দেয় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের প্রতি উচ্চকোটির কী নিদারুণ অবজ্ঞা ও অবহেলা ছিল। বহু গানে জীবনের ভোগ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিরাসক্তিই সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই নেতিবাচক মনোভাব তৎকালীন অসাম্যের আদর্শে গড়া সামাজিক বিধিনিষেধের নিষ্ঠুরতার

প্রতিক্রিয়াজাত। এই সিদ্ধান্ত করার পিছনে যুক্তি এই, চর্যাপদ-রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের জীবনী সম্পর্কে তথ্যের একান্ত অভাব হলেও যেটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে জানতে পারা যায়, লুইপাদ, কঙ্কনপাদ, ভদ্রপাদ, মহীধরপাদ, তন্ত্রীপাদ, কুক্কুরীপাদ প্রমুখ সিদ্ধাচার্য নামবিচারে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস" গ্রন্থে বলা হয়েছে, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ না-কি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ। কিন্তু আগেই বলেছি, বাঙলাদেশে আর্যীকরণ শুরু হবার সময় তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনো কোনো লোককে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নত করা হয়—সম্ভবত ঐ নিয়মে কুক্কুরীপাদ, লুইপাদ ইত্যাদির বংশ ছিল ব্রাহ্মণ। পরে তাঁরা আর্যদের সমস্ত নিয়মকানুন সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে না মেনে চলার জন্য অধম বর্ণে পরিণত হন। তাঁদের নামের মধ্যে আর্যগন্ধ কোথাও নেই, জীবন ধারণের ইঙ্গিতও কোথাও অঙ্গুলিনির্দেশ করে না যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এসব থেকেই সিদ্ধান্ত করতে সাহসী হচ্ছি যে, চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ পর্যায়ের লোক, কিংবা বর্ণাশ্রমের মধ্যেই নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি। তা যদি না হবে তবে ভিক্ষু-জীবনেও তাঁরা সংসারের সাধারণ জীবনের অতি প্রত্যক্ষ ও পরিচিত অভিজ্ঞতাকেই কাব্যে অবলম্বন করবেন কেন। জুয়াখেলা, শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, তুলোধোনা, চাঙারী বোনা, দেশজ মদ্য পান করে মাতাল হওয়া, বনে বনে আহার্য সংগ্রহ করা—এসব প্রাত্যহিক কর্ম এবং সেইসব কর্মসঞ্জাত ফলের মাধ্যমে বিবিধ উপমারূপক সংগ্রহ—এসব কি সত্যি সত্যি বোঝায় না এইসব সিদ্ধাচার্যের সামাজিক সত্তা কোন্ কেন্দ্রে স্থাপিত ছিল। এদেরকে অবলম্বন করেই তাঁরা তাঁদের জীবন উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক সত্যসন্ধান করেছেন। এমন কথা বলি নে, এইসব সিদ্ধাচার্য ব্যক্তিগতভাবে তৎকালীন ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে অত্যাচারিত বা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, হপ্‌কিন্সের কথায় 'Their lives depended on their owners' pleasure. They were born to servitude······They were in fact the remnant of displaced native population···Stigmatised by their conquerer's pride as a people apart, worthy only of contempt and slavery.'—এরকম অবস্থায় হয়তো তাঁদের পড়তে হয় নি, কিন্তু সিদ্ধাচার্যরা এই ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের বিধিনিষেধের শিকলে-বাঁধা এবং আচার-বিচারের পাঁচিল-তোলা জীবনে-যে প্রাণের কোনো স্পন্দন অনুভব করেন নি, একথা সত্য। হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে এই সমাজের অসংগতি এবং অসম বিধিব্যবস্থার স্বরূপ বুঝেছিলেন বলেই তাঁরা সহজ সাধনার সমতার ক্ষেত্রে মানবাত্মাকে আহ্বান করে-

ছিলেন। সেজন্যেই সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই, সামাজিক অবিচারসঞ্জাত প্রত্যক্ষ অভাব বোধই তাঁদের কাব্যে মনোময় শূন্যতাবোধ সৃষ্টি করেছে॥

চর্যাপদের সমকালীন এবং তার কিছু আগের বাঙলা দেশের সামগ্রিক চিত্রটি নানা উপাদানের সাহায্যে এতক্ষণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই চিত্রের একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ আতিশয্য। কাব্য-কবিতাগুলির অধিকাংশই যৌনকামবাসনায় মদির এবং মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরলরুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মলিন; ধর্ম-আচরণে ভেদবুদ্ধি, নিন্দনীয় যৌনকামনা, অমানুষিক ঘৃণা ও অবহেলা—জীবনের সমস্ত দিকে কদর্যতার সমাবেশ। আর অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য-রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে অসাড়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধোগতি অবাধ, শিল্প-সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধরহিত, নিতান্ত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত॥

এই নিশ্ছিদ্র সর্বব্যাপী সুগভীর অন্ধকারের বেড়াজালে চর্যাপদের সমকালীন বাংলা দেশ অসহ্য আত্মসন্তুষ্টি, দুর্বল আত্মশক্তি এবং দুরপনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের ক্রমবর্ধমান অভিশাপে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে—কোথাও তার আশা নেই, নিপীড়িতের যন্ত্রণা প্রকাশের নেই ভাষা, মানবধর্মে নেই ক্ষীণতম বিশ্বাস। সমস্ত বাঙলাদেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষণে মৃত্যুযন্ত্রণায় অভাবদৈন্য-পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে—গই ভবিত্তি কিল কা হমারী!

।। চর্যাপদে লৌকিক জগৎ ।।

চর্যাপদের সমস্ত কবিতার মূল উদ্দেশ্য একটি বিশেষ ধর্মীয় আচরণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হলেও, সেই ইঙ্গিত প্রসঙ্গে সিদ্ধাচার্যরা সমসাময়িক লৌকিক জীবনের যে-ছবি এঁকেছেন তা জীবনরসিক কাব্যপাঠক এবং ঐতিহাসিকের কাছে মহামূল্যবান চিত্তাকর্ষক সামগ্রী। যে-জীবনের কথা এবং ছবি চর্যাপদের বিভিন্ন কবিতায় বিধৃত তাতে বিলাস-ব্যসনাসক্ত, ভোগকামী, ঐশ্বর্যদাম্ভিক রাজা-উজীরের কথা নেই, আছে সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও দৈনন্দিন আচরণের সরল সুন্দর সহজ স্বচ্ছ বর্ণনা—সেখানে না আছে কোনো বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক রীতি মেনে চলার প্রবণতা, না আছে কোনো আয়াস। এই কষ্টকল্পনাহীন আয়াসহীন সাবলীল বর্ণনা অন্যত্র খুঁজে পাওয়া রীতিমত কঠিন। এই বর্ণনায় সেকালের সাধারণ লোকের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম, কাজ ও আনন্দ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর করণ, পূজো আর্চা ক্রিয়াকর্ম, গৃহস্থের পারিবারিক জীবন, বস্ত্র অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য ও বাসনপত্র, অপরাধ ও বিচার-পদ্ধতি, সংগীত ও সংগীতের উপকরণ—ইত্যাদি বহু বিষয়ের শুদ্ধ শিল্পসম্মত বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি ॥

প্রথমে সাধারণ লোকের জীবন ও জীবিকার কথা ধরা যাক। বেশির ভাগ চর্যাগীতিতেই ডোম-ডোমনী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ডোম নিষাদ শবর ইত্যাদি গ্রামের বাইরে উঁচু জায়গায় বাস করতেন, ব্রাহ্মণরা এঁদের স্পর্শও করতেন না।

নগর বাহিরেঁ রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ ॥ [চর্যা : ১০]

—রে ডোম্বী, নগর বাহিরে তোমার কুঁড়ে ঘর, ব্রাহ্মণ নেড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও।

আরেকটি চর্যায় বলা হচ্ছে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥

—টিলার উপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে নেই ভাত, অথচ নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)।

ডোমদের জাতিগত বৃত্তি ছিল তাঁত তৈরী করা, চাঙারী বোনা, নৌকা বাওয়া॥

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে ধানই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান উৎপন্ন খাদ্য-বস্তু। সুতরাং চর্যাপদে এবং তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, উচ্চকোটির লোক থেকে আরম্ভ করে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন, অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জন-গোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান দানই হচ্ছে এই ভাত খাওয়া। বাঙালী তখন ভাতই প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করত এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখই ছিল "হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী"। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে সংকলিত শ্লোকগুলির মধ্যে একটিতে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে :

ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।

মইনি মচ্ছা* নালিত গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খাই পুনবন্তা॥

—গরম গরম ভাত কলাপাতায় ঢেলে গাওয়া ঘি, দুধ, ময়না মাছের ঝোল, নালিতা শাক দিয়ে স্ত্রী পরিবেশন করছেন, আর পুণ্যবান স্বামী খাচ্ছেন।

ঠিক এইরকম গার্হস্থ্য সৌন্দর্যের ছবি চর্যাপদে না থাকলেও সাধারণ বাঙালী ঘরে এই ধরনের বস্তু সহযোগেই-যে ভাত খাওয়া হোত তা অনুমান করতে বাধা নেই। লক্ষণীয়, ভাতের সঙ্গে ডাল খাওয়ার কথা চর্যাপদে, প্রাকৃতপৈঙ্গলে, নৈষধচরিতে কিংবা সদুক্তিকর্ণামৃতে—কোথাও উল্লেখ নেই। তাই মনে হয়, আদিকালের বাঙালী ডাল খেতো না। ডাল খাওয়াটা বোধ হয় পরে উত্তরভারতের বাসিন্দাদের দ্বারা বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে। তবে দুধ খাওয়া হোত কিংবা গার্হস্থ্য জীবনে দুধ-গোরু এবং বলদের-যে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল তার নানা প্রমাণ চর্যাপদের একাধিক গীতিতে প্রকীর্ণ। চাষবাসের জন্য গৃহস্থ-বাড়িতে বলদ থাকত, গাই থাকত দুধ যোগানোর জন্যে। দুধ দোয়ানোর জন্য বিশেষ ধরনের পাত্রও ছিল। গোরু দিনে তিন-বার দোয়ানো হোত। এই সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাংশগুলিতে :

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। [চর্যা : ২]

এখানে 'পিটা' দুধ দোয়ানোর পাত্র। অন্যত্র—

দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই। [চর্যা : ৪২]

'দুধের মাঝে সর আছে তা চোখে পড়ে না।' এতে বোঝা যাচ্ছে, দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে সর তোলার ব্যাপারটি সেকালের বাঙালীরা জানত।

* পাঠান্তর 'মোইলী মচ্ছা'॥

দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥ [চর্যা : ৩৩]

—দোয়ানো দুধ কি বাঁটেতে মিলিয়ে গেল ! বলদ প্রসব করল আর গোরু বন্ধ্যা ! তিন সন্ধ্যা পিটায় দুধ দোয়ানো হয় ! আরেকটি শ্লোকাংশে বলা হয়েছে :

সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহলী কি মো দুঠ বলন্দে।

'সরহ বলছেন, দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো।' দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো—এই প্রবাদটির প্রচলন বহুদিন আগে থেকেই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে ॥

মাছ খাওয়ার কথা চর্যাপদে প্রত্যক্ষভাবে কোথাও না থাকলেও নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার বিবরণ আছে কাহ্নপাদের একটি চর্যায়। তবে মাংস খাওয়ার কথা বহু জায়গায় আছে। মাংসের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল হরিণের মাংস ; শবর পুলিন্দ নিষাদ ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক হরিণের মাংসই ব্যবহার করতেন বেশি। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী,' এই কথাটিও হরিণ-মাংসের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ। চারিদিক থেকে জাল দিয়ে বন ঘিরে হাঁক পাড়তে পাড়তে শিকারীরা হরিণ ধরত। এই সম্বন্ধে একটি পদাংশ :

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥ [চর্যা : ৬]

চারিদিক থেকে ব্যাধে ঘিরে ফেলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত হরিণ বনের মধ্যে যে-অবস্থায় আছে তার বর্ণনাও সুন্দর :

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জাণী ॥
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া-হিঅহি ণ পইসঈ ॥

—হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না, জল পান করে না। হরিণ হরিণীর আবাস কোথায় তা জানে না। হরিণী বলে, 'শোন তুই হরিণ, এই বন ছেড়ে ভ্রান্ত হও' (দূর দেশে চলে যাও)। ত্রস্ত হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলছেন, মূঢ়ের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে না ॥

অন্যান্য সূত্রে বাঙালীর আম কলা তাল কাঁঠাল নারিকেলের উল্লেখ পাওয়া গেলেও চর্যাপদের কবিতায় কোনো রকম ফলের কথা নেই। তবে তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্যায়ঃ

রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ। [চর্যা ঃ ২]

—গাছের তেঁতুল সব কুমিরেই খায়।

তবে ভাত-মাংস ছাড়া মদ্যপানের বিস্তৃত বিবরণ চর্যাপদের একাধিক শ্লোকে আছে। চর্যাপদের মধ্যে নানা কবিতায় মদ্যপান সম্পর্কে যে-রকম উদার বর্ণনা বহু জায়গায় প্রকীর্ণ তাতে এরকম মনে করা খুব স্বাভাবিক যে, সিদ্ধাচার্যরা মদ্যপানটাকে খুব দোষের চোখে দেখতেন না। মদ্যবিক্রয়ের স্থান বা শুঁড়িখানারও বিশদ বর্ণনা নানা সূত্রে আমরা দেখতে পাই। শুঁড়িখানার দরজায় কিংবা দেওয়ালের গায়ে বোধ হয় কোনো চিহ্ন থাকত, তাই দেখে মদ্যপিপাসুরা অভিপ্সীত জায়গাটি বুঝে নিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবত মদ্যবিক্রেতার স্ত্রী মদ্য বিক্রয় করতেন। এক রকম গাছের সরু বাকল কিংবা শিকড় গুঁড়ো করে নিয়ে মদ চোলাই করা হোত। ঘড়ায় ঘড়ায় সরু 'নাল' দিয়ে মদ ঢালা হোত। বিরুবাপাদের একটি চর্যায় শুঁড়িখানা, মদবিক্রেতা, মদ্যপায়ীর আচরণ ইত্যাদির চমৎকার বাস্তব বর্ণনা আছেঃ

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ়-কান্ধ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।
পাইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক ঘড়ুলী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥ [চর্যা ঃ ৩]

—এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢোকে। সে চিকণ বাকল দিয়ে বারুণী মদ বাঁধে। সহজ পথে স্থির হয়ে বারুণীতে প্রবেশ কর। দৃঢ় স্কন্ধ লাভ করে অজর অমর হও! দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই সেই পথ বেয়ে শুঁড়ির দোকানে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে—গ্রাহক ঘরে ঢুকল, তার আর সাড়া শব্দ নেই অর্থাৎ মদের নেশায় সে এমনিই বিভোর। সরু নাল দিয়ে একটা ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে, বিরূপা সাবধান করে দিচ্ছেন, সরু নাল দিয়ে চিত্ত স্থির করে মদ চাল॥

আমোদ-প্রমোদের উপাদান হিসাবে দাবাখেলার উল্লেখ পাই ১২নং চর্যায়। দাবা খেলা কিংবা পাশা খেলার উল্লেখ চর্যাপদের পূর্বেও পাওয়া যায়। তবে চর্যা-গীতিতে দাবা খেলার বিভিন্ন অঙ্গ এবং দাবার ছকের চৌষট্টি কোঠার বিস্তৃত উল্লেখ দেখে মনে হয়, দশম একাদশ-শতাব্দীর আগেই এই খেলাটি বাঙলা দেশে বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছে। চর্যাগীতিতে দাবা খেলার 'ঠাকুর' বলা হয়েছে রাজাকে। শব্দটি বিদেশী, তুর্কী। তাই দেখে ডঃ স্বকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, চর্যাপদে বর্ণিত খেলার পদ্ধতিটি বোধ হয় বিদেশ থেকে এসেছিল। রাজা বা ঠাকুর ছাড়াও মন্ত্রী, গজবর, বড়ে ইত্যাদিও দাবা খেলায় ব্যবহৃত হোত :

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল ॥
ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।
উআরি উএস কাহ্ন নিঅড় জিনউর ॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিয়া ভববল জিতা ॥
ভণই কাহ্নু অম্হে ভলি দায় দেহুঁ।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহু ॥ [চর্যা : ১২]

—করুণার পিঁড়িতে নববল (দাবা) খেলি।। সদ্গুরুবোধে ভববল জিতলাম। ঠাকুর (রাজা) মরলে দুটোই নষ্ট হল। উপকারীর উপদেশে কাহ্নুর কাছে জিনপুর। প্রথমেই বোড়ে তুলে মারলাম (বোড়ের চাল দিলাম)। তারপর গজ তুলে পাঁচজনাকে মারলাম (ঘায়েল করলাম)। মন্ত্রী দিয়ে ঠাকুরকে (রাজাকে) প্রতি-নিবৃত্ত করলাম (বা ঠেকালাম), অবশ করে ভববল জিতলাম। কাহ্ন বলছেন, দান আমি ভালোই দিই, চৌষট্টি কোঠা গুণে নিই ॥

অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নৃত্যগীতের কথা চর্যাগীতের বহু জায়গায় আছে। ডোম কাপালিক নট ইত্যাদি জীবিকার এবং জাতির লোকদের মধ্যে নৃত্য করা কিংবা গীত-বাদ্যের সমাদর করা খুবই প্রচলিত ছিল মনে হয়। সেই সময়ে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে এমন এক ধরনের লোক বোধ হয় ছিল, যারা নাচগান করেই জীবিকা নির্বাহ করত। ডোম্বীরা-যে খুব নাচগানে পারদর্শিনী হতেন তার প্রমাণ :

এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

—এক হয় পদ্ম তার চৌষট্টি পাপড়ি। তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী বাছা।

নাচেগানে ডোম্বীরা পারদর্শিনী ছিলেন বলে তাঁদের ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন বোধ হয় কিছুটা শিথিল ছিল। উচ্চ সমাজের লোকেরাও অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ নাড়িয়া'রা যে তাদের কুঁড়ে ঘরের আশে পাশে ঘুর ঘুর করতেন এরকম ইঙ্গিত তো আগেই দিয়েছি। জাতি ও সংস্কার যে-সমস্ত সহজযানী ও কাপালিকরা মানতেন না, তাঁদের বিবিধ ধর্মাচরণে ডোম্বীদের সঙ্গিনী হতে কোনো বাধা ছিল না। কাহ্নুপাদ পরিষ্কার বলেছেন, আমি নটের পেটিকা তোমার জন্যে (ডোম্বীর জন্যে) ত্যাগ করেছি, তোমার জন্যেই আমি কাপালিক, হাড়ের মালা গলায় নিয়েছি (চর্যা : ১০)। একই চর্যায় তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আমি কাহ্নুপাদ, কাপালিক যোগী নির্ঘৃণ এবং উলঙ্গ। ডোম্বি, আমি তোমার সঙ্গেই সঙ্গ করব'। কাহ্নুপাদ আরো একটি চর্যায় বলেছেন :

কইসনি হালো ডোম্বী তোহরি ভাভরিআলি।
অন্তে কুলিনজন মাঝে কাবালী॥
তুঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ॥
কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি ছিনালী॥ [চর্যা : ১৮]

—হালো ডোম্বি, কেমন আশ্চয তোর চাতুরী। তোর এক অন্তে কুলীনজন, মাঝখানে কাপালিক। ডোম্বি, তুই সবাইকে বিনাশ (নষ্ট) করিস। কার্যকারণের হেতু তুই শশধরকে বধ করিস। কেউ কেউ বলে তুই (তাদের প্রতি) বিরূপ। কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না। কাহ্নু বলছেন, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী আর কেউ নেই॥

নাচগানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও সেই সময়ে হোত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একতারা, হেরুক বীণা, ডমরু, ডমরুলি, বাঁশী, মাদল, পটহ ইত্যাদির উল্লেখ একাধিক চর্যায় আছে। গোপীযন্ত্রের মতো লাউয়ের খোলায় বাঁশের ডাঁটি লাগিয়ে তার সঙ্গে তাঁত বা তন্ত্রী জুড়ে এক রকম বীণার মতো যন্ত্রের উল্লেখ পাচ্ছি :

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী॥

বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তিধ্বনি বিলসই রুণা ॥

—সূর্য-লাউয়ে শশী লাগল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব এক করে দিল অবধূতী। ওগো সখি, হেরুক বীণা বাজছে। শোন, তন্ত্রীধ্বনি কী করুণ সুরে বাজছে! গানের সাহায্যে নাটকাভিনয় বা গীতাভিনয়ের প্রচলন বোধ হয় সেই সময়ে ছিল। কারণ, এই চর্যাটির (নং ১৭) শেষ দুটি চরণে দেখছি :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই ॥

—বজ্রাচার্য নাচছেন, গাইছেন দেবী। এইভাবে বুদ্ধ-নাটক সুসম্পন্ন হয়। এখানে বুদ্ধনাটক কথাটি লক্ষ্য করবার। হয়তো সেই সময় নাচগানের মধ্যে দিয়ে কোনো বিশেষ ঘটনা বা বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে রূপ দেওয়া হোত। গানের ব্যাপারেও সিদ্ধাচার্যদের-যে উৎসাহের কিছু কমতি ছিল তা নয়। প্রতিটি চর্যাপদের প্রথমেই কোন্ রাগে পদটি গাইতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে রাগগুলিকে এইভাবে তালিকাবদ্ধ করতে পারা যায়—পটমঞ্জরী, গউড়া, মালসীগউড়া, মালসী, মল্লারী (মল্লার ?), গুঞ্জরী, কহ্নগুঞ্জরী, রামক্রী (রামকেলি ?), দেশাখ (দেশি ?), ভৈরবী, কামোদ, বড়ারী, শবরী, অরু, দেবক্রী, ধানশী, বঙ্গাল ও ইন্দ্রতাল। এর মধ্যে ইন্দ্রতাল বোধ হয় কোনো তালের নাম ॥

লোকায়ত সমাজের নানা ক্রিয়াকর্ম আচার-অনুষ্ঠান উৎসব ইত্যাদিরও সুষ্ঠু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে চর্যাপদে। আজকের দিনের মতো সে-যুগেও বর বিবাহযাত্রায় খুব ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে যেতেন। কাহ্নুপাদের চর্যায় এই বিবাহ-যাত্রার ভারী সুন্দর বাস্তব বর্ণনা আছে :

ভবনির্বাণে পড়হ-মাদলা।
মন পবণ বেনি করণ্ডকশালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহনিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইনিজালে রঅনি পোহাঅ ॥

ডোম্বী-এর সঙ্গে জো জোই রত্তো।

থনহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো ॥ [চর্যা : ১৯]

—ভব ও নির্বাণ হল পটহ ও মাদল ; মন পবন দুই করণ্ডকশালা। দুন্দুভি শব্দে জয়ধ্বনি উঠিয়ে কাহ্নুপাদ ডোম্বীকে বিবাহ করতে চললেন। ডোম্বী বিবাহ করে জাত গেলাম, কিন্তু যৌতুক পেলাম অনুত্তরধাম। [নীচু জাতের ডোম্বীকে বিয়ে করে জাত কুল সব গেল বটে, কিন্তু ভালো যৌতুক পেয়েছি, তাতেই সব ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে—এই ভাব।] অহর্নিশ সুরত প্রসঙ্গেই কাল যায়, অন্ধকার রজনী জ্ঞানালোক পোহায়। ডোম্বীর সঙ্গে যে-যোগী অনুরক্ত হন, তিনি সহজে উন্মত্ত হয়ে আর ক্ষণমাত্রও ডোম্বীর সঙ্গ ছাড়তে চান না।

এই চর্যাপদে নানা জিনিসের মধ্যে একটি বিষয়ে তির্যক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেকালে যৌতুকের লোভে ছোট ঘর থেকে বিয়ে করে মেয়ে নিয়ে আসার প্রথা ছিল। বাসর-ঘরে বর তিন ধাতু নির্মিত খাটে বধূকে বুকে নিয়ে মেয়েদের ভিড়ে রাত কাটাত :

তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।

সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥

কর্পূর দিয়ে পানও বর খেতেন :

হিঅ তাঁবোলা (তাম্বুল) মহাসুহে কাপুর খাই ॥

সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ [চর্যা : ২৮]

নানা অলংকারও সেই সময়ের রমণীসমাজ নিজ দেহকে অলংকৃত করার জন্য ব্যবহার করতেন। এই সমস্ত অলংকারের মধ্যে বিশেষ ব্যবহার ছিল—কাঙ্কান বা কঙ্কণ, ঘণ্টানেউর বা বাজননূপুর, মুত্তিহার বা মুক্তাহার এবং কুণ্ডল। এ ছাড়া প্রাকৃত-রমণীর নিজস্ব বেশভূষার মধ্যে খোঁপায় ফুল, ময়ূরের পাখা, গলায় ফুলের মালা এবং ফুলের কর্ণাভরণ—এরও উল্লেখ আছে নানা চর্যায়। আয়না ব্যবহারের কথা পাই ৪৯ নং চর্যায় ॥

গার্হস্থ্য জীবনে সসুরা (শ্বশুর), শাসু (শাশুড়ী), ননন্দ (ননদ) ইত্যাদির সঙ্গে বহুড়া (বধূ) ঘর করত। শালী বা স্ত্রীর ভগ্নীও বোধ হয় ভগ্নীপতির ঘরে বাস করত, কারণ শালীর উল্লেখ পাচ্ছি ১১ নং চর্যায়—'মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী"। সন্তান-প্রসবের সময় বধূকে অন্তউড়ি বা আঁতুড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হোত ;—কুক্কুরীপাদ বলেছেন ২০ নং চর্যায় 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি'—আমি আঁতুড় ঘর দেখেই বিষয়-বুদ্ধি ছেড়েছি। ঘরে চাবি-তালা লাগানো হোত।

তার উল্লেখ আছে গুণ্ডরীপাদের ৪ নং চর্যায়—'সান্থ ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল', নতুবা কাহ্ন্‌পাদের কথায় :

স্থনবাহ তথতা পহারী।

মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥ [চর্যা : ৩৬]

'শূন্য ঘরে তথতা প্রহরী ; মোহ-ভাণ্ডার সমস্তই কেড়ে নিয়ে গিয়েছে'।

ছিঁচকে চোরের উপদ্রবও ছিল :

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিয়াতী।

কানেট চোরে নিল অধরতী ॥

সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।

কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ [চর্যা : ২]

ঘরের কোণে অঙ্গন, সেখানে শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়েছেন—মাঝরাতে চোরে বউয়ের কানেট খুলে নিয়ে গেল। শ্বশুর তখনও ঘুমিয়ে, কিন্তু বউ জেগে আছে—তার মনে চোরের ভয়। অন্যদিকে গয়না হারানোর জন্যে ভাবনা। অবশ্য এই চোর সোনাচোর না মনচোর তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। কারণ এই চর্যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পরেই আছে :

দিবসে বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ।

রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥

—দিনের বেলা বউটি কাকের ডাকেই ভয় পায়। আর রাত্রিতে কামবাসনায় কোথায় চলে যায়। অসতী কুলবধূ তখনও ছিল, যেমন ছিল নিজ ঘরের 'ঘরিণী' ছেড়ে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পঞ্চবর্ণে বিহার করা ॥

ঘরে অনেক রকমের বাসনপত্র ব্যবহার করা হোত। হাঁড়ি, পিটা (দুধ দোওয়ার পাত্র), ঘড়ুলি, (গাড়ু ?), ঘড়ি (ঘড়া)—এদের ব্যবহারই ঘুরে ঘুরে দেখতে পাচ্ছি। কুঠার, টাঙ্গী, নখলি (খন্তা)—হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হোত বেশি ॥

সমাজে ধনীর ঘরে পূজো আর্চা বেশ ঘটা করেই হোত। সাধারণ ধনীর ঘরে দেব পূজার জন্য বিগ্রহ থাকত, ধূপ ইত্যাদি জ্বালানো হোত—এর উল্লেখ আছে ৪৭ নং চর্যায়। রাজার তাম্রশাসন বা দলিলের জোরে ধনীরা জমি ভোগ করতেন। ধনীদের ঘরে সোনারূপার ভাঁড়ারের কমতি ছিল না। ধার্মিক লোকেরা শাস্ত্রীয় পুথি ইত্যাদি পড়তেন, কোশাকুশি নিয়ে পূজো করতেন, মালা জপ করতেন। মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করে দীপ জ্বেলে নৈবেদ্য সাজিয়ে জলে স্নান করে শুচি হয়ে ধ্যান করার অভ্যাস ছিল ব্রাহ্মণদের। তাঁদের তামাশা করে বলা হয়েছে :

কিন্তোহ মন্তে কিন্তোহ তন্তে কিন্তোহ ঝান-বখানে।

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা ॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধি।
গঅণ-দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ॥
চন্দ সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বামদাহিন দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা ॥
কবড়ী ন লেই বুড়ী ন লেই সুচ্ছরে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কূলে কূলে বুলই ॥ [চর্যা : ১৪]

'গঙ্গা আর যমুনার মাঝখানে নৌকা বইছে; মাতঙ্গ-কন্যা ডোম্বী তাতে জলে ডুবে ডুবে লীলায় পার করছে। লো ডোম্বি, নৌকা বাও, বেয়ে চল, পথেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। সদ্গুরু-পাদ-প্রসাদে আমি আবার জিনপুরীতে যাব। পাঁচটি দাঁড় পড়ছে পথে, পিঠেতে কাছি বাঁধা; শূন্য সেঁউতিতে জল সেঁচে ফেল, জল যেন কায়ার সন্ধিতে প্রবেশ না করতে পারে। সৃষ্টির সংহারকারী চন্দ্র-সূর্য দুই চাকা ও পুলিন্দা, বাম ও ডানদিকে না তাকিয়ে অনায়াসে নৌকা বেয়ে চল; (সেই ডোম্বী) কড়িও নেয় না, বুড়িও নেয় না—স্বেচ্ছায় পার করে। যারা রথে চড়ল, নৌকা বাওয়া জানল না,—তারা তীরে তীরে ঘুরে মরে।'

পার হয়ে কড়ি নেই বললে পাটনী-যে যাত্রীদের কাপড়-চোপড় তুলে সর্বাঙ্গ খুঁজে দেখত তার উল্লেখ আছে তাড়কপাদের ৩৭ নং চর্যায় ॥

নদ-নদী-খাল-বিলবহুল 'প্রচুর পয়সি' বাঙলাদেশে বর্ষাকালে পথঘাট সব ডুবে গেলে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাতায়াত করতে-যে সাঁকোর প্রয়োজন ছিল, তারও উল্লেখ পাই কয়েকটি চর্যায়। বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে সেকালের বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। চাটিলপাদের একটি চর্যায় বলা হচ্ছে :

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গড়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅদিঢ়ি টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর মা জাহী ॥ [চর্যা : ৫]

'পারগামী লোক যাতে নির্ভয়ে পার হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে চাটিলপাদ দৃঢ়

সাঁকো গড়ে দিয়েছেন। (কুঠার দিয়ে) মোহতরু ফেড়ে সেই সাঁকোর পাটিগুলি জোড়া দেওয়া হয়েছে, অদ্বয়-টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণকে দৃঢ় করা হয়েছে। সাঁকোতে চড়ে ডানদিক বাঁদিক কোর না। নিকটেই আছে বোধি, দূরে যেও না।'

বাঙলাদেশের নদীতে জলদস্যুর উপদ্রব ছিল, তারও ইঙ্গিত পাই ভুসুকুর একটি চর্যায় :

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅদঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥ [চর্যা : ৪৯]

'পদ্মাখালে (পদ্মা নদীতে?) বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়ে বেয়ে চলি; (তখন) অদ্বয়-দঙ্গাল আমার সব ক্লেশ লুট করে নিল।' তারপরেই তিনি বলছেন, এর ফলে 'সোণত (সোনা) রুঅ (রূপা) মোর কিম্পি ণ থাকিউ'। এখানেই শেষ নয়, 'চউকোড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ সেস, জীঅন্তে মইলেঁ নাহি বিশেস।' লুটেরা জলদস্যুদের দ্বারা এইভাবে সর্বস্ব লুঠ হওয়ায় ইঙ্গিত থেকে বুঝতে পারা যায়, পর্তুগীজ জলদস্যু বা হারমাদদের অত্যাচারের অনেক আগে থেকেই বাঙলা দেশে এই ধরনের উপদ্রব ছিল॥

নৌকা-ভেলা ইত্যাদি জলযান ছাড়া স্থলপথে চলার জন্যে রথ-জাতীয় স্থলযানের ব্যবহার সেকালের বাঙলাদেশে ছিল। ডোম্বীপাদের পূর্ব-উদ্ধৃত একটি চর্যায় (নং ১৪) সব শেষের পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে 'জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কূলে কূলে বুলই'—যারা রথেই চড়ল, নৌকা বাওয়া জানল না, তারা কূলে কূলেই ঘুরে ফিরল। এই রথ যে-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গো-যান ছিল, অন্য সূত্রে তা জানতে পারা গিয়েছে। স্থলযানের চেয়ে জলযানের শ্রেষ্ঠত্ব বা আদর ছিল বেশি, তার ইঙ্গিতও উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটিতে স্পষ্ট॥

অতি প্রাচীনকাল থেকে বাঙলাদেশে ও কামরূপে হাতি শিকার, হাতি পোষ মানানো এবং সেই সূত্রে হাতির রোগের চিকিৎসাও প্রচলিত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে হস্তী-আয়ুর্বেদ বাঙলাদেশের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল, এবং বাঙালীর পক্ষে তা ছিল বিশেষ গৌরবের। চর্যাপদে হাতিকে রূপক হিসাবে ধরে অনেকগুলি গান রচিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে খেদায় হাতি ধরা, বন্য হাতিকে শক্ত করে বেঁধে রাখা, বন্য এবং পাগল হাতির শিকল ছিঁড়ে খুঁটি ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার অতি সুন্দর বাস্তব বর্ণনা চর্যাপদের নানা গীতে আছে। কাহ্নপাদ বলছেন :

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িঅ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িঅ॥

আবার 'কিন্তোহ দীবেঁ কিন্তোহ নিবেজ্জ' (নৈবেদ্য) একথাও বলেছেন সিদ্ধাচার্যরা। তবে সাধারণভাবে সমাজে বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর ছিল, সম্মান ছিল ॥

নদীমাতৃক বাঙলাদেশের সুন্দর ছবিটি নানা চর্যায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। নদনদী খালবিলের গহন জল, কাদায়-মাখা তীর, প্রবল স্রোত, নানা বিচিত্র নামের নৌকা, খেয়া পারাপার, পারের মাসুল আদায় করা, দাঁড় দিয়ে নৌকা বাওয়া, কাছি খুলে স্রোতে নৌকা ছেড়ে দেওয়া, মাঝ নদীতে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ভীত হওয়া, গুণ টেনে নৌকা বাওয়া—ইত্যাদি নদী-সংক্রান্ত সমস্ত ছবি চর্যাগীতিগুলিতে পরম ভালোবাসার সঙ্গে চিত্রিত।

ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুয়ান্তে চিখিল মাঝে পার ন থাহী ॥ [চর্যা : ৫]

—গহন গম্ভীর ভবনদী বেগে বইছে, দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নেই বা থই পাওয়া যাচ্ছে না—এই ছবি বাঙলাদেশেরই নিজস্ব। নানা রকমের নৌকার নাম—নাব, নাবী, নাবড়ী, ভেলা, বেণি; নৌকায় ব্যবহৃত কেডুআল, খুণ্টি, কাছি, মাঙ্গ, পিট, দুখোল, চকা, পতবাল, নাহী, গুণ, দাঁড়, কাছি, সেঁউতি, পাল, চক্র, পুলিন্দা, হাল—সমস্ত জিনিসকে আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা। এতেই বোঝা যায়, নদনদী খালবিল, নৌকা, নৌ-বন্দর, নৌ-বাণিজ্য, পারাপার, পাটনী—ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁদের আত্মিক যোগ ছিল কত ঘনিষ্ঠ। সরহপাদের একটি গীতে নৌযাত্রার কী সুন্দর বর্ণনা :

কাআ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেডুআল।
সদগুরু-বঅনে ধর পতবাল ॥
চিঅ থির করি ধরহুরে নাই।
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণে ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥
কুল লই খরসোন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাএ ॥ [চর্যা : ৩৮]

কম্বলপাদ বলছেন :

খুন্টি-উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবক পারঅ ॥ [চর্যা : ৮]

—খুঁটি উপড়িয়ে কাছি মেলে দাও ; কম্বলপাদ তুমি সদ্‌গুরু-কে জিজ্ঞাসা করে নৌকা বেয়ে যাও। মাঝ-নদীতে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখ ; দাঁড় না থাকলে কে নৌকা বাইতে পারে ?

শান্তিপাদের একটি চর্যায় আছে :

কূলেঁ কূল মা হোইরে মূঢ় উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মাআমোহাসমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে ॥
বামদাহিন দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট-ন-গুমা-খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥
[চর্যা : ১৫]

—হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরে বেড়িও না, সংসারের মধ্যেই যে আছে সহজ পথ। বালকের মতো বিকল্পে ভুলো না,-তোমার সামনে সোনা বাঁধানো রাজপথ। সামনে অন্তহীন মায়ামোহরূপ সমুদ্র, যদি তার গভীরতা না বুঝতে পার, সামনে যদি কোনো নৌকা বা ভেলা না দেখা যায়, তবে যাঁরা অভিজ্ঞ নাবিক তাঁদের কাছ থেকেই পথের দিশা জেনে নাও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের দিশা না বুঝতে পার, তবু ভ্রান্তির পথে এগিয়ে যেও না। সোজা সহজ পথ (ঋজুপথ) ধরে গেলেই পাবে অষ্ট মহাসিদ্ধি। শান্তিপাদ সংকেতের সাহায্যে বলছেন, বাম ও ডান দুই পথ ছেড়ে দাও (মাঝপথে চল) ; এই পথে ঘাট ঝোপ কিছু নেই ; চোখ বন্ধ করে এই পথে যাওয়া যায়।

নৌকা নদী এবং মাঝির সাহায্যে রূপক সৃষ্টি চর্যাপদের অসংখ্য গানে। নৌকায় খেয়া পারাপারের ইঙ্গিতও চর্যাপদের বহু গানে আছে। কড়ি বা বুড়ী পারের মাশুল হিসাবে নিয়ে খেয়াপার করানো হোত। অনেক সময় অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীরাও খেয়া পারাপারের কাজটি করতেন। ডোম্বীপাদের একটি চর্যায় এই ইঙ্গিত আছে :

চর্যাপদে উপমা ও রূপক ॥

আমরা আধুনিক বুদ্ধির উৎসাহে চর্যাপদকে যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, চর্যাপদগুলি সিদ্ধাচার্যরা লিখেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে এবং ঐ উদ্দেশ্য ছাড়া দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল কি-না, এ কথা বলার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। প্রত্যেকটি চর্যাপদের বিষয়বস্তুই দুরূহ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার আলো-ছায়ায় রহস্যময়। সম্প্রতি কোনো কোনো গবেষক চর্যাপদের ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পদাংশ উদ্ধার করে সেইগুলির বিশদ আলোচনার সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, ধনিক ও গরিবের সংঘর্ষ, উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির বিরোধ ইত্যাদিই চর্যাপদের মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা এবং এই শোষণ শাসন অন্যায় অবিচার ক্রোধ জিঘাংসা বিক্ষোভ— এইসব থেকে মুক্ত হবার আদি বাঙলার জনমানবের দিগ্‌দর্শনই চর্যাপদে প্রচ্ছন্ন। এইভাবে নির্দিষ্ট একটা ছকে ফেলে কাব্যবিচার কত দূর সংগত এবং সার্থক তা অবশ্য বলতে পারি না। আমার নিজের মনে হয়, যে-কাব্য যে-উদ্দেশ্যে রচিত সেইভাবেই তার সার্থকতার বিচার করা বাঞ্ছনীয়। চর্যাপদ মূলত আধ্যাত্মিক কতকগুলি আচরণীয় ও অনাচরণীয় সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত বহন করছে, এবং সেই জিনিসগুলি বোঝাবার জন্যই কতকগুলি প্রতীকবস্তু ব্যবহার করা হয়েছে, উপমা-রূপকের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে সেই উপমা-রূপক-প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করব ॥

চর্যাপদের সমস্ত গান অনুধাবন করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি গানেই হয় কোনো ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা সিদ্ধাচার্য-প্রদর্শিত এবং আচরিত ধর্মসাধনার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই জিনিসটি বোঝাবার বা দেখাবার জন্য তাঁরা স্বভাবতই লৌকিক জগতের বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীর স্বধর্মের যে-সমস্ত বিশেষত্ব তাঁদের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের পক্ষে উপযোগী হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন, সেইগুলিকেই প্রতীক হিসাবে বেছে নিয়েছেন। মাটি, গাছ, ডালপালা, ফুল ; আকাশ ; নদী, নদীর স্রোত, নৌকা, দাঁড়, ঘাট, পাটনী ; অরণ্য ; হরিণ-হরিণী ; ডোম্বী ; মূষিক ; কুঠার, থালাবাটি, বাসন ; সোনা-রূপা ; শবরী, কাপালিক, ব্রাহ্মণ—সমস্তই এক-একটা বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর উপমা ও রূপক হিসাবে চর্যাপদে ব্যবহৃত ॥

মানুষ এবং মানুষের শরীরকে একটি চর্যায় গাছের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে (১ নং)। বৃক্ষের সঙ্গে মানবের আত্মীয়তা অতি প্রাচীন। মানব-সভ্যতার আদিমতম স্তরে এই গাছই ছিল মানুষের সবচেয়ে পরিচিত মূক আত্মীয়। পৃথিবীর সবদেশের প্রাচীন সাহিত্যে তাই গাছের কথা আছেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, গাছের দেহে যেমন পাতা, বল্কল, রস, কাঠ, তেমনি মানুষের দেহে লোম, চামড়া, রক্ত এবং হাড় আর মানুষের মজ্জা বৃক্ষের 'মজ্জোপমা।'* উল্লিখিত চর্যাপদটিতেও মানুষের এই দেহকে তুলনা করা হয়েছে গাছের সঙ্গে। কায়া-তরুর পাঁচটি ডাল বলার অর্থ আমাদের শরীর একটি বৃক্ষ, এবং এর পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি শাখা। লুইপাদের এই চর্যাটিতে যা বলা হয়েছে তাতে সুগভীর আধ্যাত্মিক দর্শনই প্রধান। আমাদের দেহ এবং পঞ্চ-ইন্দ্রিয় নিয়ে এই আমরা, সাংসারিক বিষয়ের আকর্ষণে এবং প্রভাবে আমাদের চিত্ত চঞ্চল হয়, সেইজন্যই আমরা বিবিধ দুঃখ ভোগ করি এবং শেষে কালকবলিত হই। কিন্তু এই চঞ্চলতা দূর করে মহাসুখ বা নিত্যানন্দ লাভ করবার জন্যে আমাদের দৃঢ়চিত্ত হতে হবে, যোগ ধ্যান সমাধি এসব ক্ষণিক উপায়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে ভ্রান্তিবশতই আমরা জগৎকে প্রত্যক্ষ করছি, এই বোধটাকে মনে দৃঢ় করে নিয়ে, শূন্যতার সাধনা আমাদের করতে হবে। এই আধ্যাত্মিক উপদেশটিই এই চর্যাতে গাছ, গাছের ডালপালা, গুরুকে জিজ্ঞাসা করা, পিঁড়িতে স্থির হয়ে বসা ইত্যাদি রূপকের সাহায্যে বিবৃত হয়েছে॥

দ্বিতীয় চর্যাপদটিতে রূপক সৃষ্টি করা হয়েছে দুলি, পিটা, গাছের তেঁতুল, কুমির, কানের স্বর্ণাভরণ, চোর, শ্বশুর, বধূ ইত্যাদির সাহায্যে। এমনিতে এই চর্যাগীতিটির অর্থ সরল—কচ্ছপ দুইয়ে পাত্রে দুধ ধরা যাচ্ছে না, গাছের তেঁতুল-সব কুমিরেই খেয়ে নিচ্ছে। ঘরের আঙনে শ্বশুর নিদ্রিত হল, বধূটি জেগে আছে, কারণ তার 'কানেট' চোরে নিয়ে গেছে। দিনের বেলা বউটি কাকের ডাকে ভয়ে চমকে উঠে আর রাত্রি হলে সে কামে প্রীত হতে চলে যায়। এই-যে চর্যাটি কুক্কুরীপাদ রচনা করেছেন তার অর্থ কোটিতে গুটিক লোক বোঝে। 'কোড়ি মাঝেঁ এঁকু হিঅহি সমাইড়'—কথাটি একটু বেশি বলা হলেও এর গূঢ়ার্থটি বোঝা সত্যিই কঠিন। কারণ এখানে দুলি বা কচ্ছপ বলতে বোঝাচ্ছে দ্বৈতভাব যাতে লীন হয়েছে এই রকম মহাসুখকমল। দুধ দুইয়ে যে-পাত্রে রাখা হয় তার নাম পিটা ঠিকই, কিন্তু এখানে পিটা অর্থ শরীরের ভিতরের ২৪টি পীঠ, যে-পীঠে শূন্যতা-

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩,৯।২৮॥

কাহ্নু বিলসই আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥
জিম জিম করিণা করিণেরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥ [চর্যা : ৯]

কাহ্নপাদ নিজেকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করে বলছেন, 'স্তম্ভে আবদ্ধ হাতি বিবিধ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে মদমত্ত হয়ে সমস্ত খুঁটি ভেঙে ফেলে পদ্মবনে প্রবেশ করল। হাতিরা হস্তিনীকে দেখে আসক্তিমদ বর্ষণ করে, তেমনি কাহ্নপাদ নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গ পেয়ে তথতা বা নির্বাণ-মদ বর্ষণ করছেন।' মহীধরপাদের একটি চর্যাতেও পাগলা হাতির বর্ণনা আছে :

মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে ঘোলই॥
পাপ পুণ্ণ বেনি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ-টাকলি লাগিরে চিত্তা পইঠ নিবাণা॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চ-বিষয়রে নায়করে বিপখ কোবি ন দেখি॥ [চর্যা : ১৬]

—মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র ধায় : নিরন্তর গগনে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। পাপ পুণ্য এই দুটি শিকল ছিঁড়ে এবং খাম্বা (স্তম্ভ) ভেঙে গগন শিখরে উঠে চিত্ত নির্বাণে প্রবেশ করল। ত্রিভুবন উপেক্ষা করে সে মহারসপানে প্রমত্ত হল। পঞ্চ-বিষয়ের নায়ক হয়ে সে বিপক্ষজনকে দেখে না।

বন্য হাতি ধরার আগে গান গেয়ে বোধ হয় হাতিকে বশ করার প্রথা ছিল ; অন্তত সেই রকম একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বীণাপাদের একটি চর্যায় :

আলি কালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস-সান্ধি গুণিআ॥

চর্যাগীতি-রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম শবরপাদের দুটি চর্যায় (২৮ নং, ৫০ নং) আদিবাসী শবরদের ঘরবাড়ি জীবনযাত্রার বিশদ বর্ণনা আছে। এই রকম বিস্তৃত নিখুঁত বর্ণনা দেখে অনেকে সন্দেহ করেছেন, শবরপাদ নিজে বোধ হয় শবর ছিলেন। ২৮ নং চর্যায় তিনি বলেছেন, জনবসতি থেকে অনেকদূরে উঁচু উঁচু পর্বতে 'বসই সবরী বালী'। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ' তার মাথার খোপায়, গলায় 'গুঞ্জরী মালী' বা গুঞ্জার মালা। 'ণাণা তরুবর মোউলিল রে' আর সেই গাছের ডাল গগন স্পর্শ করেছে, আর একেলা শবরী 'এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী'। তিন ধাতুতে তৈরী খাটে শবর সুখেতে শয্যা বিছায় আর শবরী বালিকা-বধূকে বুকে নিয়ে 'পেক্ষ

রাত্তি সুখে পোহাইলি।' 'কাপুর' দিয়ে মহাসুখে সে 'তাঁবোলা' খায়। উন্মত্ত শবর মাঝে মাঝে নেশার ঝোঁকে শবরীকে ভুলে যায়, রাগ করে বসতবাড়ি থেকে অনেক দূরে 'গিরিবর-সিহর সন্ধি পইসন্তে' (পাহাড়ের চূড়ায় গুহাতে প্রবেশ করে), শবরী তখন তাকে কোথায় খুঁজে পাবে!

৫০ নং চর্যায় শবরপাদ বলেছেন শবরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে। পাহাড়ের চূড়ায় 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী', সেখানে 'মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইয়া সুণমেহেলী'। সেই বাড়ির পাশে 'ঘুকড় এবে রে কপাসু (কার্পাস) ফুটিলা'। বাড়ির পাশে যখন জ্যোৎস্না উঠল তখন 'ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ।' বাড়ির পাশের ক্ষেতে 'কঙ্গুচিনা (কংনি দানা) পাকেলা রে' এবং সেই দানা থেকে হাঁড়িয়া তৈরী করে পান করে 'শবর শবরি মাতেলা' আর নেশায় ভোর হয়ে 'অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা'। বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়া দিয়ে সেই ঘর তৈরী। শকুন আর 'শিয়ালী' বাড়ির পাশে কাঁদে। শবর মরলে তাকে 'ডাহ কএলা'।

শকুন শেয়াল ছাড়া ইঁদুরের উপদ্রবও বোধ হয় ছিল (নিশি অন্ধারী মুসার চারা)॥

আগেই বলা হয়েছে, পথে নদীতে ডাকাতের ভয় ছিল। কিন্তু দেশে থানা দারোগাও ছিল। যদিও 'বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ (বাটেতে রয়েছে ভয়, দস্যু বলবান) তবুও ভরসার কথা, চোর ধরবার জন্য 'দুসাধী' (দারোগা) ছিল আর বিচারের জন্য ছিল 'উআরি' (থানা বা কাছারি)॥

চর্যাপদে প্রাপ্ত দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ লৌকিক রূপের জগতের উপাদানগুলি সিদ্ধাচার্যদের সুগভীর আধ্যাত্মিক দর্শন বোঝানোর জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছিল, ঐতিহাসিকের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে নিশ্চয় নয়। কিন্তু উপাদান নির্বাচনে তাঁরা কোনো অদ্ভুত অবাস্তব অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনে নিত্য দ্রষ্টব্য জিনিসগুলিই তাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেবও তাঁর উপদেশগুলিতে সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ-দুঃখের আলো-আঁধারিতে ঘেরা জীবনকেই রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রভু খ্রীস্টের উপদেশগুলিও ছিল সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে। বুদ্ধজাতকেও বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বোঝানোর জন্যে যে-সমস্ত কাহিনীর অবতারণা, সেখানেও রাজা, শ্রেষ্ঠী, বণিক, শ্রমণ, ক্ষপণক, সূত্রধর, তন্তুবায়, কৃপণ, নির্দয়, চোর—ইত্যাদির শ্রেণীবদ্ধ মিছিল। চর্যাপদ-রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের গীতি-কবিতাতেও সেই ব্রাহ্মণ শবর ব্যাধ সূত্রধর বাজীকর পাটনী চোর ডাকাত গৃহস্থ ভূস্বামী পুরোহিত শ্রেণীর লোকের পাশাপাশি অবস্থান। বলা বাহুল্য, সুগভীর জীবনবোধই তাঁদের এই ধরনের রূপক ব্যবহার করতে প্রেরণা দিয়েছে॥

প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাতে এই কথাই বলা হয়েছে, অবিদ্যায় কবির চিত্ত যখন মোহিত ছিল, তখন আলি কালি অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকভাসের দ্বারা তাঁর নির্বাণ লাভ করার রাস্তা বন্ধ ছিল, পরে গুরুর আশীর্বাদে তিনি জ্ঞান লাভ করে নিজের মনকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছেন। এখন তিনি তাই মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত, ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপ সুখে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত, এই মহাসুখের জন্য অন্য কোথাও বাস করার প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু যাঁরা আগম, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করে কেবল মননের দ্বারা সেই মহাসুখকে পেতে চান, তাঁরা এর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেন না, কারণ কেবল মননের দ্বারা তো মহাসুখ বা পরমার্থতত্ত্ব জানতে পারা যাবে না। বস্তুজগতে পরস্পর যে-বিভিন্নতা কল্পনা করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে বিকল্পজাত। যাঁরা পরমার্থতত্ত্ব জানতে পেরেছেন তাঁরা এই ভববিকল্প জাল ছিঁড়ে ফেলে সেই বিভিন্নতার ধারণা লুপ্ত করে দিয়েছেন। সিদ্ধাচার্য আরও বুঝেছেন, জগতে যা-কিছুই উৎপন্ন হয়েছে তাই বাহ্যত লুপ্ত হয়েছে; কিন্তু পরমার্থ যাঁরা বুঝেছেন, সেই যোগীরা এই উৎপত্তি ধ্বংসের আসল কারণটা তো জানেন, তাই এতে তাঁরা আর বিচলিত হন না। তাঁরা তো জানেনই যে, পৃথিবীতে কিছু আসেও না, কিছু যায়ও না। কাহ্নুপাদ তা জানেন এবং বোঝেন বলে তিনি বিশুদ্ধমনা হতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন, জিনপুর বা মহাসুখপুর তাঁর খুব কাছেই। কিন্তু অবিদ্যায় মোহিত মন নিয়ে তো সেখানে যাওয়া যাবে না, মহাসুখের আস্বাদও লাভ করা যাবে না।

কম্বলাম্বরপাদের একটি চর্যায় (৮ নং) নৌকা, নৌকায় বাহিত বাণিজ্যপণ্য, দাঁড়, কাছি ইত্যাদির সাহায্যে যে-তত্ত্বটি প্রকাশিত, তাতে লৌকিক জীবনের উপরোক্ত উপাদানগুলি সুন্দর তত্ত্বময় আধ্যাত্মিক দর্শনের ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো হয়েছে। এই চর্যাটির আরম্ভের দুটি পঙ্‌ক্তি বড় সুন্দর—আমার করুণা-নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ, রূপা-যে রাখব তার জায়গা নেই। এখানে সোনা অর্থ সর্বশূন্যতা, আর রূপ বেদনা ও পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত বস্তুজগৎকে বলা হয়েছে রূপা। পরে কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন, তুমি এই চিত্ত-নৌকাকে গগনের বা নির্বাণের দিকে লক্ষ্য করে বেয়ে চল, এতে তোমার গতজন্ম আর ফিরে আসবে না, তুমি নবজন্ম লাভ করবে। কীভাবে এই নির্বাণের দিকে নৌকা বেয়ে যাবে? প্রথমে আভাষ দোষের খুঁটিগুলি উপড়ে ফেলতে হবে, অবিদ্যার কাছি খুলে ফেলতে হবে, গুরুর প্রসাদে চিত্তকে পরিপূর্ণ করে নিয়ে মহাসুখের সমুদ্রের দিকে বেয়ে চলতে হবে। এইভাবে নির্বাণের দিকে যাত্রা করলে, চারিদিকে নজর রেখে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলে আর সংসারের ঘূর্ণিতে পড়তে হবে না। গুরুর উপদেশই হচ্ছে কেড়ু-

আল বা ক্ষেপণী—সেই দাঁড় হাতে না নিলে, তাকেই নৌকায় প্রধান অবলম্বন না করলে সংসার-সমুদ্র তো পার হওয়া যাবে না। এইভাবে বাম দক্ষিণ অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ আভাস ছেড়ে মাঝখান দিয়ে বা বিরমানন্দ (নির্বাণ) পথের সঙ্গে যুক্ত থেকে অগ্রসর হলে তবেই মহাসুখ-সংগমে পৌছানো যায়॥

নৌকা এবং নৌকার আনুষঙ্গিক উপকরণকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কাহ্নপাদের আরেকটি চর্যায় (১৩ নং)। সেখানে তাঁর বক্তব্য—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণ হলো নৌকা, তাতে আটটি কামরা, অর্থাৎ অণিমা লঘিমা ইত্যাদি আটটি বুদ্ধৈশ্বর্য; নিজের দেহ বোধিচিত্ত, অন্তঃপুরে মহাসুখ। এইগুলির মিলনের ফলে সমস্ত পার্থিব ব্যাপারকে যেন মায়াময় ও স্বপ্নোপম মনে হচ্ছে। এই ত্রিশরণ নৌকায় কাহ্নপাদ, ভবজলধি অতিক্রম করেছেন এবং মহাসুখের তরঙ্গকে তাঁর মনে তন্ময়ভাবে অনুভব করেছেন। নিজেকে সম্বোধন করে কাহ্নপাদ বলছেন, মায়াজাল এড়িয়ে কায়া-নৌকা বেয়ে যাও; পঞ্চ তথাগত বা পঞ্চজ্ঞানকে তোমার ক্ষেপণী করে বিষয়-সমুদ্র বেয়ে চল। গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়গুলি যেমন আছে তেমনি থাক, নিদ্রাবিহীন স্বপ্নের মতো তারা এখন অলীক। শূন্যতারূপ নৌকাপথে চিত্ত-রূপ কর্মধারাকে আরোপ করে কবি মহাসুখসংগমে চলেছেন॥

বস্তুত নদী, নৌকা, নৌকার বিভিন্ন উপকরণ, নাবিক ইত্যাদি নিয়ে রূপক সৃষ্টির দিকে প্রবণতা চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের ছিল বেশি। ডোম্বীপাদ রচিত (১৪ নং) চর্যাপদটিতেও দেখছি, কবি বলছেন, গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপিণী গঙ্গা-যমুনার মধ্যে বিরমানন্দ অবধূতী-মার্গে এক নৌকা বাহিত হয়। সহজযান-প্রমত্তাঙ্গী নৈরাত্মা-ডোম্বী ঐ নৌকাতে যোগীন্দ্রকে পার করে; বিরমানন্দের ঐ পথ ধরে শীঘ্র বেয়ে চল, পথে দেরী কোর না, গুরুর পাদপ্রসাদে আমি আবার জিনপুর বা মহাসুখপুরে যাব। নৌকায় পাঁচটি দাঁড়—এই পাঁচটি দাঁড় হচ্ছে গুরুর পাঁচটি ক্রমোপদেশ, পীঠ হচ্ছে মণিমূল। সেখানে বোধিচিত্তকে সহজানন্দে দৃঢ়রূপে ধারণ করে শূন্য সেঁউতিতে বিষয়তরঙ্গরূপ জলকে সেঁচে ফেলে দাও, যেন তা দেহে প্রবেশ করতে না পারে। এর তাৎপর্য—নির্বাণ মার্গে যেতে হলে গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধনা করতে হবে, মণিমূলে সহজানন্দ দৃঢ়রূপে ধারণ করতে হবে এবং বিষয়তরঙ্গের স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। চন্দ্র সূর্য এবং পুলিন্দার অর্থ যথাক্রমে প্রজ্ঞাজ্ঞান, অদ্বয়জ্ঞান, এবং নপুংসকত্ব বা নিরুপাধিত্ব। এই তিন রকম বিকল্প সৃষ্টিকে সংহার করে বামদক্ষিণ বা অগ্রপশ্চাৎ নজর না করে তুমি বিলক্ষণ পরিশোধিত বোধিচিত্ত-নৌকা বেয়ে চল। নৈরাত্মা-ডোম্বী পার করার জন্য কপর্দকও নেয় না কিংবা পরিচর্যাও প্রত্যাশা করে না, সে স্বেচ্ছায় পার করে। কিন্তু এই পথ অবলম্বন

-রূপ বস্ত্রকে কুম্ভকযোগী ছাড়া অনভিজ্ঞরা ধারণ করতে পারে না। গাছ তো আমাদের এই দেহ আর তেঁতুল হচ্ছে বোধিচিত্ত বা আমাদের দেহবৃক্ষের ফল। ঘরের আগুন হচ্ছে 'শরীররূপ গৃহে উষ্ণীষ কমলে যে বিরমানন্দ' তার প্রতীক। চোরে কানেট নিয়ে গেল কথাটির মানে সমাধিস্থ অবস্থায় অনুভূত সহজানন্দ প্রবেশাদিবাত দোষ অপহরণ করেছে। 'বহুড়ী' বা বধূ বহু জায়গায় 'যোগীন্দ্রস্য গৃহিণী নৈরাত্মা-দেবী'। দিনের বেলা বধূটি কাকের ডাকে ভীত হয় আর রাত্রে কামতৃপ্তির জন্য কোথায় চলে যায়—এই বহু-ব্যবহৃত প্রবাদ-বাক্যটির সাহায্যে কুক্কুরীপাদ বলতে চাইছেন, চিত্তের সজাগ অবস্থাই হচ্ছে দিন এবং সেই সজাগ অবস্থায় দৃশ্য দর্শনের হেতু ত্রিজগৎ সৃষ্ট হয় আর চিত্তের ক্ষয় হলেই জগৎ তিরোহিত হয়। চিত্ত যখন সজাগ অবস্থায় দৃশ্য দর্শন হেতু ত্রিজগৎ সৃষ্টি করে, তখন সেই জগতের চেহারা দেখে তার বিষয়সম্বন্ধ অনুভব করে সে ভীত হয়। কিন্তু রাত্রি হচ্ছে সুষুপ্তি। চিত্ত যখন মহাযোগ নিদ্রায় নিদ্রিত, প্রজ্ঞাজ্ঞানের উদয়ে সে তখন নির্বিকল্প—তার তো তখন আর ভয় নেই, সে তাই সেই সময় নির্ভয়ে কামরূপে অর্থাৎ মহাসুখস্থানক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে।

পঞ্চম চর্যাগীতিটিতে নদী, নদীর কর্দম-অনুলিপ্ত তীরভূমি, সাকো ইত্যাদির সাহায্যে যে-রূপক সৃষ্টি করা হয়েছে তা শুধু আধ্যাত্মিক অর্থেই সুন্দর বা মূল্য-বান নয়, কাব্যধর্মেও অপূর্ব। এই চর্যাগীতিতে সিদ্ধাচার্য চাটিল বলছেন, আমাদের এই পৃথিবী একটা নদীর মতো, নদীর ঢেউয়ের মতো দিনরাত এখানে বিষয়-তরঙ্গ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে—তাই পৃথিবীরূপী নদী গহন বা ভয়ংকর। বেগে প্রবাহিত এই নদী নানা দোষের প্রবাহ হেতু গভীর, দুই তীরে বিবিধ দোষের কর্দমে অনুলিপ্ত, মধ্যে থৈ পাওয়া যায় না—সুতরাং এই নদী পার হওয়া কঠিন। এই পৃথিবীটা-যে একটা ভূত-বিকার তা তো সাধারণ লোকে জানে না। সেইজন্যে বিবিধ বিষয়-তরঙ্গে সদা-উদ্বেলিত দুলঙ্ঘ্য এই পৃথিবীকে যারা অতিক্রম করতে চায় তাদের জন্য সিদ্ধাচার্য চাটিল একটি সেতু তৈরী করে দিয়েছেন। কীভাবে সেই সেতু তৈরী হবে? আমাদের মনের মধ্যে যে-মোহতরু তা থেকে সংগ্রহ করতে হবে সেতুর কাঠ অর্থাৎ আমাদের চিত্তের বিষয়-গ্রহ বা মোহের জনক কায়, বাক্, মনকে আলাদা আলাদা করে ফেলে মোহ ধ্বংস করতে হবে; জ্ঞান দিয়ে সেই টুকরোগুলিকে জুড়ে দিতে হবে, শেষে অদ্বয়জ্ঞানরূপ কুঠার দিয়ে নির্বাণ সুদৃঢ় করে সেতু বানাতে হবে।

এই সেতুর উপর উঠে কিন্তু ডানদিক বাঁদিক বা এলোমেলো চললে চলবে না। গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব ছাড়তে হবে—এবং এইভাবে চললেই সিদ্ধিলাভ করতে

পারা যাবে। চাটিল আরও বলেছেন, যারা এই গহন গম্ভীর ভবনদী পার হতে চায়, তাদের উচিত অনুত্তরস্বামী বা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু চাটিলকে জিজ্ঞাসা করা, কেন-না সহজিয়া যোগী ছাড়া আর কেউ তো এই তত্ত্ব জানে না।

হরিণ শিকারের রূপক অবলম্বনে ভুসুকুপাদ যে-চর্যাটি রচনা করেছেন (৬ নং) সেটিও কাব্যধর্মিতার দিক দিয়ে সুন্দর। এই চর্যাটিতে তিনি আমাদের চঞ্চল চিত্তকে তুলনা করেছেন চঞ্চল হরিণের সঙ্গে। চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে শিকারীরা যেমন হরিণকে মারবার চেষ্টা করে, তেমনি কাল বা মৃত্যুরূপী শিকারী চারদিক থেকে তাঁকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছিল। এই অবস্থায় পার্থিব হরিণ যেমন হরিণীর ডাক শুনে নিজেকে মুক্ত করে আনতে পেরেছিল, সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদও তেমনি নৈরাত্মাকে গ্রহণ করে সেই মৃত্যুর আবেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। নিজের মাংসই তো হরিণের শত্রু, তেমনি অবিদ্যার দ্বারা মুগ্ধচিত্ত হরিণের মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি দোষই তার শত্রুতা করে। ভুসুকু তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সদগুরুর উপদেশের বাণ দিয়ে তিনি তাঁর দোষদুষ্ট চিত্ত-হরিণকে আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। শিকারীর আক্রমণে, আঘাতে বিমূঢ় হরিণ যেমন তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না—তেমনি তাঁর চিত্ত-হরিণও নিজের বিপদের কথা বুঝতে পেরে জাগতিক ভোগ ত্যাগ করে বিপদশূন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে হরিণী বা নৈরাত্মাদেবীর আবাস তো জানে না ; তাঁকে তো ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না—তাই সে তাঁর সন্ধান করতে পারছে না। এমন সময় নৈরাত্মাদেবী তাঁকে যেন বললেন, এই বন ছেড়ে অন্য বনে যেতে অর্থাৎ তাঁর কায়-বন ছেড়ে ভয়শূন্য মহাসুখ-কমল বনে গিয়ে বিচরণ করতে। এই কথা শুনে হরিণ এত দ্রুত গমন করল যে, তার ক্ষুরের উত্থান-পতন দেখা গেল না। ভুসুকু সব শেষে বলেছেন—এই তত্ত্ব মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

জানি না, জ্ঞানীর মস্তিষ্কেই বা কতখানি এই তত্ত্ব বোধগম্য হবে, তবে চঞ্চল চিত্তকে হরিণের সঙ্গে, জাল দড়ি নিয়ে সাক্ষাৎ যমের মতো ভীষণ শিকারীকে মৃত্যুর সঙ্গে, হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রু তার নিজ দেহের মাংসের সঙ্গে মানুষের মনের মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি অবিদ্যার, শিকারীর বাণকে সদগুরুর উপদেশের সঙ্গে, আহারে জলপানে বিমুখ বিমূঢ় হরিণের সঙ্গে জাগতিক সুখভোগে অনাকাঙ্ক্ষী নিজের চিত্তের, এক বন ছেড়ে অন্য বনে যাওয়ার সঙ্গে কায়াবন ছেড়ে ভব-ভয়শূন্য মহাসুখ-কমল-বনে বিচরণ করার যে-রূপকগুলি কবি রচনা করেছেন, নিঃসন্দেহে কাব্য হিসাবে তা বিশেষভাবে উপভোগ্য ॥

কাহ্নুপাদের রচিত সপ্তম চর্যাটিতেও কবি কয়েকটি রূপকের সাহায্যে যে-তত্ত্ব

দিয়ে কবি বলছেন, 'হে যোগি, পবনের মতো চঞ্চল চিত্তকে মার, যাতে সংসার-নরকে বারবার যাতায়াত করতে না হয়।' মূষিক চঞ্চলতার জন্যেই নিজের দেহ বিদীর্ণ করে নানা দুর্গতি ভোগ করে। তেমনি চঞ্চল চিত্তকে যদি বশে আনা না যায়, তবে তার দোষে সংসারে নানা দুঃখকষ্ট পেতে হবে। সেইজন্যই যোগীকে চঞ্চল-চিত্ত-রূপ মূষিকের দোষ নাশ করতে হবে'। চিত্তের বা মনের তো কোনো বর্ণ নেই, তাই সে কালো। যেমন আকাশের কোনো রূপ নেই, অথচ নাম আছে, মনও তেমনি রূপহীন অথচ নামময় জড়বস্তু। একমাত্র নির্বাণের গগনে উঠেই চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে মনোধর্মের অতীত অবস্থায় উপনীত হয়। চিত্তমূষিক মোহবশতই চঞ্চল হয় বা মোহমদে গর্বিত থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশে তাকে নিশ্চল করতে হবে, তখন এবং একমাত্র তখনই, ভুসুকুপাদ বলছেন, এই যন্ত্রণাময় ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে॥

একটি চর্যায় (৩৩ নং) বিচিত্র বিরোধের মধ্যে দিয়ে একটি দুরূহ তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ঢেণ্ঢনপাদ রচিত এই চর্যায় কবি বলেছেন, টিলার উপরে আমার ঘর, সেখানে প্রতিবেশী কেউ নেই; হাঁড়িতে নেই ভাত, তবু নিত্যই সেখানে অতিথি ভিড় করে। এর রূপক অর্থ, অসদ্‌রূপ কায় বাক চিত্তের সমস্ত প্রকৃতিদোষ যে-মহাসুখচক্রে লয়প্রাপ্ত হয়েছে, তান্ত্রিকদের মতে, সেই মহাসুখচক্র কায়ারূপ সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত বলে তাকে বলা হচ্ছে টিলা। পাশের চন্দ্র সূর্য অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব তাতেই লীন হয়েছে বলে প্রতিবেশী কেউ নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অর্থ দেহের মধ্যে চিত্ত নেই; গুরুপ্রসাদে নিত্যই তিনি তা বুঝতে পেরেছেন, নৈরাত্ম-অতিথি নিত্য নিত্য তাঁর দেহে ভিড় করেছে। নিরাবয়ব অর্থাৎ সর্বশূন্য এই সংসারের জ্ঞান কবির নিত্যই বেড়ে যাচ্ছে, পরমবিজ্ঞানে তাঁর চিত্ত অধিষ্ঠিত। দোয়ানো দুধ আবার গোরুর বাঁটে ফিরে যাচ্ছে—এর মানে, বজ্রাগার থেকে এসে তাঁর বোধিচিত্ত মহাসুখচক্রে গমন করছে। দুগ্ধ অর্থ এখানে বোধিচিত্ত। বলদ প্রসব করল, গাভী বন্ধ্যা, তিনসন্ধ্যা তাকে পাত্র ভরে দোয়ানো হল। বোধিচিত্ত এখানে বলদের রূপক। সক্রিয় মন থেকে রূপজগতের সৃষ্টি হয় বলে বোধিচিত্তকে বলদ বলা হয়েছে। বলদ প্রসব করে মানে বোধিচিত্তরূপ জগতের সৃষ্টি করে। এখন এই বোধিচিত্ত যখন জাগতিক মোহ অতিক্রম করে নৈরাত্মতা লাভ করে, তখন তার দৃশ্য দর্শনের বোধ তিরোহিত হয়। বোধিচিত্তের সহজ প্রকৃতি হচ্ছে এই নৈরাত্মা—সেই নৈরাত্মাকে এখানে বলা হয়েছে বন্ধ্যা গাভী। কায়, বাক্‌ ও চিত্তের আভাসে গঠিত অবিদ্যাপীঠ কবির দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা বা সর্বদা দোহন করা হচ্ছে। 'যে বোকা, সে-ই আবার বুদ্ধিমান, যে চোর, সে-ই আবার

সাধু।" এর তাৎপর্য, যে-চিত্ত সবিকল্প জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়-সুখকে অন্যায়ভাবে আহরণ করে সে-ই তো চোর—আবার সেই চোরই নির্বিকল্প জ্ঞান লাভ করলে হয় সাধু। শেষে কবি বলছেন, নিত্য নিত্য শেয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এর মানে, সব সময়ে মরণের ভয়ে ভীত সংসার-চিত্ত হচ্ছে শেয়ালের মতো; তা যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন সে সহজানন্দরূপ সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এগিয়ে আসে, সহজানন্দকে আয়ত্ত করবার জন্যে সে তখন ব্যগ্র হয়। স্বভাবতই এই বিরোধমূলক রূপকের জন্যে 'ঢেণ্ঢনপাদের গীত বিরলে বুঝই'—কোনো কোনো লোক বুঝতে পারে, সবাই পারে না। চর্যাপদের এই গীতটির সঙ্গে মধ্যযুগের সাধক-কবি কবীরের একটি দোহার আশ্চর্য মিল আছে। দোহাটি এই:

অব কেয়া করে গান গাব-কতুআলা
শ্ব মাংস পসারি গীধ রাক্ষউআলা।
মূষ কী নাও বিলাই কাঁড়ারী
শোএ মেড়ুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াঅএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরী দুহাওএ এ তিন সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে যুঝে
কহে কবীর বিরলজন বুঝে॥

আগে এক জায়গায় বলেছি; বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনুসরণে চর্যাপদের কবি গাছের সঙ্গে মানবদেহের রূপক সৃষ্টি করেছেন। প্রথম চর্যা-গানটিই এর উদাহরণ। ৪৫ নং চর্যায় কাহ্নুপাদ এরই একটু রকমফের করে বলেছেন, মন হচ্ছে তরু, পঞ্চেন্দ্রিয় তার শাখা, বাসনাগুলি তার পাতা এবং ফল। সদ্‌গুরুর বা বজ্রগুরুর উপদেশ কুঠারের মতো, যা দিয়ে মনতরুকে এমনভাবে ছেদন করতে হবে বা মনের বিকারগুলি ধ্বংস করতে হবে, যাতে সেই বিকারগুলি আর জন্মাতে না পারে। গাছ উৎপন্ন হয় মাটিতে, তাতে করতে হয় নিত্য নিয়মিত জলসেক। তেমনি পাপ-পুণ্যরূপ জলসেকে চিত্ততরু জন্ম নেয় মনের মাটিতে। গুরুর উপদেশে বিজ্ঞ যোগীরা এমনভাবে সেই মনবৃক্ষকে ছেদন করেন যাতে আর সে বাড়তে পারে না। অনেকে সেই বৃক্ষচ্ছেদনের রহস্য জানে না, তাই তারা মোক্ষমার্গ থেকে অপসৃত হয়ে সংসারের দুঃখসাগরে পতিত হয়। সেই জন্যেই কাহ্নুপাদ বলেছেন, অবিদ্যার, মনোবিকারের এই তরুকে গগন বা প্রভাস্বর কুঠারের সাহায্যে এমনভাবে ছেদন কর যাতে তার শাখা পাতা মূল কিছুই উৎপন্ন হতে না পারে, চিত্ত যাতে আর কোনোদিন ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে কষ্ট না পেতে পারে॥

করে যারা সাধনা করতে জানে না, তারা এগোতে না পেরে কূলে কূলেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ॥

সমুদ্র নৌকা এবং দাঁড় নিয়ে শান্তিপাদের একটি চর্যায় (১৫ নং) বলা হয়েছে, বালযোগীরা মায়ামোহরূপ সংসার-সমুদ্রের অন্ত এবং গভীরতা বুঝতে পারে না:— তত্ত্বজ্ঞান না জন্মালে তো এর স্বরূপসম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। গুরুর উপদেশ ছাড়া তো এই সমুদ্র পার হওয়ার উপায় নেই ॥

একটি চর্যায় দাবাখেলাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে (১২ নং)। এই রূপকটিও প্রয়োগ-চাতুর্যে চমৎকার। চিত্তের সমস্ত দোষ দূর করে স্বরূপে অবস্থিত করুণাময় চিত্তকে পীঠ করে যেন চতুর্থানন্দবল (কায়-বাক-চিত্তের অতীত) রূপ দাবা খেলা হচ্ছে। গুরুর উপদেশে অবিরত আনন্দযোগ খেলা করার ফলে ভব-বল অক্লেশে জেতা হয়েছে। কীভাবে এই ভব-বলকে জয় করা হয়েছে? প্রথমে লোকজ্ঞান ও লোকাভাস—এই দুটো আভাসকে নাশ করা হল, অবিদ্যামোহিত চিত্তের প্রতীক ঠাকুর বা দাবাখেলার রাজাকে মারা হল। এখন দেখা যাচ্ছে, মহানন্দময় জিনপুর খুব কাছে, নিত্যানন্দ অনুভূতি পাওয়ার সময় এসেছে। দাবাখেলার বড়েগুলি হচ্ছে নানারকম প্রকৃতি-দোষের রূপক। নির্বাণ-আরোপিত চিত্ত হচ্ছে গজ, দাবার মন্ত্রী হচ্ছে প্রজ্ঞা, রাজাকে মাত করা অর্থ চিত্তকে অচঞ্চল বা নির্বাণে আরোপিত করা। দাবাখেলার ছকের ৬৪টি ঘর হচ্ছে নির্মাণচক্র। এই উপমাগুলির সাহায্যে কবি বলতে চেয়েছেন প্রথমেই প্রকৃতিদোষকে উৎপাটিত করা হল, নির্বাণ-আরোপিত চিত্তের দ্বারা অহংকার ইত্যাদি পঞ্চবিষয়গত দোষকে ঘায়েল করা হল, প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তকে নির্বাণে আরোপিত করে রূপাদি বিষয়সমূহ-ভব-বলকে জেতা হল। উপসংহারে কাহ্নপাদ বলছেন, দেখ আমি কেমন ভালো দান দিই, নির্মাণচক্ররূপ চৌষট্টি কোঠায় আমি মন স্থির রেখেছি ॥

১৬নং চর্যার সিদ্ধাচার্য মহিণ্ডাপাদ মত্ত মাতঙ্গের রূপক অবলম্বনে যে-কথাটি বলতে চেয়েছেন তার অভিনবত্ব সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চর্যায় তিনি বলছেন, মোহাভিভূত চিত্তবৃক্ষকে ছেদন করে কায়, বাক আর মন—এই তিনটি পাট তৈরী করে জ্ঞানমদিরা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল। এই অবস্থায় যখন সহজস্বভাবে প্রবেশ করা হল, তখন ভয়ংকর শূন্যতা শব্দের ঘনগর্জন শোনা গেল। তা শুনে সংসারের দুঃখের কারণভূত 'মার'গুলি নিজের স্কন্ধ ধাতু আদি ছোট ছোট মণ্ডল সমবয়সীভাব পেয়ে সবই ধ্বংস হয়ে গেল। তখন চন্দ্র-সূর্য দিনরাত সমস্ত বিকল্প ধ্বংস করে জ্ঞানামৃতপানে প্রমত্ত কবির চিত্তরূপ গজেন্দ্র অবিরত বিরমানন্দরূপ শূন্যগগনের দিকে ধাবিত হয়, কারণ সেখানে মহাসুখ-সরোবর বর্তমান আছে। পাপ-পুণ্য এই দুই সংসার-শিকল

ছিঁড়ে, লোকভাস এবং লোকজ্ঞান এই দুটো অবিদ্যার স্তম্ভকে মর্দন করে কবির চিত্ত গগনশিখরে গিয়ে নির্বাণে প্রবেশ লাভ করল। সেই সময় কবির চিত্ত ত্রিভুবনের সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করে—অথবা ভাববিকল্প পরিহার করে মহারসপানে প্রমত্ত হয়ে পঞ্চবিষয়ের (অহংকার ইত্যাদি পঞ্চদোষ) নায়কত্ব বা আধিপত্য লাভ করল। আর সে মহাসুখের বিপক্ষ বা শত্রুরূপ ক্লেশাদি কিছুই অনুভব করে না। মহাসুখরাগ অনল দ্বারা সন্তাপিত হয়ে এখন কবির চিত্ত স্বর্গ-গঙ্গারূপ মহাসুখসরোবরে গিয়ে প্রবেশ করছে—এই কথাই সিদ্ধাচার্য মহিণ্ডাপাদ বলতে চেয়েছেন। ঐ রকম বিরমানন্দে বিমগ্ন থেকে এখন তিনি সুখের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারছেন না—কারণ তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে নির্বিকল্প হয়েছেন॥

সতের নং চর্যাগীতিতে বীণা এবং সংগীতের রূপকে যে-কথাটি বলা হয়েছে তাও কাব্যমাধুর্যে মহীয়ান। এই চর্যাটিতে অতি অভিনবভাবে বীণা বাজানোর উপমা দিয়ে নির্বাণ তত্ত্ব বোঝানো হয়েছে। বীণা তৈরী করতে লাউয়ের খোল, তন্ত্রী বা তার ও একটা দণ্ডের প্রয়োজন। এখানে সূর্য হচ্ছে লাউ, চন্দ্র হচ্চে তন্ত্রী—এদেরকে অনাহত দণ্ডে বা শূন্যতা দণ্ডে লাগানো হয়েছে। কবি এই অপরূপ বীণা বাজাতে বাজাতে নৈরাত্মা দেবীকে সখি কল্পনা করে বলছেন, 'ওলো সই, দেখা, অনাহত হেরুক বীণা বাজছে, তার তন্ত্রীর শূন্যতাধ্বনিতে চারিদিকে মধুর শব্দ উঠছে'—এর তাৎপর্য নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গ হেতু সমস্ত অবিদ্যাবিকল্প আয়ত্ত করে কবি শূন্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন—এখন তাই কেবল শূন্যতা ধ্বনিই চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তারপর বীণা বাজানোর প্রক্রিয়া। প্রথমে বীণা বাজাতে গেলে সা-রে-গা-মা প্রভৃতি স্বর সাধনা করতে হয়, তারপর গ্রন্থিগুলি গণনা করে সুর বাজানোর অভ্যাস করতে হয়, শেষে হাত দিয়ে গ্রন্থিগুলি চেপে তারে আঘাত করে সুর খেলানো হয়। এই পদে আলি কালি—এই আভাস দুটিকে আয়ত্ত করাই প্রাথমিক স্বরসাধনা ; চিত্তের দোষগুলির সমতা সাধনাকে গ্রন্থি গুণে ঐকতান বাজানো এবং শেষে এর ফলে চিত্তের তাপ দূরীভূত হওয়ায় সর্বত্রই শূন্যতা পরিব্যাপ্ত হওয়াকে হাত দিয়ে গ্রন্থি চেপে তারে আঘাত করে সুর খেলানোর সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে কবির চিত্ত নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়াতে বজ্রাচার্য বীণাপাদ নৃত্য করছেন—এই ভাবেই বুদ্ধ বা নির্বাণ-নাটকের বিশেষরূপে সমতা বা পরিসমাপ্তি হয়েছে॥

একুশ নং চর্যায় সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ একটি অতি বাস্তব উপমা প্রয়োগ করেছেন চঞ্চলচিত্ত মূষিককে নিয়ে। অন্ধকার রাত্রিতে যদৃচ্ছ বিচরণশীল মূষিক যেমন নানা-রকম মিষ্টদ্রব্য খেয়ে ফেলে, তেমনি চঞ্চল চিত্তও অজ্ঞানের অন্ধকারে বোধিচিত্তজ মহাসুখামৃত নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু চঞ্চলতা চিত্তের দোষ, সেই কথা মনে করিয়ে

আদিবাসী শবর-শবরীর জীবনযাত্রা-প্রণালীকে কাব্যের বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করে কয়েকটি ভারি সুন্দর রূপক সৃষ্টি করেছেন কাহ্নুপাদ (নং ১০) এবং শবরপাদ (নং ২৮, ৫০)। শবরী ডোম্বী এবং তাদের ঘরবাড়ি, বেশভূষা, আচরণ, আমোদ-প্রমোদ, নৃত্যগীত—এইগুলিকেই বিশেষ করে তাঁরা রূপক সৃষ্টির উপাদান হিসাবে বেছে নিয়েছেন ॥

১০নং চর্যায় কাহ্নুপাদ বলছেন, ডোম্বী, তোমার ঘর নগরের বাইরে, ব্রাহ্মণ নেড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। এখানে ডোম্বী নৈরাত্মার প্রতীক, কারণ নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে (ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাহিরে বলে) বিষয়সুখে পরিপূর্ণ পৃথিবী-রূপ নগরের বাইরে বাস করেন। ব্রাহ্মণ যেমন ডোম্বীকে স্পর্শ করে যায়, আয়ত্ত করতে পারে না, তেমনি যাঁরা সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নন, এইরকম যোগীদের চপল চিত্তকে নৈরাত্মা স্পর্শ করে যান। যোগীরা কেবল নৈরাত্মার আভাস মাত্র পান, তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেন না। কাহ্নুপাদ বলছেন, আমি নির্ঘৃণ উলঙ্গ কাপালিক, আমি এই ডোম্বীর সঙ্গ করব। এই বক্তব্যটির গূঢ় অর্থ—কাপালিকের যেমন লোকলজ্জা, ঘৃণা, সংকোচ বলতে কিছু নেই এবং সেই কারণেই অস্পৃশ্য ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গ করতে তার বাধা নেই—তেমনি কাহ্নুপাদও সমস্ত লোকাচারের প্রভাব থেকে মুক্ত, পরিশুদ্ধ, তাই নৈরাত্মার সঙ্গলাভ করে নির্বাণপ্রাপ্তির অধিকার তাঁর জন্মেছে। সেকালে নৃত্যগীত অস্পৃশ্যা নীচজাতীয়া রমণীর অন্যতম বিলাস ছিল, সেইদিকে ইঙ্গিত করে কাহ্নুপাদ বলছেন,—একটি পদ্ম, তাতে চৌষট্টি পাপড়ি, তাতে নাচছে ডোম্বী। এই পদ্ম এবং পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ির অর্থ শরীরের বিবিধ চক্র এবং স্থান যা তন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ডোম্বীর হাতে চাঙ্গাড়ি ও তন্ত্রী—চাঙ্গাড়ি বিষয়াভাস এবং তন্ত্রী অবিদ্যার প্রতীক ; ডোম্বী চাঙ্গাড়ি ও তন্ত্রী বিক্রয় করে—এর তাৎপর্য নৈরাত্মধর্মে অবিদ্যা ও বিষয়াভাসের স্থান নেই। তাই কাপালিক তার নটপেটিকা ত্যাগ করেছেন ; নটপেটিকা এখানে সংসারের রূপক। নটপেটিকায় যেমন বহু জিনিস থাকে, সংসারও তেমনি বিচিত্র বিষয়ের আধার। ডোম্বীর জন্যে কাপালিক হাড়ের মালা গ্রহণ করেছেন সম্পূর্ণরূপে বিকারহীন হয়ে, নৈরাত্মায় অন্তর্লীন হওয়ায় উপযুক্ত হয়েছেন তিনি ॥

২৮নং চর্যায় শবরপাদ উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় যে-শবরী বালিকা বাস করে তার ভারি সুন্দর কাব্যময় বর্ণনা দিয়েছেন নিখুঁত কাব্যস্নিগ্ধ ভাষায়। শবরীর খোঁপায় ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা। শবর পুরুষকে বিনয় করে কবি বলেছেন, পাগল শবর, তুমি ভুল কোর না। 'ণাণা তরুবর মউলিল' আর 'গঅণত লাগেলি ডালী'—সেখানে একেলা শবরী 'এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' তিনধাতুতে তৈরী

খাটে সুখে শয্যা বিছাল শবর, নৈরামণিকে বুকে নিয়ে সে 'পেহ্ম রাতি পোহাইলি।' সে কর্পূর দিয়ে তাম্বুলের আস্বাদ গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে শবর শবরীর উপর রাগ করে গিরিশিখরের সন্ধিতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে, তাকে তখন খুঁজে পাওয়া যায় না।

শবর-শবরীর পারিবারিক জীবনের এই বাস্তব কাব্যময় বর্ণনাটির মাধ্যমে যে-বক্তব্য সিদ্ধাচার্য শবরপাদ লুক্কায়িত রেখেছেন তার অর্থ সম্যক বোধগম্য হবে যদি উঁচু পাহাড়, শবরী বালিকা, বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জার মালা, উন্মত্ত শবর, মুকুলিত বৃক্ষ, উন্মুক্ত গগন, তিনধাতুর খাট এবং শয্যা, নৈরামণি দারী, রাগান্বিত শবর, গিরি-শিখরের সন্ধি এবং সেখানে আত্মগোপন করার রূপকগুলি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি।

উঁচু পাহাড়ের অর্থ যোগীন্দ্রের মস্তকে অবস্থিত মহাসুখ চক্র, শবরী বালিকা বজ্রধর শবরের গৃহিণী জ্ঞানস্বরূপিণী নৈরাত্মা। বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা সজ্জিত অর্থ ভাববিকল্পের দ্বারা অলংকৃত। গুঞ্জার মালা গুহ্যমন্ত্রের রূপক। উন্মত্ত শবর—বিষয় বিহ্বলচিত্ত সাধক ; মুকুলিত বৃক্ষ অর্থ অবিদ্যার তরু বিষয়ানন্দে মুকুলিত এবং উন্মুক্ত গগন মহাশূন্যতার রূপক। তিনধাতুর খাট কায়-বাক-চিত্তের প্রতীক, নৈরামণি দারী নৈরাত্মা, রাগান্বিত শবর জ্ঞানানন্দের আবেগে উত্তেজিত যোগী, গিরিশিখর-সন্ধি হচ্ছে মহাসুখচক্র এবং গিরিসন্ধিতে শবরের আত্মগোপন দ্বারা কবি মহাসুখচক্রে যোগীন্দ্রের লীন হয়ে যাওয়ার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন ॥

শবরপাদের ৫০ নং চর্যাতেও শবর-শবরীর জীবনযাত্রার মধুর কাব্যমণ্ডিত চিত্র। এই চর্যাটির আরম্ভটিই পাঠকের মনকে মুহূর্তের মধ্যে আবিষ্ট করে তোলে। গগনে গগনে লগন-বাটিকা—সেখানে শবরী নিয়ে শবর বাস করে। সেই বাড়ির চারিধারে জনমানব নেই, কেবল বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত কার্পাস। রাত্রিতে সেখানে জ্যোৎস্না উঠেছে, চারিদিক আলোকের নম্র স্পর্শে মধুর। তখন সুপক্ক কঙ্নী দানার হাঁড়িয়া পান করে শবর-শবরী মিলনানন্দে উন্মত্ত। কিন্তু হায়! এই মিলন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। একদিন সেই শবর কালকবলিত হয়, তার মৃতদেহ যথানিয়মে করা হয় দাহ, শকুন-শেয়াল ক্রন্দন করে—শূন্যতার বুকে সেই কান্নার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই ॥

পাঠক এখানে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন গগনস্পর্শী বাড়ি, শবর-শবরী এবং তাদের মিলন কিসের রূপক। কার্পাসের ক্ষেত ও অন্ধকার রাত্রি জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হওয়ার অর্থ জ্ঞান-চন্দ্রের আলোকে মোহান্ধকার দূর হয়ে আকাশকুসুমের মতো মিলিয়ে যাওয়া এবং শূন্যতার সাদা কার্পাস ফুলের মতো স্পষ্ট হওয়া। হাঁড়িয়া পানে

মাতাল শবর তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন যোগী। তার মৃত্যুর অর্থ নির্বাণ লাভ এবং শকুন-শৃগালের ক্রন্দন হচ্ছে মায়ার বিলাপ। শবর দগ্ধ হল, এর তাৎপর্য—সমাধিস্থ যোগীর চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে গেল॥

চর্যাপদে যে-কটি রূপক ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে নদীর রূপকটি সবচেয়ে মৌলিক। চর্যাপদের একাধিক শ্লোকে কবির চোখে পৃথিবীকে নদীর রূপকে দেখার উদাহরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি। মানুষের জীবন এবং তার বিবিধ উত্থান-পতন নিয়ে যে-পৃথিবী তার সঙ্গে নদীর স্রোত, নদীর জোয়ার-ভাটা, নদীর গতি পরিবর্তন ইত্যাদির তুলনা অবশ্য কেবল চর্যাপদেই আছে তা নয়, পূর্বভারতের কাব্যে-সাহিত্যে তার নিদর্শন বহু জায়গায় ছড়ানো। নদ-নদী-খাল-বিলবহুল পূর্ব-ভারতের কবিদের চোখেই পৃথিবী নদীর রূপকে বহুবার চিত্রায়িত। পৃথিবীর বন্ধন ছেড়ে পরলোকে যাওয়ার ব্যঞ্জনাও এই নদী পার হওয়ার মধ্যে দিয়েই রূপায়িত। জীবনের পরপারে মৃত্যুর অন্ধকারে প্রস্থান করা সেটাও বাঙালী কবিদের চোখে বৈতরণী পার হওয়া বলে কথিত। 'রাধে, পার কর' বলে বাঙালী বৈষ্ণব যখন প্রার্থনা করে, তখনও এই ভবনদীর পারে যাওয়ার ব্যঞ্জনা। প্রাকৃত পৈঙ্গলের শ্লোকে যখন দেখছি—

> অরে রে বাহই কাহ্ন ণাব ছোড়ি
> ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
> তই ইথি ণঈহি সন্তার দেই
> জো চাহসি সো লেহি॥

তখন কবি শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বেয়ে যাওয়া, নদীতে স্ত্রীলোকের সাঁতার দেওয়া—সমস্তই বাঙালী কবিদের নদী এবং নদীর স্রোতকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর গতির সঙ্গে এবং নদীতে সাঁতার দেওয়ার অর্থে পৃথিবীর মধ্যে সুখ-দুঃখে জড়িত জীবন অতিবাহিত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। পূর্বভারতের মধ্যে বাঙালী কবিদের চোখেই ভবকে নদী হিসাবে কল্পনা করার ঝোঁকটি সব চেয়ে প্রবল। প্রাকৃত পৈঙ্গলে, চর্যাপদে, বৈষ্ণব-পদাবলীতে, মঙ্গল-কাব্যে তো বটেই, আউল বাউল সহজিয়াদের সাধন-সংগীতে, লোক-কবিদের গানে গানে সেই এক কথাই বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে—'ভবনদী বিষম নদীরে, পারে যাওয়া ভার'। পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যেও এর প্রভাব বিন্দুমাত্রও কমে নি। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় এই ভবনদীর ব্যঞ্জনা॥

এই নদীর চিত্রটি কবিদের মনে ছিল বলেই নদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘাট, মাঝি, দাঁড়ি, খেয়া পারাপার করা, মাসুল নেওয়া ইত্যাদি জিনিসও কবিতায় রূপকাশ্রয়ে এসেছে। মাঝি কখনও মন, যেমন লোককবিতায় 'মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে

আর আমি বাইতে পারলাম না।' কখনও-বা সে 'লীলার কর্ণধার'। 'জীবন-নদীর ওপারে বন্ধুহে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে', 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী', 'ঘাটে-বাঁধা দিন', 'ভরানদী ক্ষুরধারা খরপরশা', 'দিন শেষের শেষ খেয়া'—এরকম অসংখ্য টুকরো টুকরো অংশ প্রাচীন থেকে আধুনিক কবিদের কবিতা থেকে তুলে দিতে পারা যায়, যেখানে দেখানো যেতে পারে বাঙালী কবিদের মনে প্রাণে ভাবনায় ধ্যানে বেদনায় আনন্দে নদী এবং নদীর স্রোত ঘাট খেয়া ইত্যাদি আধ্যাত্মিক চিন্তার অঙ্গ হিসাবে কতখানি জড়িত। অবশ্য অনেক জায়গায় পৃথিবীকে সমুদ্র হিসাবেও কল্পনা যে নেই তা নয়, চর্যাপদের ১৫ নং গানেই তো সমুদ্রের কথা আছে পৃথিবীর রূপক হিসাবে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, ঐ সমুদ্র নদীই, কারণ কূলে কূলে ঘোরার কথা, ঘাট, গুল্ম ইত্যাদি নদীর পক্ষেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথও যখন বলেন, 'সম্মুখে শান্তি-পারাবার', তখন পারাবার বা সমুদ্র ব্যবহৃত হয় অর্থ-ব্যঞ্জনায়। সেখানে ঐ পারাবারও নদী॥

চর্যাপদে প্রকীর্ণ অসংখ্য উপমা রূপকের মাত্র কয়েকটির আলোচনা এখানে করা হল। তবে অসংখ্য রূপক উপমা ব্যবহৃত হলেও সেই রূপকগুলি এক ধরনের জিনিস বোঝাতেই ব্যবহৃত। যেমন ডোম্বী, শবরী, হরিণী—এরা নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক ; গগন সর্বদাই নির্বাণের, বৃক্ষ দেহের ; নৌকার দাঁড় গুরুদত্ত উপদেশের ; সোনারূপা পার্থিব সম্পদের, ঘর দেহের, নদী পৃথিবীর রূপক। এইগুলিই ঘুরে ঘুরে নানা কবিতায় নানারূপে প্রকাশিত। বৈচিত্র্যহীনতা তাতে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রূপকগুলির ব্যবহারে-যে অকৃত্রিম কবি-মনের কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাকেও তো অস্বীকার করা যায় না। চর্যাপদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্যরা অতি দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশংসার বিষয় হচ্ছে এই, দুরূহ বিষয়কে দুরূহতর করার জন্য তাঁরা অপরিচিত বস্তুকে অবলম্বন করেন নি, সাধ্যমতো তাঁদের চারিদিকের পরিচিত জগতের ছোট ছোট জিনিসগুলিই বেছে নিয়েছেন। এখানেও তাঁদের বাস্তবমুখীতা এবং সুগভীর জীবনবোধের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট॥
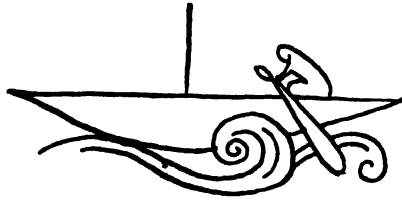
॥ চর্যাপদের ধর্মমত ॥

চর্যাপদগুলির মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে-ধর্মমত প্রচার করতে চেয়েছেন সে-গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা বৌদ্ধধর্মমতের বিভিন্ন 'যান' বা সাধন-পদ্ধতির সমন্বয়টাই-যে সিদ্ধাচার্যদের লক্ষ্য ছিল সেই দিকেই জোর দিয়েছেন বেশি। চর্যাপদের সমকালীন বাঙলা দেশের ভাবলোকে আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রেরণা যুগপৎ কার্যকরী হয়েছিল এবং সেই বোধের স্বাক্ষর চর্যাপদের বিভিন্ন গীতগুলিতে রয়েছে। চর্যাপদে একদিকে যেমন আচারসর্বস্ব বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মা-চরণের প্রতি বিদ্রূপ এবং অবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আবার হিন্দু ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক দেহবাদের প্রতিও প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য আস্থাজ্ঞাপনেরও কোনো বাধা দেখা যাচ্ছে না। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানের প্রতি কোনো-না-কোনোভাবে সমর্থন জানানো হয়েছে—এমনও দেখতে পাচ্ছি। তবে চর্যাপদ কোনোভাবেই আচারসর্বস্ব হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুরোপুরি স্বীকার করে নি, এটুকু বলতে পারা যায়। সিদ্ধাচার্যরা সকলেই মোটামুটি বৌদ্ধধর্ম-প্রদর্শিত আচার আচরণ, পথ ও সাধনাকেই জীবনচর্যা হিসাবে গ্রহণ করতে এবং সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করতেই স্থিরনিশ্চিত ছিলেন—তফাৎ শুধু যান নিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু তান্ত্রিক দেহবাদের যে-পরিচয় আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা এসেছে সামাজিক কারণে হিন্দু-বৌদ্ধ আদর্শের পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে। নতুন করে হিন্দু তান্ত্রিক দেহবাদের প্রতি সমর্থন সিদ্ধাচাযরা প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে জানান নি—চর্যাপদ রচনার অনেক পূর্বেই সে-সমন্বয় হয়েছে এবং সেই সমন্বয়ের ফলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একটা দেহবাদী আলাদা 'যান'ই সৃষ্টি হয়েছে ॥

তাই চর্যাপদের ধর্মমতের নিজস্ব প্রকৃতিটা কী সেটা বোঝার জন্য বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন 'যান'গুলি সম্বন্ধে একটা খুব সাধারণ এবং সহজ আলোচনা এ প্রসঙ্গে সেরে নিতে পারা যায় ॥

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিল না থাকলেও ভগবান বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মমত এবং জীবনদর্শন হিন্দুশাস্ত্র-প্রভাববর্জিত নয়। বুদ্ধদেব মানবজীবনের বিভিন্ন দুঃখ এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করতেই চেয়েছিলেন। জীবনের এই দুঃখ এবং

যন্ত্রণার কথা আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের মুনিঋষিদের অগোচর ছিল না। উপনিষদে স্পষ্টই বলা হয়েছে, এই পৃথিবীকে মায়াময় জেনে ব্রহ্মপদে প্রবেশ করতে পারলেই জীবনের যন্ত্রণা এবং দুঃখভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অনিত্য জগৎ এবং অনিত্য জগৎ থেকে জাত মোহ এবং অবিদ্যাই আমাদের দুঃখভোগের কারণ এবং সেই মোহ অবিদ্যা মিথ্যাকে ধ্বংস করতে পারলে তবেই মোক্ষ লাভ সম্ভব, সে-কথা তাঁরা বলে গেছেন। এই মোক্ষের ধারণার সঙ্গে ভগবান বুদ্ধদেবের নির্বাণ-তত্ত্বের কোনো অমিল নেই। তবে অমিলটা হচ্ছে মোক্ষ লাভ করার রাস্তা নিয়ে। জপ-তপ পুজো-আর্চা যজ্ঞ-বলিদান এইসব বাইরের আচরণ দিয়ে কি মোক্ষলাভ করা যাবে, না কি যাগযজ্ঞ পুজোআর্চা বাদ দিয়ে আত্মতত্ত্ব অবগত হলে মুক্তি পাওয়া যাবে, কিংবা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাম অর্থ ইত্যাদি সম্ভোগ করলে মোক্ষ পাওয়া যাবে—এসব কথা হিন্দু দার্শনিকরা ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বেই আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেব অবশ্য হিন্দু ধারণা—পরমাত্মা থেকে মায়ার যোগে জীবাত্মার এবং নানারকম মোহের সৃষ্টি, আবার সেই মোহজাল ছিন্ন করতে পারলে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে—এই বিষয়টি মানেন না। কারণ, তিনি পরমাত্মা বা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু জীবনের দুঃখের প্রধান কারণ-যে অবিদ্যা বা মোহ—এর সঙ্গে তিনি একমত। তিনি বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই কর্মের দ্বারা গঠিত হচ্ছে, কর্মসমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ। রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান) অবলম্বন করে জন্মজন্মান্তরে রূপায়িত হয়ে উঠছে, আর এই কর্মের হেতু থেকেই প্রত্যয়ীভূত জগতের উদ্ভব। এই-যে কর্মবশ্যতা তাই অবিদ্যা এবং তা থেকেই আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখের সূত্রপাত ও বৃদ্ধি। তাই মানুষ যদি অবিদ্যার বশীভূত না হয়, সে যদি জাগতিক অতএব মিথ্যা বাসনা-কামনা ত্যাগ করতে পারে, তবে সে দুঃখ নিরোধ করতে সক্ষম হবে এবং এইভাবেই সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে ॥

এই নির্বাণের স্বরূপটি কী? নির্বাণ কি দুঃখময়, না-কি তাতে অনন্ত সুখ? তা কি অভাব-স্বভাব ও অবাস্তব কিংবা ভাবস্বভাব ও বাস্তব? সে কি জন্ম-মৃত্যুর অতীত শাশ্বত জীবন, না-কি কেবলই স্থূল দেহের নিশ্চিত বিনাশ? নির্বাণ কি শুধুই অহং-জ্ঞানের বিলোপ, না তা একটি অবিমিশ্র সুখবাদ ॥

নির্বাণতত্ত্ব নিয়েই যখন এত প্রশ্ন এবং তর্ক, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই নির্বাণ-লাভ করার পথ নিয়ে বৌদ্ধধর্মাচার্যদের মধ্যে বিরোধ এবং বিতর্ক দেখা দেবে। সেই জন্যই রাজগৃহের, বৈশালীর, পাটলিপুত্রের এবং কনিষ্কের সময়ে অনুষ্ঠিত—মোট চারটি বৌদ্ধমহাসংগীতির অধিবেশনে বুদ্ধদেব-প্রদত্ত ধর্মোপদেশের অত্থকথা বা ভাষ্য

নিয়ে যে-সমস্ত বিতর্ক হয় তা থেকেই বৌদ্ধধর্মাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা যানের সৃষ্টি হতে থাকে।

এই 'যান'গুলির মূল বক্তব্য কী?

এবার সেগুলিই খুব সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করব॥

এই যানগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে মহাযান এবং হীনযান সাধনপন্থা। এই দুই দলেরই কিন্তু বুদ্ধদেব-প্রদত্ত ধর্মোপদেশ নিয়ে কোনো ঝগড়া বা মতবিরোধ নেই—কলহটা আসলে সেই উপদেশ পালন করে জীবনকে পরিপূর্ণ করার সাধনপন্থা নিয়ে। হীনযানীরা তাঁদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে বিশ্বাস করতেন নির্বাণলাভ করার উপর। সেই নির্বাণ বুদ্ধনির্দেশিত পথেই আসবে—কিন্তু সেই পথটি হচ্ছে ধ্যান এবং অন্যান্য নৈতিক আচার-আচরণের অতি নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার পথ। সেখানে সাধককে সাধনা করতে হবে শূন্যতার—যে-শূন্যতা পাওয়া যাবে অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে মিলিয়ে দেওয়ায়, বিলুপ্ত করায়॥

মহাযানীরা মনে করতেন, হীনযানীদের নির্বাণসাধনা বা অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে মিলিয়ে দেওয়ার শূন্যতার সাধনা জিনিসটা ঠিক নয়, এই উদ্দেশ্যটাও সত্য নয়। নির্বাণলাভ করার সাধনার চেয়ে বুদ্ধত্বলাভ করার সাধনাটাই বড়। বুদ্ধত্বলাভ বলতে তাঁরা বুঝতেন বোধিচিত্তের অধিকার লাভ। তাঁদের কাছে এই বুদ্ধত্বলাভ হচ্ছে শূন্যতা এবং করুণার একটা সমন্বয়। তাঁরা ভাবতেন, হীনযানীদের নিষ্ঠাপূর্ণ আচার-পরায়ণতাটা সঠিক ধর্মসাধনা নয়, যেমন নয় ব্রাহ্মণদের আচারসর্বস্ব যাগযজ্ঞ মন্ত্রপাঠ বলিদান স্নান ধ্যান তর্পণ মোক্ষলাভের প্রকৃত উপায়। ধর্মসাধনাটাকে এই পর্যায়ে রাখলে শেষে সেটা একটা শুষ্ক আচারপরায়ণতায় পর্যবসিত হবে। তাকে করতে হবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধনা এবং সিদ্ধির বস্তু। তাই সেখানে গণ্ডীবদ্ধ নৈষ্ঠিকতায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না—সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মনোময় ব্যক্তি-সাপেক্ষতার এবং বর্জন করতে হবে আচারনৈষ্ঠিকতাকে। তাই মহাযানী ধর্ম-সাধনায় সাধকের আছে নিয়মনিষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক কঠোর আচারপরায়ণতা থেকে মুক্তি পাবার অবকাশ॥

এই মুক্তির অবকাশ আছে বলেই মহাযানী সাধন-পদ্ধতিতে সমসাময়িক অবৌদ্ধ ধর্মের নানা ধারার অনুপ্রবেশ ঘটবার সুযোগ হল বেশি। এবং সেই সুযোগেই বিশেষ করে বাংলাদেশে অষ্টম-নবম শতকে মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মে নানারকম তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ছোঁওয়া এসে লাগল। চর্যাপদের সমসাময়িক কালে বা তার সামান্য আগে গুহ্য সাধনতত্ত্ব পূজা আচার ও নীতিপদ্ধতির প্রয়োগ দেখা গেল॥

অনেকে বলেন, এই তান্ত্রিক আচার আচরণের, মন্ত্র তন্ত্র গুহ্য সাধনতত্ত্বের অনুপ্রবেশ মহাযানীপন্থায় ঘটেছিল, তার একটা গূঢ় সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মেও তান্ত্রিকতা, রহস্যময় গুহ্য গূঢ়ার্থক মন্ত্র যন্ত্র ধারণী বীজ মণ্ডল—এই সমস্ত অনুপ্রবিষ্ট হয় এই সময়ে। এর কারণ, ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম এই সময় নিজেদের প্রভাবের সীমাকে আরেকটু বাড়িয়ে আদিম কৌম-সমাজের উপর সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতে চেয়েছিল। পর্বতের গুহায় এবং অরণ্যের অন্তরালে যে-আদিম অধিবাসীরা বহু যুগ ধরে নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের বাইরে রেখে স্বকীয় সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছিল, তাদের নিজস্ব পূজাপদ্ধতি ধর্মাচরণ এবং অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী পিশাচ মায়া মন্ত্র যন্ত্র গূঢ়ার্থক অক্ষর—এক কথায় অলৌকিক অপ্রাকৃত জাদুশক্তির উপর বিশ্বাস ছিল প্রধান। তাদেরকে নিজেদের প্রভাবের মধ্যে আনতে গিয়ে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধধর্মগুরুরা সহজ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিতে আদিম কৌমসমাজের জাদুশক্তিতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন এবং সেই কারণেই মন্ত্র-তন্ত্রের অনুপ্রবেশ বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মে হয়ে থাকতে পারে। বৌদ্ধ আচার্য অসঙ্গ না-কি এইসব জিনিসকে মহাযানী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মেনে নিয়েছিলেন, এরকম কথা প্রচলিত আছে। আবার, আদিম কৌমসমাজের যাঁরা বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের জপ তপ ধ্যান ধারণা আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াপদ্ধতি সব নিয়েই নতুন ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন, এরকমও হতে পারে। পরে হয় তো আদিম কৌমসমাজের ধর্মবিশ্বাসগুলিকে সংস্কার ও শোধন করে নিয়েছিলেন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মগুরুরা।—এইসমস্ত কারণের কোন্‌টা অধিকতর সম্ভব তা আর আজকে সঠিকভাবে বলা যাবে না, কিন্তু এই ধরনের একটা সমন্বয়-যে পূর্বভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মে অষ্টম-নবম শতক বা তার কিছু আগে থেকে হয়েছিল এটা জোর করে বলা যায়, কেবল কী করে এই তান্ত্রিক বিবর্তন ঘটেছিল সেটার সঠিক কারণ দেওয়া যাবে না। এই কারণ নানাভাবে নানাজনে অনুমান করেছেন। এইগুলির মধ্যে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অনুমানটি উদ্ধৃত করে দিই :

> "খ্রীস্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই হিমালয়-ক্রোড়স্থিত পার্বত্য-কান্তারময় দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর তিব্বত নেপাল ভোটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদান-প্রদান বাড়িয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় দৌত্য বিনিময়, সমরাভিযান প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এইসব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাংলা বিহারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক

প্রমাণও বিদ্যমান। সপ্তম-শতকের পূর্ব-বাংলার খড়্গ-রাজবংশ বোধ হয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয় তো নয়। তন্ত্রধর্মের প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।"

ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, এই অনুমানটিই সর্বাপেক্ষা সংগত এবং যুক্তি-সম্পন্ন॥

যা হোক, মহাযানী সাধন-পদ্ধতিতে আদিম কৌমসমাজের বা অন্য কোনো এখনও অনাবিষ্কৃত সূত্র থেকে আগত এই মন্ত্র তন্ত্র এবং নূতন ধ্যান কল্পনার প্রতিষ্ঠার ফলে মহাযানী ধর্মাচরণের মধ্যে নানা বিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিবর্তনের প্রথম ধাপ মন্ত্রযান—যার মূল প্রেরণা মন্ত্র এবং সেই মন্ত্র থেকে ধারণী ও বীজ। এই নূতন ধারণা যে-বৌদ্ধাচার্যরা প্রবর্তন করলেন তাঁদের বলা হতে লাগল মন্ত্রযানী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় প্রাচীন মহাযানী ধারণার মূল আশ্রয় শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ যোগাচার মাধ্যমিকবাদ ইত্যাদি কিছুই বুঝতেন না কিংবা বুঝলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁদের কাছে নূতনতর ধারণাটিই অধিকতর সহজ ও সত্য বলে হয় তো মনে হয়ে থাকবে।

এইভাবেই আরেকটি শাখার সৃষ্টি হল, তার নাম বজ্রযান।

বজ্রযানীরা মনে করতেন, নির্বাণের পর তিনটি অবস্থা—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন বলেন, আমাদের সমস্ত দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, চারিদিকের সংসার এবং সংসারের সমস্ত মোহ আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা—সবই শূন্য; এই শূন্যতার পরম জ্ঞানই হচ্ছে নির্বাণ। এই-যে শূন্যতার পরমজ্ঞান তাঁকে বলা হল নিরাত্মা এবং তিনি দেবীরূপে কল্পিত বলে তাঁর নামকরণ হল নৈরাত্মা দেবী। সাধকের বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মায় বিলীন হয়ে যায়, তখন জন্ম দেয় মহাসুখ। নরনারীর দৈহিক মিলনের ফলে যে-পরম আনন্দ, যে-এককেন্দ্রিক উপলব্ধিময় ধ্যান—তাকেই বজ্রযানীরা বলেন বোধিচিত্ত। সাধক যদি তাঁর ইন্দ্রিয়শক্তিকে সম্পূর্ণ দমন করতে পারেন, তবে সেই বোধিচিত্ত হবে বজ্রের মতো কঠিন এবং দৃঢ়। বোধিচিত্ত সেই বজ্রভাব পেলে তবেই বোধিজ্ঞানের উন্মেষ হওয়া সম্ভব। চঞ্চল চিত্তকে সেই বজ্রভাবে নিয়ে যাবার যে-সাধনা তাকেই বলে বজ্রযান। বজ্রযানে নরনারীর দেহমিলনের কথা বলা হয়েছে, আবার ইন্দ্রিয়শক্তিকে দমনের কথাও বলা হচ্ছে—জিনিসটা তাই একটু গোলমেলে ঠেকতে পারে। সেই সংশয় দূর করার জন্যে সিদ্ধাচার্যরা বলছেন,

ইন্দ্রিয়কে দমন করতে গেলে আগে সেই ইন্দ্রিয়কে জাগাতে হবে, মৈথুন সেই জাগরণের উপায়। মৈথুনজাত আনন্দ বা সাধকের বোধিচিত্তকে স্থায়ী করা যাবে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আর সেই মন্ত্র সাধনার শক্তিতে মৈথুনজাত আনন্দ থেকে বিভিন্ন দেবদেবী জন্ম নেবেন এবং সাধকের ধ্যানচক্ষুর সামনে এক-একটি মণ্ডলে অধিষ্ঠিত হবেন। সাধক যদি এই মণ্ডলগুলির সম্যক্ ধ্যান করতে থাকেন, তবেই তাঁর বোধিচিত্ত স্থায়ী স্থির দৃঢ় এবং কঠিন হয়ে আস্তে আস্তে বোধিজ্ঞানে বিলীন হয়ে যাবে। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় দমিত হয়ে গেছে, সমস্ত কামনাবাসনা অন্তর্হিত হয়েছে এবং সাধক তখন পরমজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, এই সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও কঠিন ; আর তার চেয়েও কঠিন যে-ভাষায় এবং যে-শব্দে এই সাধনপদ্ধতি বোঝানো হয়। গুরু ছাড়া আর কেউ তা বোঝাতে পারেন না, আবার গুরুর কাছে দীক্ষা না পেলে কোনো শিষ্য তা বুঝতে পারেন না। গুরু এই সাধনপদ্ধতি বুঝিয়ে না দিলে কেউ তা অনুসরণ করতে পারবে না—তাই বজ্রযানে গুরু ছাড়া কোনো কিছুই করা যাবে না, গুরুকৃপা না থাকলে সাধকের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ॥

বজ্রযানে দেখতে পাচ্ছি মন্ত্র গুরু দেবদেবী এবং তার ধ্যান। এই সাধনার বিবর্তিত সূক্ষ্মতর স্তরের নাম সহজযান। সহজযানীরা দেবদেবী মন্ত্রতন্ত্র আচার অনুষ্ঠান ধ্যান জপ তপ—কোনো কিছুকেই স্বীকার করেন না। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্মের কৃচ্ছ্র-সাধনা পূজার্চনা প্রব্রজ্যা—এসবও তাঁরা মানতেন না। তাঁরা এক-কথায় বলে দিয়েছেন, 'দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ন জাণই'—মূর্খ তুমি জান না দেহের মধ্যেই বুদ্ধ বা পরমজ্ঞান। তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন শূন্যতা হল প্রকৃতি আর করুণা হল পুরুষ। এই শূন্যতা এবং করুণা বা নারী ও নরের মিলনে যে-মহাসুখ সেটাই ধ্রুবসত্য। এই মহাসুখে উপনীত হতে পারলে বা ধ্রুবসত্যকে বুঝতে পারা গেলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কামনা নষ্ট হয়ে যাবে। সংসারের ভালো-মন্দের ধ্যানধারণা, আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি সমস্ত সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যাবে—সেটাই হচ্ছে সহজ অবস্থা। এর জন্যে মূর্তি লাগে না, তন্ত্র লাগে না, মন্ত্র লাগে না, জপ তপ ধ্যান নৈবেদ্য দীপ ধূপ সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর ; নিরর্থক সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় আচার। সহজ সাধকরা শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ সমস্ত বর্জন করে ধরে রাখলেন একমাত্র দেহবাদ বা কায়াসাধন ॥

সহজ সাধকদের ধর্মমতে সর্বপ্রধান আপত্তি ছিল ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈদিক সংস্কার-প্রণোদিত ধর্মসাধনা। বজ্রযানের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য—বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তিরূপের অজস্রতা, মন্ত্র-তন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান-পূজা এসব নিয়েই বজ্রযানের

সাধনপথ জটিল ও বহুধাবিস্তৃত। সহজ সাধকরা কাঠ মাটি পাথরের দেবমূর্তির সামনে প্রণত হবার বিরুদ্ধে, এঁরা ব্রাহ্মণদের ছিলেন ঘোর শত্রু, এমন কি যেসব বৌদ্ধ মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যান-ধারণা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রব্রজ্যা ইত্যাদিকে মুক্তিলাভের উপায় মনে করতেন, এঁরা তাঁদেরকেও কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সহজযানীরা স্পষ্টই বলেছেন, "বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধদেবও জানিতেন না—বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়! সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে।" এই প্রসঙ্গে সহজযানীদের মূল বক্তব্য কঠিন সংযম পালন করা আসলে এক ধরনের নেতিমূলক অস্বাভাবিকতা,—এই অন্যায় অস্বাভাবিকতা মানুষের মনে এক অস্বাস্থ্যকর বিকৃতির জন্ম দেয়। তার দেহ মন চায় সহজ স্বাভাবিক মানবোচিত সমস্ত সুখ ভোগ করতে, যা তাকে দেবে অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দ। কিন্তু শাস্ত্রের নামে, পুণ্যের নামে, আচারের নামে, ঈশ্বর সাধনার অজুহাতে আমরা সেই সহজ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর কামনা-বাসনাকে অবদমিত করছি, ফলে মানুষ দুরারোগ্য মানসিক রোগে কাতর হচ্ছে। সেজন্যেই সহজিয়াদের দাবী—মানবিক বৃত্তির উপরেই ধর্মসাধনার সমস্ত পথ নির্দিষ্ট করতে হবে, কারণ মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্যে মানুষ নয়। সংস্কারের বন্ধনের মধ্যে মুক্তি-পিয়াসী মানব-মনকে শৃঙ্খলিত করা ধর্মসাধনার পথ হতে পারে না, চরম মুক্তির পথ তো নয়ই। অতএব দেহকে স্বীকার করতে হবে, দেহজ কামনা-বাসনাকে অস্বাভাবিকভাবে দমন বা ধ্বংস না করে তার সহজ স্বাভাবিক রূপান্তর বা উদ্গতির (Sublimation) কথা চিন্তা করতে হবে। সহজ সাধনা মানে কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখে অহরহ ডুবে থাকা নয়, অনৈতিক দেহসম্ভোগ বা ব্যভিচারের জোয়ারে ভেসে যাওয়া নয়—অর্থাৎ এক কথায় সহজ সাধনা নেতিমূলক নয়। সহজ সাধনায় মানবচিত্তের পূর্ণতা ও মুক্তির পথে অনৈসর্গিক ও কৃত্রিম সংযমের প্রতি প্রতিবাদই প্রবলভাবে ধ্বনিত।

আরেকটি যান বা সাধনপদ্ধতির কথাও একটু বলে নেওয়া যেতে পারে। সেটি কালচক্রযান। এই যানের সাধকরা শূন্যতা এবং কালচক্রকে এক এবং অভিন্ন মনে করেন। এই সর্বদর্শী এবং সর্বজ্ঞ কালচক্র ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘূর্ণমাণ এবং এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। এই কালচক্রকে নিরস্ত করা কিংবা নিজেদেরকে কালের প্রভাবের উপরে নিয়ে যাওয়ার কঠিন সাধনাই হচ্ছে কালচক্রযান সাধনাপদ্ধতি। কীভাবে তা সম্ভব? কালচক্রযানীরা বলছেন, কার্যপরম্পরা বা গতির বিবর্তন দেখেই আমরা কালের

ধারণায় পৌছাই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা আর কিছুই নয়, প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা মাত্র। যোগের দ্বারা যদি আমরা এই প্রাণক্রিয়াকে রুদ্ধ করে রাখতে পারি, দেহমধ্যের নাড়ী এবং নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে নিশ্চল করে দিতে পারি, তবেই কাল নিরস্ত হতে পারবে। কালের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে কালচক্রযানীদের সাধনায় তিথি বার গ্রহ নক্ষত্র—এককথায় গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশী। পণ্ডিতরা বলেন, কালচক্রযানের উৎপত্তি ভারতবর্ষের বাইরে তিব্বতে এবং পালরাজাদের আমলে এই মতবাদ বাঙলাদেশে আনীত হয়॥

বজ্রযান সাধনপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল গুরু বা সাধনপথ-নির্দেশক ও পরিচালক। গুরুরা সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বভাবগত প্রবণতা আছে সেইটা গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসতেন। এই বিচার-পদ্ধতিকে বলা হত কুলনির্ণয় পদ্ধতি। ডোম্বী নটী রজকী চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী—এই পাঁচ রকমের কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ। ভৌতিক মানবদেহ আবার পাঁচটি স্কন্ধ—রূপ বেদনা সংজ্ঞা বিজ্ঞান ও সংস্কার—এদের সারোত্তম দ্বারা গঠিত। যে-সাধকের মধ্যে যে-স্কন্ধটি বেশি শক্তিশালী বা সক্রিয় সেই অনুযায়ী তাঁর কুল নির্ণয় হোত এবং তাঁর সাধনপন্থাও সেই অনুসারে স্থিরীকৃত হোত। গুরুই ঠিক করে দিতেন বলে গুরু ছাড়া বজ্রযান সাধনা ছিল অচল॥

বজ্রযানের দেবদেবীর সংখ্যাও আবার কম নয়। বজ্রযোগে সাধক স্থিতনিষ্ঠ হলে তাঁর ধ্যানচক্ষুতে এক-একটি দেবদেবী জন্ম নেন এবং তাঁদের নির্ধারিত মণ্ডলে আশ্রয় নেন, একথা বজ্রযানীরা বিশ্বাস করতেন, সেকথা আগেই বলেছি। এই দেবদেবীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে হেবজ্র, বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, বজ্রধর, বজ্রভৈরব ইত্যাদির। বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং সিদ্ধাচার্যরা এইসব দেবদেবীর স্তুতিগান করে অসংখ্য গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচনা করেছিলেন। তবে তাদের অধিকাংশই হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা আজও অপরিজ্ঞাত আছে, সামান্য কিছু মাত্র আমাদের হাতে এসেছে॥

চর্যাপদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মমতের মহাযানীশাখার এই নানা বিবর্তিতরূপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলেই চর্যাপদের ধর্মমতের আলোচনায় এদের গুরুত্ব আছে। তবে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের মধ্যে সহজ বা মন্ত্র বা বজ্রযান কিংবা কালচক্রযানের কোনো একটি যানের কথাই প্রধান নয়। সব যানেরই কিছু কিছু কথা চর্যাগীতিগুলিতে আছে। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য বলেছেন, চর্যাগীতিগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙলা গান। সেই অনুযায়ী স্বর্গত অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু সিদ্ধান্ত করেছেন ৩, ৯, ১৯, ২৮,

৩০, ৩৭ ৩৯, ৪২, ৪৩ ইত্যাদি সংখ্যক চর্যাগীতিগুলি স্পষ্টতই সহজিয়া মতের বাহক। কোনো কোনো চর্যায় বজ্রযানের কথা-যে নেই এমন নয়। লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ কাহ্নু-পাদ বিরূবার চর্যায় যেভাবে ধ্যান, ধমন-চমণ পিঁড়ি, আটকামরা ঘর, বজ্রসাধনা, অবধূত এবং গুরুপ্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে তাতে এরকম্ অনুমান করা স্বাভাবিক, এঁরা বজ্রযানসাধনার দিকেই জোর দিতেন বেশি। চর্যাপদে যে-সমস্ত লৌকিক জগতের বস্তুকে ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে সিদ্ধাচার্যরা নিয়েছেন এবং চর্যাপদের ভাববস্তুর মধ্যে যে-গুহ্য গূঢ়ার্থক সংকেত আছে তার দ্বারাই বোঝা যায়, সিদ্ধাচার্যরা বজ্রযানের প্রতিই পক্ষপাতী ছিলেন বেশি। আবার একই চর্যায় সহজযান এবং বজ্রযানের পাশাপাশি অবস্থিতির বা ইঙ্গিতের অভাব আছে এমন নয়। সেই জন্যেই বোধ হয় একথা বলা সব চেয়ে নিরাপদ এবং যুক্তিসংগত যে, চর্যাপদে কোনো একটা বিশেষ যানের সাধনপদ্ধতিকেই বড় করে দেখানো হয় নি, মহাযানী সাধনার বিবর্তিত বিভিন্ন যানের সমন্বয়ই সেখানে প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। কোনো কোনো চর্যায় দেহবাদ এবং দেহ-সাধনার কথা স্পষ্ট এবং কোনো কোনো পদাবলীতে মন্ত্রসাধনা এবং বজ্রযোগের কথা বলা হয়েছে বলেই নিঃসংশয়িতভাবে তাদের এক-একটা যানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বা করা উচিত—এই ধরনের সংস্কার না রাখাই ভালো॥

আসলে চর্যার মাধ্যমে যে-ধর্মসাধনার কথা সিদ্ধাচার্যরা বলতে চেয়েছেন তা মনোময় অনুভূতিপ্রধান একটা মহৎ উপলব্ধি। আর সেইজন্যেই তা রহস্যময়, কাব্যময়, সাধারণবুদ্ধির অতীত দিগন্তের আধো-আলো-অন্ধকারের অচেনা দীপ্তিতে অস্পষ্ট। এই ধরনের জিনিস তখনই জন্ম নিতে পারে যখন ধর্মগুরুরা ধর্মের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন ধর্মের মনোময় উপাদানের উপর। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, উপনিষদের ধর্ম-সাধনার সম্পূর্ণ আত্মলীন মনোময় স্বভাবের ধারা অব্যাহত আছে পরবর্তী-কালের যোগীদের ধর্মসাধনায় এবং আরো পরে মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের ধর্মচর্চায়। চর্যাপদও এই ঐতিহ্য থেকে বাইরে নেই, নেই তার প্রবাহকে অস্বীকার করার উদ্বেগ-ব্যাকুল চঞ্চলতা। এই Subjectivity-র দিকে সাধক যখন যান, তখন বাঁধা রাস্তায় তিনি চলেন না, আশেপাশের দিকে তাকান, আর সেই চারিপাশের চিন্তার জগতে যদি তিনি এমন কোনো উপাদান দেখেন যা তাঁর নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলে যেতে পারে, তাকে তখন তিনি পরম আদরে নিজের মনে স্থান দিয়ে জীবনসাধনায় রূপায়িত করেন। জীবন্ত ধর্মের এই হচ্ছে লক্ষণ, তা নানা সাধনা নানা ভাবনা বহুতর উপলব্ধি এবং বিচিত্র কল্পনার সমন্বয়ে ক্রমবর্ধিত হয়। হিন্দুধর্মে, বৌদ্ধধর্মে, জৈনধর্মে—আবার হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা শৈবধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্ম, সহজিয়াধর্ম

থেকে আধুনিক কালের ব্রাহ্মধর্মে পর্যন্ত এই সমন্বয় ও মিলনের সুর অব্যাহত আর তা অব্যাহত আছে বলেই সবগুলি আজও কমবেশি স্বীকৃত এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চিত হয়ে আসছে। যেসব ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত, মনোময়তার স্থান যেখানে অবজ্ঞাত এবং অস্বীকৃত, তারা আস্তে আস্তে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। হিন্দুধর্মে এই মনোময়তার স্থান সর্বোচ্চে, তেমনি বৌদ্ধধর্মে। তাই একদিন দুটোই মিলে মিশে যেতে পেরেছে, কিংবা দুটোর থেকেই সংঘষজাত একটি তৃতীয় ধারা জন্ম নিয়ে দুটোরই গুরুত্বকে বোঝবার অবকাশ দিয়েছে॥

চর্যাপদেও এই ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ অব্যাহত। কারণ এর সাধকরা মনোময়তার উপর বা ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথায় ধর্মের Subjective element-এর উপরই জোর দিয়েছিলেন বেশি। আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়, সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী এবং বাঙালী স্বভাবের চিরন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী সব জিনিসেরই Subjectivity-র দিকে আকৃষ্ট হবার মহৎ প্রবণতা থেকে এঁরা কেউ মুক্ত ছিলেন না। আবার বাঙালী চরিত্রের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব সংস্কার-মুক্ত হওয়া, গোঁড়ামি বর্জন করা, তাও সিদ্ধাচার্যদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল না। এই দ্বিবিধ গুণের জন্যেই তাঁরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চর্যাপদের মানবতাবোধজাত সমন্বয়ের দিকে কখনও সোজাসুজি কখনও-বা অলক্ষ্যে পদক্ষেপ করেছেন, কখনও-বা মন্ত্রতন্ত্র ধ্যান জপ তপ আচার ও অনুষ্ঠানের মরুবালুরাশিতে শুষ্কপ্রায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অসারতার দিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দ্বিধা করেন নি। চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে যে-ধর্মমত সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা মূলত মনোময় অনুভূতি-প্রধান ও উপলব্ধিসর্বস্ব, তাই তা সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হতে পেরেছে। যে-গুণের জন্যে উপনিষদ ধর্মব্যাখ্যা হয়েও দর্শন ও কাব্যের সামগ্রী, চর্যাপদের সঙ্গে উপনিষদের গুণগত বিরাট পার্থক্য থাকলেও—চর্যাপদও সেই একই গুণের জন্য ধর্মগ্রন্থ হয়েও কাব্যগীতি। এই ধর্ম এবং কাব্যের দুর্লভ সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম হয়েছে চর্যাপদে এবং সেইজন্যেই বাংলা কাব্যের ঊষালগ্নে চর্যাপদ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক॥

॥ চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য ॥

চর্যাপদে সমন্বয়প্রধান ধর্মমতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা যে-ধর্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে ধর্মের বহিরঙ্গের চেয়ে তার মনোময় বা সাবজেক্টিভ উপাদানগুলির আকর্ষণ ছিল বেশি। তাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মপ্রসারেরই প্রাধান্য। ধর্মকে যখন এই আত্মবোধের প্রয়োজনে নিয়োগ করা হয়, তখনই তা ভাবময় রহস্যময় কাব্যময় রূপ গ্রহণ করে। এই রকম হয়েছে উপনিষদের ক্ষেত্রে, চর্যাপদেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। চর্যাপদ তাই ধর্মাচরণের নির্দেশ হলেও তাতে সাহিত্যগুণের অভাব নেই এবং সেইজন্যেই চর্যাপদ মূলত ধর্মগ্রন্থ হলেও তা কাব্যের মাধ্যমে ব্যক্ত বলেই তাকে সাহিত্যগ্রন্থ বলে সমাদর করতে বাধা নেই॥

তবে একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত। চর্যাপদ যে-সময়ে রচিত, তখন বাংলা ভাষার নিতান্ত অপরিণত অবস্থা। সবেমাত্র সে অপভ্রংশের গর্ভ থেকে বহির্গত হয়ে নূতন আলো-হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে শুরু করেছে। আজ যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি এবং সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করি, সে-ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার এত বিরাট পার্থক্য যে, চর্যার ভাষা বাংলা কি-না তাই নিয়েই এককালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে খুব মতান্তর হয়ে গেছে। পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসম্প্রদায় চর্যার ভাষাকে নিজের ভাষার আদিরূপ বলে দাবি করেছিলেন। চর্যাপদের ভাষাকে এবং তাকে অবলম্বন করে সমগ্র চর্যাপদকে নিজেদের আদি-পুরুষদের রচনা বলে যাঁরা দাবী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উড়িষ্যার এবং মিথিলার অধিবাসীরাই ছিলেন প্রধান। এখন অবশ্য সেই সন্দেহ মিটে গেছে—আচার্য সুনীতিকুমার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, চর্যার ভাষা বাংলা এবং হাজার বছর আগেকার বাংলা ভাষার প্রধানতম নিদর্শন। এই প্রমাণ এবং সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় এই কারণে যে, চর্যার ভাষার অর্থ বোঝাই মুশকিল; সংস্কৃত টীকা এবং তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে তার অর্থ বুঝতে হয়। আবার শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রভাব চর্যায় বেশি, যদিও বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন, এই বিশ্বাস পণ্ডিতদের দৃঢ়। অবশ্য দ্বিতীয় সন্দেহটা মিটলেও অর্থাৎ লোকসাহিত্যের ভাষায় শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রভাব বিস্তৃত এবং ব্যাপক ছিল এই তথ্যটি প্রমাণিত হওয়ার

প্রশ্ন—তবুও চর্যার ভাষা বাংলা কি-না এই সন্দেহটা অনেকদিন বজায় ছিল। সেই বিষয়ে সব গোলমাল মিটিয়ে দিলেন সুনীতিকুমার যখন তিনি দেখিয়ে দিলেন, চর্যাপদের ভাষায় এবং সেই ব্যাকরণগত দিকটায় এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলি কেবল বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়, আজও হচ্ছে। কতকগুলি শব্দ নিঃসন্দেহে বাংলা, কতকগুলি বাক্‌ভঙ্গী বাংলার নিজস্ব এবং যে-সমস্ত উপাদান-কে রূপক ও উপমা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ধর্মতত্ত্ব বোঝানোর জন্যে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিচারে সেগুলি বাঙলার সমাজজীবনেই দীর্ঘকাল ধরে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। এইসব যখন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল, তখনই চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা বলে স্বীকার করে নিতে আর কোনো বাধা কোনো দিকেই রইল না। কিন্তু এ বিষয়ে আজও দ্বিমত নেই যে, চর্যাপদের সাহিত্যিক গুণ যা থাক, চর্যাপদের ভাষাটি বড় কঠিন। সেই ভাষার অনুধাবনের বাধাই চর্যাপদের রসগ্রহণের প্রধান অন্তরায়। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই ঠিকই বলেছেন, চর্যাপদের ভাষা "সন্ধ্যাভাষা" কারণ, সন্ধ্যাবেলার আলো-আঁধারিতে যে-রহস্যময়তা, সেই অপরিচয়ের আলো-অন্ধকারে চর্যাপদ অস্পষ্ট ॥

চর্যাপদের সাহিত্যগুণ বিচারের সময় তাই এই ভাষার অসুবিধাটার কথা মনে রাখতে হবে।

তবে এই ভাষার বিরোধিতাকে যদি আমরা বশে আনতে পারি তা হলে চর্যাপদে যে-সুগভীর কাব্যরস আছে তাকে আমাদের উপলব্ধির জগতে নিয়ে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না। চর্যাপদের অসংখ্য জায়গায় যে-লৌকিক রূপের জগতের বর্ণনা আছে সেই বর্ণনাগুলিই সবার আগে আমাদের মোহিত করে। এই বর্ণনার চিত্রময়তা আমাদের মনকে দোলা দেয় তার বাস্তবতাবোধ এবং কাব্যগুণে। এর কতকগুলি উদাহরণ পাঠকের সামনে উপস্থিত করি ॥

আকাশের নীচে শূন্যতার অনুসন্ধানে উন্নতমস্তক পর্বতে যে-শবরী বালিকাটি বাস করে তার কথাই ধরা যাক। সেই শবরী বালিকা লীলাময়ী, একটি আরণ্য-সৌন্দর্য তার সর্বাঙ্গে। তার খোঁপায় গোঁজা শিখী-পুচ্ছ, বুকের উপর দুলে দুলে উঠছে গলার গুঞ্জার মালা। তার কানের কুণ্ডল সকালের রোদে উঠছে ঝিক্‌মিকিয়ে—আর নির্জন পার্বত্য প্রদেশ জুড়ে তার সরল সহজ সৌন্দর্যটি আলোর মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এই শবরী বালিকাকে যে-পরিবেশে পাঠকের সামনে আনা হয়েছে, সেই পরিবেশটিও কত সুন্দর! শবরীর সামনে পিছনে চারিদিকে নানা বৃক্ষে কত অগণিত বিচিত্র ফুল, গাছের ডালে ডালে আকাশ যেন ছেয়ে গেছে, আর সেই উদার বিস্তৃত মধুর সৌন্দর্যের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে আছে শবরী পুষ্পিত একটি লতার মতো (চর্যা

২৮)। এই-যে বালিকাটি এবং তার আদিম কৌমসমাজসুলভ সাজপোশাকটি আর তার পরিবেশটি একটি-দুটি তুলির টানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রূপদক্ষ শিল্পীর মতো। এই শবরী কিসের প্রতীক, গাছ ডালপালা, ময়ূরের পাখা, গুঞ্জার মালা, ফুল—এ-গুলির গূঢ় অর্থ কী, তা যদি নাও জানি, তা হলেও এই মধুর আলেখ্যটি হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে বাধা হচ্ছে না।

সমজাতীয় আরেকটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে ৫০ নং চর্যাটিতে। সেখানেও শবরী বালিকা নীল মহাশূন্যের নীচে পাহাড়ের উপরে উদার বিস্তৃতির মাঝখানে চাঁচড়ের বেড়ার ঘরে বাস করে। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি ক্ষেত। সেই ক্ষেতে ফুটেছে কার্পাসফুল, কালো মাটির বুকে ছোট ছোট হীরকখণ্ডের মতো সাদা ফুলগুলি শিশুর আনন্দে বিহ্বল। পিছনে আরো একটি ছোট্ট ক্ষেত, সেখানে কঙ্গুচি দানা বা কঙ্গুচিনা ফলের গাছ। সেই গাছের ফল পাকলে শবরী আর শবর হাঁড়িয়া তৈরী করে পানে উন্মত্ত হয়। সারাদিনের পর রাত্রি আসে, আকাশে স্নিগ্ধ আশীর্বাদের মতো দেখা দেয় পূর্ণচন্দ্র, আর সেই চাঁদের আলোয় সেই বেড়া-বাঁধা বাড়িটি একটি বড় সাদা ফুলের মতো অবাক উল্লাসে হেসে উঠে, শোকের মতো বিষণ্ণ অন্ধকার কোথায় মিলিয়ে যায় সেই চাঁদের হাসির বাঁধভাঙা জোয়ারে। আবার অন্ধকার রাত্রিতে সমস্ত পৃথিবী মৃত্যুর মতো কালো হয়ে উঠে। দূরে শ্মশান-ঘাটের এক প্রান্তে ধূ ধূ করে জলে চিতার সিঁদুররঙের লাল আগুনের শিখা—ডুকরে ডুকরে কাঁদে শেয়াল-শকুন। এখানেও সেই আগের চর্যাটির মতো স্বল্প কথায় পরিমিত বাক্-প্রয়োগে সংক্ষিপ্ততম তুলির আঁচড়ে একটি আদিবাসী পরিবারের সহজ সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার শিল্পময় রূপায়ণ॥

এই ছবি আঁকার দিকে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের একটি সহজ স্বাভাবিক দক্ষতার নানা নিদর্শন চর্যাপদের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পাঠককে কবি-সিদ্ধাচার্য নিয়ে গেছেন সেই নদীর ধারে যে গহন গম্ভীর এবং প্রবল স্রোতের বেগে নিয়ত ধাবমান। তরঙ্গসংকুল এই নদীর জলে কী যেন রহস্য নিত্যই ঢেউয়ের দোলায় দোলায় দোলায়িত—দূরে দেখা যায় নদীর পার। তীরভূমি ঢালু হয়ে নেমে এসেছে নদীর জলের মধ্যে, কর্দম-অনুলিপ্ত সেই তীরভূমি দুরধিগম্য। বর্ষার প্রবল জলধারায় ক্ষিপ্ত এই কীর্তিনাশাকে দেখে ভয় লাগে?—তবে চল সেই যুক্তবেণীতে যেখানে গঙ্গা-যমুনার মাঝখানে শান্ত গম্ভীর নদীর জলে অবহেলায় নৌকা বেয়ে চলেছে এক ডোম্বী, দাঁড়ে হালে কাছিতে সাবলীল নিরুদ্বেগে। তার নদী এত চেনা যে, সে ডান-বাঁ কোনো দিকেই তাকাচ্ছে না, কোনো সংশয় ভয় মনে না রেখে সে যাত্রী নিয়ে চলেছে এক পার থেকে অন্য পারে। সেবাই তার ধর্ম, তাই কড়ি না নিয়ে

স্বেচ্ছায় সে সবাইকে নদী পার করে দিচ্ছে। চল সেই নদীর ধারে যেখানে থরে থরে পার্থিব সম্পদ পূর্ণ করা হচ্ছে তরণীতে, আর ঠাঁই নেই। এবার নৌকা ছেড়ে দেবে অজানা অচেনা সেই তীরভূমির দিকে যার জন্মে পসারীর মন ব্যাকুল। দেখ ঐ মাঝিকে, সে খুঁটি উপড়িয়ে ফেলে নৌকার বাঁধন মলিন কাছিটি খুলে দিল। সাবধানে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে সে দাঁড় বেয়ে চলল এক পার থেকে আরেক পারে, চেনা জগতের তীরভূমি থেকে অচেনা রহস্যের দিকে (চর্যা ৮)। আবার এসো এইখানে, এই পারে, যেখানে ওপার থেকে নৌকাটি বেয়ে খেয়ামাঝি সবে ঘাটে লাগিয়েছে। যাত্রীরা একে একে নেমে আসছে মাটির উপরে। পাটনী তীরে দাঁড়িয়ে সকলের কাছে খেয়াপার করে দেবার মজুরি আদায় করে নিচ্ছে। কারো হয় তো পারের সম্বল নেই, তার কাপড়চোপড় হাতড়ে পুঁটলি বটুয়া খুঁজে একটি কি দুটি কড়ি পার করতে চাইছে একটা লোভের হাত॥

এই আশ্চর্য বাস্তব অথচ কাব্যময় নিখুঁত দৃশ্য ছায়াছবির মতো পাঠকের মনের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়। প্রকৃতি এবং মানুষকে কত নিবিড়ভাবে চিনলে এবং ভালোবাসলে এই ছবিগুলি আঁকা যায় তা সহজেই বোঝা যায়। ঐ-যে টিলার উপর ঘরটি যেখানে হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য তবু যেখানে অতিথি; ঘরের আঙিনায় তেঁতুল গাছটি যার ফলভোগে বৃক্ষস্বামীর অধিকার নেই; নতুন বধূটি যার কানের কানেটটি রাত্রিতে চোরে নিয়ে গেছে—শ্বশুর ঘুমোচ্ছেন, জানেনও-না কী সর্বনাশ হয়ে গেছে অর্ধরাত্রে—সেই বধূর বিষণ্ণ মুখটি; একতারা বাজিয়ে যে-যোগী মনের আনন্দে নেচে চলেছে পথে পথে অব্যক্ত ভাবে বিভোর হয়ে; মাদল বাজিয়ে জাঁকজমক করতে করতে বর চলেছে নতুন সঙ্গিনী আনতে, সেখানে মেয়েলী আচার, বাসরঘর, নতুন বধূ, রমণী-পরিবৃত একটি অচেনা রহস্য—তার ছবিটি কত নিখুঁতভাবে সামান্য দুটি-চারটি কথায় ফুটিয়ে তোলা। এমনি অজস্র কাব্যময় চিত্র চর্যাপদের ছত্রে ছত্রে। অরণ্যের নিভৃত অন্ধকারে মৃত্যুর মতো ভয়ংকর শিকারীর জাল বিছিয়ে হরিণ ধরা, ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের জলগ্রহণ না করা, তৃণ বর্জন করা, আবার হঠাৎ একটু মুক্তির অবকাশে দ্রুতগমনে দিগন্তের দিকে নিরুদ্দেশ হওয়া; শান্ত পাহাড়, পুষ্পিত গাছ, স্রোতময়ী নদী, বিহ্বল জ্যোৎস্না; দীপ্ত মন্দির, দীপধূপময় তার অভ্যন্তর, সুগন্ধ-সিঞ্চিত তার ভিতরের বাতাস; অন্ধকার ঘরে চঞ্চল মূষিক; তিনধাতুর খাটে পান-মুখে বক্ষলগ্নবধূর সাহচর্যে মিলন-বিধুর প্রেমিক; শান্ত সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা, গোয়ালে গোরু এবং গোরুর দুধ দোয়ানো এবং ফেনময় দুধের উষ্ণ সুগন্ধ—কাছ থেকে দেখা দৈনন্দিন জীবনের কত সূক্ষ্ম চিত্র এই চর্যাপদের বিভিন্ন শ্লোকে। এই বস্তুময় অথচ কাব্যমধুর চিত্রগুলি ধর্মের উপাদান, কিন্তু কাব্যের সামগ্রী। একদিক দিয়ে

বাংলা কাব্যে কাব্যের উপাদান হিসাবে বাস্তবতার প্রথম উদ্বোধন হয়েছে চর্যাপদে। তাই চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য নগণ্য নয়॥

শুধু বাস্তবপ্রেমিকতা নয়, ভাবের জগতেও পাঠককে নিয়ে যেতে সিদ্ধাচার্যরা ব্যর্থ হন নি। এই বাস্তব উপাদানগুলির সাহায্যেই সিদ্ধাচার্যরা পাঠককে ভাবের রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কারণ যে-ধ্যানের আকার নেই, বর্ণনা নেই, তাকে পাঠকের মনে ধরিয়ে দেবার জন্যে সেই উপকরণগুলি দরকার যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায়, চেনা যায়।

তাই যখন বলা হচ্ছে চিত্ত এবং চিত্তজ মোহের কথা—তখন উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে গাছ এবং তার ডাল বা ফল। সেই গাছ তো চিরজীবী নয়, একদিন-না-একদিন তার ধ্বংস হবে, তেমনি চিত্তজ মোহ নিয়ে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না, বাসনা কামনা তাকে পরমসুখ দিতে পারবে না। আবার মিথ্যা ধ্যানে, মিথ্যা মন্ত্র উচ্চারণে, মহামূল্য নৈবেদ্য সাজিয়েই কি মূঢ় হৃদয় সেই পরমসুখের সন্ধান পেতে পারবে! এইসব বাইরের জিনিস দিয়ে সেই অন্তরতমের সন্ধান পাবে কে! 'নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে'।

এই বাইরের আড়ম্বরটাই-যে জীবনে বড় নয়, বাইরের রাস্তাটি ভিতরে যাওয়ার প্রবেশপথ মাত্র, এই তত্ত্বটি সুগভীর কাব্যময় বোধের দ্বারা চর্যাপদে প্রকাশিত। সেই নিরাত্মা নিরাবয়ব পরমপ্রিয়ই সিদ্ধাচার্যদের চরমকামনা। তাঁকে পাবার জন্যে তাঁদের যে-ব্যকুলতা তা অনেক সময় কৃষ্ণের জন্যে শ্রীরাধার আকুলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন গুণ্ডরীপাদের এই চর্যাটি—

> তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী
> কমল-কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী।
> জোইনি তঁই বিনু খনহি ন জীবমি
> তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।
> খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ
> মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ। [চর্যা : ৪]

তেমনি আবেগের ব্যাকুলতায় যোগী লজ্জা ছাড়বেন, ঘৃণা ছাড়বেন, কলঙ্ককে করবেন অঙ্গের ভূষণ। সেই নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন, তাই তিনি নির্ঘৃণ কাপালিক সেজেছেন, ডোম্বীকে তিনি সাঙা করবেন; নট সেজে ডোম্বীর চেঙারি বইবেন, কারণ সেই নিষ্ঠুর নিদয়া তাকেই ধরা দেবেন যে বাইরের লোকলজ্জা আভাসদোষ এবং স্বভাবকে করতে পারবেন হেলায় তুচ্ছ॥

তবুও সব করেও হয় তো দেখা যাচ্ছে প্রিয়মিলনের মন্দিরটির পথ বন্ধ—

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা
তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস।
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিনা।
জে জে আইলা তে তে গেলা
অবনাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা।

জিনপুরের কাছে কাহ্নুপাদ এসেছেন, কিন্তু—

হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি ন পইসই।

হয় তো মনে এখনও কিছু মোহ আছে, তাই নিকটে অবস্থিত জিনপুর আজও তাঁর কাছে দূরে॥

এই না-পাওয়ার বেদনা আরো অনেক চর্যায় বিরহবিধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সোনায় ভরে তুলেছি করুণা-নৌকা, রূপা রাখবার আর ঠাঁই নেই, খুঁটি তুলে দড়ি খুলে নৌকা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু কী করে যাব সেই দেশে যেখানে সর্বসুখ। কোথায় সেই সদ্‌গুরু যাঁর উপদেশে

বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।

সেই মহাসুখ পাবার ব্যাকুলতা-যে কেমন উগ্র, সেটিও চমৎকার একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে কাহ্নুপাদ বুঝিয়ে দিয়েছেন ৯নং চর্যায়। শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে হস্তীকে, কিন্তু করিণীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সে যখন উন্মত্ত, তখন এই সামান্য পার্থিব বন্ধন কি তাকে বেঁধে রাখতে পারে! তাই—

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ
বিবিহ বিআপক বন্ধন তোড়িউ।
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা।
জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ।

ধরা দিয়েও ধরা দিতে চায় না সেই পরমপ্রিয়। কত বেদনা কত যন্ত্রণা নিয়ে, কত দুঃখময় পথ, উত্তাল তরঙ্গসংকুল নদী পার হয়ে সাধক আসছে—তবুও সেই ডোম্বী ছলনাময়ী রমণীর মতো দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। এই পেয়েও না-পাওয়ার বেদনা চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে কাহ্নপাদের ১৮নং চর্যায় :

তিনি ভূঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ
হাউ সুতেলি মহাসুহ-লীলেঁ।
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী।
তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।

এই চতুরালি স্বভাবের জন্যই তো সেই পরমসুখদাত্রীর উপর রাগ হয়, তাই—

কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ না মেলই।

প্রবল অভিমানে কাহ্নপাদ শেষে বলছেন :

কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী
ডোম্বীত আগলি নাহি ছিনালী।

ডোম্বীর চেয়ে ছিনালীপনা আর কোনো মেয়েমানুষের নেই। কিন্তু রাগ হলেও, অভিমান হলেও সাধক তো ভুলতে পারছে না—

হাউঁ নিরাসী খমণ-ভতারি
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।
ফেটলিউ গো মাএ আন্তউরি চাহি
জা এথু চাহমি সো এথু নাহি।

আমি আসঙ্গ-রহিত, মন শূন্য, মোহ বিগত। আমি বিষয় ছেড়েছি, কারণ দেখছি—আঁতুড় ঘরে মানুষের গমনাগমনের শেষ নেই। আমি যা চাই তা তো এই পৃথিবীতে নেই! তবুও একটু চঞ্চলতা হয় তো চিত্তে আছে যে-চঞ্চলতা মূষিকের মতো অন্ধকার রাত্রিতে চুপি চুপি হৃদয়ের সমস্ত অমৃত খেয়ে যাচ্ছে। এই মূষিককে মারো, চঞ্চলতাকে দূর কর। হয় তো তখনই তার 'উঞ্চল-পাঞ্চল' শেষ হবে এবং সর্ব চঞ্চলতা-মুক্ত চিত্ত পরমানন্দে নিশ্চল হতে পারবে॥

যে না-পাওয়ার বেদনা কবিতার প্রাণ সঞ্চার করে, যে-বিষণ্ণতম ভাবনাগুলি মধুরতম সংগীতের জন্ম দেয়, তার অভাব চর্যাপদের কোথাও নেই। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পরোক্ষে এই না-পাওয়ার বেদনাই মূর্ত হয়েছে কাব্যময়

ভাষায়। তুলো ধোনার মতো করে বাসনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, তবুও শান্তি-পাদের আক্ষেপ—

তউসি হেরুঅ ন পাবিঅই
শান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই।

লুইপাদ বলছেন, কী করে আমি বুঝাবো সেই পরমসুখ কি—

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
অইস সংবোহে কো পতিআই।

*   *   *

কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।

কী বলে আমি সেই পরমপ্রিয়ের পরিচয় দেব। কেউ বলেন, ভাবের অস্তিত্ব নেই, অভাবও নেই, এই অবস্থায় বোধ হয় সেই সত্যকে বোঝা যায়। কিন্তু যার বর্ণচিহ্ন নেই, বেদ আগমে যার ব্যাখ্যা নেই তার বিষয়ে কী বলে আমি জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের সমাধান করব! জলে যে চাঁদের প্রতিবিম্ব তা মিথ্যা না সত্য—কে বলে দেবে আমাকে? তাই লুইপাদের আক্ষেপ—

লুই ভণই মই ভাইব কিস
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।

সরহপাদ সমাধান করছেন এই বলে:

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল
চিঅরাঅ সহাবে মুকল।

চিত্ত কেবল সহজ পথেই মুক্তি পেতে পারে। তাই রে মূঢ়—

উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহরে বঙ্ক
নিঅড়ি বোহি মা জাহরে লাঙ্ক।

ঋজুপথ বা সোজা সহজানন্দের পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না। বোধিজ্ঞান নিকটেই আছে, তার জন্যে দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দরকার নেই গুরুর উপদেশের, কারণ হাতের কঙ্কণ দেখবার জন্য কি দর্পণ লাগে! তাই 'অপণে অপা বুঝত নিঅমণ।'—নিজের মনের মধ্যেই পরমতত্ত্ব, বুঝবার চেষ্টা কর॥

দিশাহারা হৃদয়কে শান্ত করার জন্য, প্রিয় মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল সাধককে কত বার-যে সান্ত্বনা দিয়েছেন সিদ্ধাচার্যরা! সাবধান করে দিচ্ছেন, নির্বোধের মতো দিশা-হারা হয়ে পথ ভুল কোর না; যারা ভুল পথে গেছে তারাই পথ হারিয়ে কত কষ্ট পেয়েছে। শান্তিপাদ বলছেন:

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ বিআরেঁ অলকখলকখণ ণ জাই
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সেই।

সেই জন্যেই ব্যাকুল হৃদয়—

কূলে কূল মা হোইরে উজুবাট-সংসারা
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা।

কূলে কূলে তুমি ঘুরে বেড়িও না, বালকের মতো পথ ভুল কোর না। একপথে লক্ষ্য স্থির রাখ, তোমার সেই পরমধ্যান নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে ধরা দেবে।

কিন্তু এত আশ্বাস এত সান্ত্বনা এত সহানুভূতি সত্ত্বেও সাধকের হৃদয় তো শান্ত হয় না—বারবার সে গুমরে গুমরে ওঠে, সে খালি ভাবে—

ভূলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু
আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু।
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই
শান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই।

এই বেদনা এই আর্তি এই পরমপ্রিয়ের জন্য অশ্রুময় ব্যাকুলতা—তা-ই চর্যাপদের প্রাণ; সেইজন্যেই ভাববস্তুর কাব্যময় পরিবেশনে চর্যাপদের স্থান অবহেলার নয়॥

কাব্যবিচারে অনেকে অনুভূতির চেয়ে শাস্ত্রকে প্রাধান্য দেন। অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার করবার চেষ্টা করেন এর রূপ রস রীতি কাব্যময় কি-না। যাঁরা এইভাবে কাব্যবিচার করে আনন্দ পান, চর্যাপদ তাঁদেরকেও নিরাশ করবে না। শাস্ত্রানুযায়ী অলংকার দুই শ্রেণীর—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকারের মধ্যে প্রথম জিনিস অনুপ্রাস। একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যদি কোনো বাক্যের মধ্যে বারবার ব্যবহৃত হয়ে একটি ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করে, তবে হবে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি। চর্যাপদে এর অভাব নেই। যেমন—

বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা (চর্যা ১৪)।
সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ বিআরেঁ অলকখলকখণ ণ জাই (চর্যা ১৫)।
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণ বখাণে (চর্যা ৩৪)।

ইতস্তত দু-তিনটি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দিলাম অনুপ্রাসের প্রয়োগ দেখানোর জন্যে। প্রথম পঙ্‌ক্তিটিতে 'ব', দ্বিতীয়টিতে 'অ' এবং তৃতীয়টিতে 'ন্ত' ধ্বনির অনুপ্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। চর্যাপদে অন্ত্যানুপ্রাসের, অর্থাৎ একটি পঙ্‌ক্তির শেষের শব্দটির ধ্বনির সঙ্গে পরবর্তী চরণের শেষের শব্দের ধ্বনির মিলের উদাহরণের অভাব নেই, কারণ সমগ্র চর্যাপদের সমস্ত গানেই এই অন্ত্যানুপ্রাসের বহুল ব্যবহার। যেমন—

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই। [চর্যা : ১]

আদ্যানুপ্রাসের উদাহরণেরও অভাব নেই—

জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ। [চর্যা : ৯]

এখানে প্রথম চরণের আদ্য শব্দ 'জিম জিম'-র সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের আদ্য শব্দ 'তিম তিম'-র অনুপ্রাস।

শব্দালংকারের অন্তর্গত শ্লেষ অলংকারের, অর্থাৎ একটা শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করে দুটি অর্থ সৃষ্টি করার কৌশলও চর্যাপদের সিদ্ধাচাযরা জানতেন। যেমন—

সোণে ভরিতী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিক ঠাবী। [চর্যা : ৮]

এখানে সোনা অর্থ সুবর্ণ ও শূন্যতা ; রূপারও দুটি মানে রৌপ্য এবং রূপের জগৎ।

কাকুবক্রোক্তি বা ইতিবাচক শব্দে নিষেধাত্মক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদাহরণও চর্যাপদে কোনো কোনো জায়গায় আছে। একটি প্রয়োগ—

রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই। [চর্যা : ৪১]

'রজ্জুসর্প দেখে যে চমকে উঠে তাকে কি সত্যি সত্যি সাপে কাটে?'—এর অর্থ এমন লোককে সাপে কাটে না। এই নিষেধাত্মক ব্যঞ্জনাই এখানে ইতিবাচক বাক্‌ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশিত। আরেকটি উদাহরণ—

মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণি হ্নাই।

স্নান করলেই কি মোক্ষলাভ করা যায়?—এখানে বলার উদ্দেশ্য, কেবল স্নানে মোক্ষলাভ করা যায় না॥

অর্থালংকার সৃষ্টি হয় বাক্যে শব্দকে কেবল অর্থের আশ্রয়ে গ্রহণ করে অলংকার রচনার উপর। অর্থালংকারের দ্বারা সৃষ্ট সৌন্দর্য বাক্যের ভিতরের শোভাকে পরিস্ফুট করে। উপমা, রূপক, সন্দেহ, নিশ্চয়, সমাসোক্তি ইত্যাদি নানা জিনিস ব্যবহার করে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার সৃষ্টি করা যায়। চর্যাপদে ব্যবহৃত অসংখ্য রূপক এবং উপমার কথা আগের একটি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে সেগুলি আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। অন্য শাখাগুলির নিদর্শন বরং চর্যাপদে অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে॥

প্রথমে দেখা যাক সমাসোক্তির ব্যবহার—অর্থাৎ অচেতন বস্তুর উপর চেতন বস্তুর ব্যবহারের কল্পনা। নদী অচেতন বস্তু, কিন্তু সে যদি চেতন বস্তুর মতো আচরণ করে, তবে হবে সমাসোক্তি। চর্যায় এর উদাহরণ—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।

আরেকটি—

ফিটেলি অন্ধারিরে আকাশ-ফুলিআ

'আকাশ-কুসুমের মতো অন্ধকার ছুটে পালালো।' অন্ধকার অচেতন বস্তু, কিন্তু ছুটে পালাচ্ছে চেতন বস্তুর মতো॥

বিরোধ—অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যেখানে বিরুদ্ধভাবের কথা বলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাৎপর্য বিশ্লেষণের পর আর বিরুদ্ধভাব থাকল না—এমন অলংকারের উদাহরণ চর্যাপদের বহু জায়গায় আছে। যেমন—

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
*　　*　　*
জো সো বুধী সোধ নিবুধী।
জো সো চোর সোই সাধী। [চর্যা : ৩৩]

সন্দেহ অলংকারের উদাহরণ—

জামে কাম কি কামে জাম।

স্বভাবোক্তি অর্থাৎ স্বভাবের বা নিসর্গের কিংবা যে-কোনো প্রাণীর স্ব স্ব রূপের ও ক্রিয়ার সূক্ষ্ম অথচ চমৎকার বর্ণনার অভাবও চর্যাপদে নেই। একটি উদাহরণ—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালি।
একেলা সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥ [চর্যা : ২৮]

আরেকটি উদাহরণ—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।
ছাড় ছাড় মাআ মোহ বিষম দুন্দোলী
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা
সুকড়এ সে রে কপাসু ফুটিলা।

তইলা বাড়ির পাসঁের জোহ্না বাড়ী উএলা
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ।
কঙ্গুচিনা পাকেলারে শবর শবরী মাতেলা,
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহঁ ভেলা॥ [চর্যা : ৫০]

বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেই-যে সিদ্ধাচার্যরা সফল হয়েছিলেন তাই নয়, রসসৃষ্টির দিকেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। কোনো কোনো চর্যাপদ রসসৃষ্টির বিচারেও সাহিত্য গুণসমন্বিত। কাব্যপাঠের পর আমাদের মনে যে-একটি অপূর্ব ভাব বা অনুভূতি জাগছে, তাকেই আমরা বলছি রসাস্বাদ করা। রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ, আর আমরা যে-জগতে বাস করি সে-জগৎ লৌকিক। রবীন্দ্রনাথ রসসৃষ্টির পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলেছেন, কবির নির্ভর অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্যের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মে থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়েই মানবপ্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা করেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আচরণের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যা অনুভব করবেন, তার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে মনে কোনো সন্দেহ না থাকলেও তিনি বাস্তবকেই অবলম্বন করে যে-অবাস্তব আনন্দের সৃষ্টি করবেন তাই হবে রসসৃষ্টির হেতু॥

চর্যাপদে কি এইভাবে সিদ্ধাচার্যরা রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন? আমার নিজের তো মনে হয়, বাংলা কাব্যের এই আদি নিদর্শনে এই ধরনের রসসৃষ্টির লক্ষণ অনুপস্থিত নয়। চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যরা যে না-পাওয়ার বেদনা প্রকাশ করেছেন বা যাকে অন্তর দিয়ে কামনা করেছেন তাকে অবশেষে পাওয়ার যে-অবিমিশ্র আনন্দের কথা প্রকাশ করেছেন, তা ব্যক্তির জীবনের অর্থাৎ লৌকিক জগতের পাওয়া না-পাওয়ার কথা নয়, তা নিখিল মানবের ঘনীভূত শোকের ভাব বা অপার্থিব প্রাপ্তির সুখানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে বলা হয়েছে, কাছে আছি তবুও কোনো বাধা আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, মিলনের মাঝখানেও আমি বিরহ-কারায় আবদ্ধ। সামনে সুধার পারাবার তবু পোড়া আঁখি দুটি তার নাগাল পাচ্ছে না; এই কুহেলিকার বাধাকে আমি কী করে সরাব!—এই গানটিতে যে-বেদনার হাহাকার, তা একটি বিরহিণীকে কেন্দ্র করে ব্যক্ত হলেও নিখিলের সমস্ত বিরহিণীর বেদনার অশ্রুজলে সিঞ্চিত এই করুণ আর্তি। সরহপাদের একটি চর্যাতেও

(নং ৩৯) সমভাবের নিগূঢ় ব্যাকুলতা প্রকাশিত। তিনিও পরম বেদনায় ক্রন্দন করে উঠেছেন, মন তোমার একটি বাধা, অবিদ্যার বাধাই চরম অন্তরায়, যা তোমাকে মিলনের আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তুমি চোখ-ঢাকা বলদের মতো মোহচক্রের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছ, তাই সামনে সুধাপারাবার থাকা সত্ত্বেও তোমার চোখ তার নাগাল পাচ্ছে না। শান্তিপাদ যখন বলেন, 'তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু', তখনও সেই করুণ বিলাপ—সব ছাড়লাম, বাসনাকে তুলো ধোনার মতো করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেললাম, তবুও যা এখানে তাতে তো আমার মন ভরছে না! যার জন্যে আমার এত করা তাকে তো আমার বুকে পাচ্ছি না। আবার ভুসুকু যখন বলছেন, আমি হতভাগ্য হলাম, কারণ আমার সব-কিছুই লুঠ হয়ে গেছে, তখনও কি তিনি স্থির নিশ্চয় হতে পেরেছেন, যার জন্য তিনি সব ছাড়লেন তাকে তিনি পেয়েছেন! কাহ্নপাদেরও অনেক চর্যায় এই করুণ রস বিরহবেদনা ও না-পাওয়ার যন্ত্রণাকে অবলম্বন করে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। জানি না, সেই পাওয়া কী ধরনের, কী ধরনের ধর্মাচরণ করলে সেই পাওয়া হৃদয়ে অনুভব করা যাবে—কিন্তু একথাটা তো ঠিক, এই ধর্ম ও দর্শনের অনুভূতি পার হয়েও এখানে এই আকুল ক্রন্দন শুনে সমস্ত মনটা গুমরে গুমরে উঠছে। এই ভাব-সংবেদ্য রসমণ্ডিত কাব্যস্রোত যদি চর্যাপদের শ্লোকগুলিতে প্রকাশিত না হোত, তবে নিশ্চয়ই তার কোনো মূল্য আমাদের কাছে থাকত না। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে তাকে আমরা পূজো করতাম, জীবনচর্যায় প্রয়োগ করতাম না। এই দিকটি বিবেচনা করলে এবং সহানুভূতির সঙ্গে চর্যাপদের শ্লোকগুলি অনুধাবন করলে আমরা শৃঙ্গাররস, করুণরস, অদ্ভুত রস ও শান্ত রসের সন্ধান পাব। অবশ্য আধুনিক কালের পরিণত বাংলা ভাষায় যে-সমস্ত কাব্য রচিত হয়েছে তাতে রসসৃষ্টির যে-আশ্চর্য কৌশল আমরা দেখি, ঠিক সেই ধরনের জিনিস আমরা চর্যাপদে পাব না। কারণ, কবিপ্রতিভার অভাব না থাকলেও যে-ভাষায় সেই প্রতিভার প্রকাশ সেই ভাষার পঙ্গুতাই সম্যক রসসৃষ্টির পক্ষে প্রধান বাধা ছিল। সিদ্ধাচার্যদের রচনার বহু জায়গায় এই অন্তরায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। সেই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি পঙ্‌ক্তিতে সিদ্ধাচার্যরা যে-রস সৃষ্টি করার দুর্লভ ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই আমাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দাবী করে॥

শব্দ ব্যবহারের সুকৌশল পদ্ধতির সাহায্যে ভাবানুযায়ী ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির দিকেও সিদ্ধাচার্যদের লক্ষ্য ছিল। প্রবল স্রোতের দুরন্ত গতিতে দুর্দম নদীর কথা যখন বলছেন সিদ্ধাচার্য চাটিলপাদ, তখন নদীর বর্ণনায় যে-শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তার দ্বারাই নদীর দুস্তর ভয়াল রূপটি শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে ফুটে উঠেছে। যখন বলছেন 'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী, দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী'—তখন

গহন, গম্ভীর, বেগেঁ, দুআন্তে, থাহী—ইত্যাদি গম্ভীর শব্দ ব্যবহারের দ্বারাই নদীর ভয়ংকর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। ভুসুকুর চর্যায় হরিণ শিকার প্রসঙ্গে প্রথম আরম্ভের কথাগুলি ধ্বনিমাধুর্যে শিকারের একটি ভয়াল নৃশংস রূপকে নিঃসংশয়ে ফুটিয়ে তুলেছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'হাক' শব্দটি ধ্বনি-রুক্ষতার গুণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদমত্ত মাতঙ্গের প্রসঙ্গে মহীধরপাদ তাঁর চর্যায় (নং ১৬) প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তিতে যে-ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন, তাও অনুধাবনযোগ্য। আবার যেখানে বেদনার কথা হতাশার কথা ব্যাকুলতার কথা, সেখানেও মিষ্ট স্নিগ্ধ ললিত শব্দ ব্যবহারের প্রয়োগ তাঁরা দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। যেমন ধরা যাক এই পঙ্‌ক্তি দুটি—

এতকাল হাঁউ অচ্‌ছিলো স্বমোহেঁ
এবে মই বুঝিল সদ্‌-গুরু বোহেঁ।

বা এই শ্লোকটি—

জোইনী তঁই বিনু খনহি ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।

কিংবা—

অপনে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবঅ আপনা।
অম্হে ণ জানই অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।

তখন যে-শব্দগুলি ভাব প্রকাশের জন্য কবিরা ব্যবহার করেছেন, তার বিশেষত্ব সহজেই আমাদের শ্রুতিকে আকৃষ্ট করে। এই শব্দগুলিতে যুক্তাক্ষর বেশি নেই; 'ল', 'ন', 'ম' ধ্বনি অর্থাৎ যার দ্বারা সহজে ভাষায় এবং শব্দে মিষ্টত্ব সৃষ্ট হয়, সেগুলির প্রাচুর্য শব্দের কাঠিন্যকে দূর করার জন্যে॥

ছন্দের দিকে এবং চর্যাপদগুলির আঙ্গিক গড়নের দিকে সবশেষে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রসঙ্গের ইতি করব। চর্যাপদকেই আমরা বাংলা কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরে থাকি। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় চর্যাপদ যেমন অপরিহার্য, বাংলা গীতিকবিতার উৎস নির্ণয়েও চর্যাপদের স্থান তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা দিকে চর্যাপদগুলি বাংলা পদাবলী-সাহিত্যের আদর্শস্থানীয়, কারণ বাংলা ভাষায় রচিত পয়ারের প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা চর্যাপদেই প্রথম পেয়েছি। চর্যাপদে দীর্ঘপয়ার, লঘুপয়ার—দুই রকমেরই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। যেমন বারো মাত্রার পয়ার—

ডোম্বী বিবাহিআ | অহারিউ যাম।
যউতুকে কিঅ | আণুতু ধাম ॥
অহনিশি সুরঅ | পসঙ্গে জাঅ।
জোইনি জালে | রঅণি পোহাঅ ॥

আরো লঘু্ চালের পয়ার—

পেখু সুঅণে অদশে জইসা
অস্তরালে মোহ তইসা।
মোহ বিমুক্কা জই মণা
তবেঁ টুটই অবণাগমনা।

দীর্ঘ পয়ারের নিদর্শন—

নানা তরুবর মউলিল রে | গঅণত লাগেলী ডালী
একেলা সবরী এ বণ হিণ্ডই | কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।
তিঅধাউ খাট পাড়িলা সবরো | মহাসুহে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী | পেক্ষরাতি পোহাইলী।

এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে ত্রিপদীতেও সাজানো চলে—

নানা তরুবর   মউলিল রে
    গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলা সবরী   এ বণ হিণ্ডই
    কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅধাউ খাট   পাড়িলা সবরো
    মহাসুহে সেজি ছাইলি।
সবরো ভুজঙ্গ   নৈরামণি দারী
    পেক্ষরাতি পোহাইলী ॥

চর্যাপদের সমস্ত চর্যাতেই অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত। তবে 'ডালী'র সঙ্গে 'ধারী'— এই রকম অস্বাভাবিক এবং শ্রুতিকটু মিল কোনো কোনো চর্যায় দেখতে পাওয়া যাবে ; বাংলা ভাষার তৎকালীন অবস্থা স্মরণ করে আমরা এই দোষগুলি উপেক্ষা করতে পারি। আধুনিক কালের বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান কবিদের অনেকেই তো এই দোষে দোষী, সুগম মিল দিতে তাঁদের অনেকেই অক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাঁদের যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তবে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের এই দুর্বল দিকটাও আমরা স্বীকার করে নেব। শুধু স্বীকার করে নেব না, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও হব এই কারণে যে, সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এবং চর্যাপদের প্রচার ও প্রভাব

সংস্কৃতে লিখলে অনেক বেশি এবং স্থায়ী হোত জেনেও, এই বাঙালী কবিরা সুগভীর দরদ দিয়ে অপরিণত বাংলাতেই এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন এবং আঙ্গিকের দিকে সংস্কৃতের অনুকরণ একদম করেন নি। সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সংস্কৃতের জাতিছন্দে কাব্য রচনা করেন নি, বৃত্ত ছন্দেই তাঁরা চর্যাগুলি রচনা করতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই প্রেরণার পিছনে অপভ্রংশের প্রভাব কিছু কম ছিল না। এই সিদ্ধাচার্যদের প্রতিভার জোরেই বাংলা ছন্দের নিজস্বতার মূল ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে। এই কারণেই বাংলা কবিতার জনক হিসাবে সিদ্ধাচার্যদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ভিত্তি রচনা ছাড়াও সিলেবল্-এর সংখ্যা অনুযায়ী তাঁরা বাংলা ছন্দের নামকরণও করেছেন। যেমন এই 'দশাক্ষরা' ছন্দটি—

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ
সঅলধাম উইআ তবেঁ।
আচ্ছহুঁ চউখন সংবোহী
মাঝ নিরোহেঁ অনুঅর বোহী।
বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা॥ [চর্যা : ৪৪]

এই ছন্দের আরেকটি নিদর্শন—

সোণে ভরিতী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।

৪৯নং চর্যাতেও এই ধরনের ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম গণনায় চর্যাপদের কবিতাগুলিতে ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মাত্রার ছন্দ। অক্ষরসমতা একই চর্যাপদের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির মধ্যে সর্বত্র নেই। কিন্তু যে-পরীক্ষা তাঁরা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাকেই অবলম্বন করে বাংলা ছন্দের একাবলী, পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদির ভিত্তি গঠিত হয়ে যায়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যেও চর্যাপদের ছন্দের প্রভাব দেখা যায়। যেমন চর্যাপদের—

কিন্তো মন্তে | কিন্তো তন্তে | কিন্তোরে ঝাণব | -খানে
অপইঠান | মহাসুহলীলেঁ | দুলক্‌খ পরম নি | -বাণে

এই পংক্তি দুইটির ছন্দের সঙ্গে গীতগোবিন্দমের—

ধীর সমীরে | যমুনাতীরে | বসতি বনে বন | -মালী
পীন পয়োধর | পরিসরমর্দন | চঞ্চল-কর-যুগ | -শালী

এই ছন্দের সঙ্গে মিল স্পষ্ট॥

আরো একটা দিকে চর্যাপদের বিশেষত্ব আছে।

চোদ্দটি পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতার নিদর্শন চর্যাপদে অনুপস্থিত নয়। অবশ্য 'সনেট' নামে চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ বিদেশী কবিতার অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন যে-চতুর্দশ-পদাবলী রচনা করেছেন—চর্যাপদের চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতা সে-জিনিস নয়। তাতে octave-sestet-এর আট-ছয় ভাগ নেই, সনেটের অন্যান্য লক্ষণও তাতে নিঃসংশয়ে অনুপস্থিত। তবে সনেট এবং চোদ্দটি পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতাকে আমরা যদি সমার্থক হিসাবে মেনে নিতে মনকে উদার করি, তবে ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালী কবিরাই-যে চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ নিটোল কবিতা রচনার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক এই ভেবে আমরা নিশ্চয় গর্ববোধ করতে পারি। এই রকম একটি কবিতা চর্যাপদ থেকে উদ্ধৃত করি :

নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পাদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদ্‌ভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥
তু লো ডোম্বি হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥ [চর্যা : ১২]

শবরপাদের ২৮নং চর্যা এবং ৫০নং চর্যাও এই চোদ্দটি পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ। তবে বেশির ভাগ চর্যাই দশ পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত। কোথাও-বা আট পঙ্‌ক্তিতে॥

এই আলোচনায় চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য-বিচার প্রসঙ্গে আমি সাধারণত যে-সমস্ত মাপকাঠিতে কাব্যের মূল্য নির্ণয় হয় অর্থাৎ ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি—তাই দিয়েই চর্যাপদের সাহিত্যগুণ বিচার করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাব্যবিচারে এই সমস্ত মাপকাঠিই সব নয়। সব চেয়ে বড় মাপকাঠি পাঠকের অনুভূতি। যদি সেই অনুভূতিতে কোনো কাব্য নাড়া দিতে পারে তবে তার ভাষা

ছন্দ অলংকারে প্রয়োগের অসম্পূর্ণতা থাকলেও তা-ই সত্যিকার কাব্য। ভাষা, ছন্দ, অলংকারের দিকে চর্যাপদ নিশ্চয় ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চর্যাপদকে সুষ্ঠু সুন্দর কাব্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করি না এই কারণে যে, চর্যাপদে আছে সুগভীর মানবতাবোধের নির্মল অনুভূতিপ্রবণ নির্ঝর এবং প্রেমভক্তির সমন্বয়েই তার সাহিত্যমূল্য। বাংলা কাব্যের আদিলগ্নে এই অপূর্ব সমন্বয়ের সূচনাই বাংলা গীতিকবিতার মুক্তির দূত। চর্যাপদ সেই দিক দিয়ে একটি অমূল্য সৃষ্টি ॥
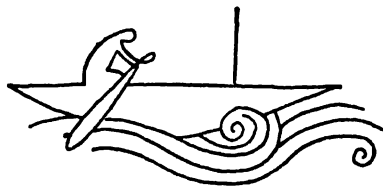
॥ চর্যাপদের ভাষাগত বিশেষত্ব ॥

চর্যাপদের গানগুলি যখন আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হাতে আসে, তিনি তার ভাষা দেখে নিশ্চিত ছিলেন যে, চর্যাপদের ভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জন্যেই চর্যাপদের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বিনা দ্বিধায় বলেছেন, চর্যাপদের কবিতাগুলি 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' ও 'বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অতি পুরাণ গান।' তিনি এগুলিকে বাংলা গান বলার সময় ভাষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার করেন নি, করবার কথাও নয়, কারণ প্রচলিত অর্থে ভাষাবিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না। তবে শাস্ত্রী মশাই কি বিনা কারণেই একমাত্র সহজ বুদ্ধির বশেই চর্যাগীতির ভাষাকে বাংলা বলেছিলেন? তিনি সুস্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন, বাংলা ভাষার যে-সমস্ত শব্দ বাগ্‌ভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গী তার নিজের বিশেষত্ব, এবং সেই জন্যেই বাংলাভাষার spirit-এর সমধর্মী—সেই সমস্ত শব্দের বাগ্‌ভঙ্গী এবং প্রকাশপদ্ধতি চর্যাপদে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত ॥

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী কেবল vocables বা শব্দতত্ত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, বা একমাত্র vocables-এর উপর নির্ভর করেই কোনো ভাষার অনুশীলন বা জাতিনির্ণয় সম্ভব কিংবা সঠিক হতে পারে এইরকম বিশ্বাস করেন না। কোনো ভাষার অনুশীলন করতে গেলে তার স্বরবিজ্ঞান বা phonology এবং পদগঠনরীতি বা morphology শব্দতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য সুনীতিকুমার তাই তাঁর Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা বাংলা কি-না সেই সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ॥

কিন্তু একদিক দিয়ে আবার এই আলোচনা কোনো কোনো ভাষাভাষীকে ভুল বুঝতে সুযোগ দিয়েছে। চর্যাপদের কোনো কোনো শব্দ ও পদ বাংলা বা সেই সময়কার বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেগুলি পরে আর বাংলাতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। সুনীতিকুমার বলেছেন, সেগুলি শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবজাত এবং দুটি ক্রিয়াপদ 'ভণথি' 'বোলথি' মৈথিলীভাষা থেকে চযাপদে এসেছে। এই সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে এখন পূর্বভারতের চারটি প্রধান ভাষাভাষী চর্যাপদকে

নিজেদের ভাষার প্রাচীনতম রূপ বলতে চাইছেন। এই চারটি ভাষাভাষী হলেন হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া এবং অসমীয়া। এ ছাড়া চর্যাপদের উপর বাংলা ভাষার দাবী তো আছেই। এই চারটি ভাষাভাষীর দাবীর প্রধান যুক্তি কী? তাঁরা বলছেন, বহু 'হিন্দী' শব্দ চর্যাপদে ব্যবহৃত—তেমনি প্রযুক্ত মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমীয়া। সুতরাং বাংলাশব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে বলেই চর্যাপদকে যদি বাংলা বলি, তবে তাকে হিন্দী বা ওড়িয়া, মৈথিলী কিংবা অসমীয়া বলব না কেন? এদের-মধ্যে অসমীয়ার দাবী আমরা বাদ দিতে পারি না, কারণ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা এবং অসমীয়া এক রকমই প্রায় ছিল। সুতরাং আধুনিক অসমীয়ারা যদি বলেন, চর্যাপদ আমাদের ভাষায় লেখা, তবে আপত্তি করা চলে না। কিন্তু হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া? তাঁদের দাবী কতদূর যুক্তিসংগত?—সেইটাই আমরা একবার আলোচনা করে দেখব॥

কোনো কোনো শব্দ একই সূত্র থেকে বাংলা ও হিন্দীতে এসেছে। যেমন 'পানি' (জল)। কথাটির মূল,—সংস্কৃত 'পানীয়', পানের যোগ্য। সংস্কৃত মত অনুযায়ী শরবতও পানীয়, জলও পানীয়, দুগ্ধও পানীয়। কিন্তু হিন্দীতে বাংলায় কথাটি যোগরূঢ়ার্থে কেবল মাত্র জল হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। চর্যাপদে আছে "তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী" (চর্যা ৬)। এখন শুধু মাত্র পানি শব্দটি দেখেই যদি কেউ বলেন, এই পঙ্‌ক্তিটি হিন্দী, তবে তাঁর যুক্তির অসারতা সহজেই বোঝা যায়। আসলে নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার প্রথম স্তরে সমস্ত ভাষার মধ্যেই মোটামুটি একটা মিল ছিল। কারণ, নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার জননী প্রাকৃত আর লৌকিক রূপে পরিবর্তিত বৈদিকই (এর মধ্যে সংস্কৃতও আছে) প্রাকৃতভাষা॥

মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার ক্রমপরিণতির শেষ স্তরটির নাম অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষার সরলতর সহজতর লৌকিক রূপটি আমরা পাই অপভ্রংশে। খ্রীষ্টীয় আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যেই এই স্তরটি একটি সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করে। পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন বলেন, মধ্যস্তরের প্রাকৃতের শেষ অবস্থাটিই অপভ্রংশ। অপভ্রংশ কোনোদিনই সমাজের উচ্চস্তরে লোকের মুখের বা জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক সাহিত্যের বাহন হিসাবে গৃহীত হয় নি। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে, যেটাকে আমরা বলি আর্যেতর substratum, সেখানে সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষা এবং লোক-সাহিত্যের প্রধান বাহক হিসাবে অপভ্রংশের একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল॥

এই অপভ্রংশ আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কালগত ও স্থানগত রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্তর্গত বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া,

পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে। অপভ্রংশের পরের এবং আধুনিক বা নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার ঠিক আগের স্তরটির নাম অবহট্‌ঠ॥

আনুমানিক ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার অন্যতম প্রধান ভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাঙলাদেশে সংস্কৃত, শৌরসেনী এবং প্রাকৃত তিন ধরনের সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হোত। জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনায় শিক্ষিত মার্জিতরুচি খ্যাতিলোলুপ বাঙালী ব্যবহার করতেন সংস্কৃত। কোনো কোনো সময়ে প্রাকৃতে রচিত এই ধরনের গ্রন্থকেও তাঁরা সংস্কৃত করে নিতেন। প্রাকৃত-মিশ্রিত সংস্কৃত বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের ধর্ম-দর্শন আলোচনা করতেন, আর সমাজের নিম্নস্তরের লৌকিক-সাহিত্য রচনায় লোককবিরা ব্যবহার করতেন অপভ্রংশ। বাঙলাদেশে মাগধী, শৌরসেনী, দুটো প্রাকৃত থেকে জাত অপভ্রংশেই কাব্য রচনা হোত, আবার দুটোতে খুব একটা পার্থক্যও ছিল না। বহুজন-ব্যবহৃত এই অপভ্রংশ দুটির প্রভাব লৌকিক জনসমাজে ছিল ব্যাপক ও গভীর। শৌরসেনী প্রাকৃতের অপভ্রংশ শুধু বাঙলাদেশে নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতেই ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও ব্যবহৃত হোত। সেই কারণেই বাঙলাদেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ-কবিদেরও কেউ কেউ অপভ্রংশে কাব্য রচনা করেছেন। কাহ্নপাদ সরহপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য শৌরসেনী প্রাকৃতের অপভ্রংশেই তাঁদের দোহাগুলি রচনা করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁর 'কীর্তিলতা' কাব্যটি রচনা করেন শৌরসেনী অপভ্রংশে। এমন কি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-ও যে মূলে শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল এমন কথাও কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন। সেটা সত্য হোক বা না-হোক, কবি জয়দেব-যে অপভ্রংশে গীতি-কবিতা রচনা করতেন তার প্রমাণ আছে। গুর্জরী ও মারুরাগে গেয় জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থ থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার॥

শৌরসেনী অপভ্রংশ বা ডঃ সুকুমার সেনের মতে যা অবহট্‌ঠ স্তরের ভাষা—তা, তা হলে দেখা যাচ্ছে সমগ্র উত্তরভারতে সংস্কৃতের পরেই 'সাধুভাষা'র মর্যাদা পেত। সুতরাং সমগ্র উত্তরভারতে আনুমানিক খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে যত কাব্য বিভিন্ন প্রদেশে রচিত হয়েছে তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের কিছু কিছু শব্দ আসা স্বাভাবিক—না এলেই বরং তাঁদের অকৃত্রিমতা নিয়ে সন্দেহ হতে পারে। এই শব্দগুলি হিন্দীভাষী, ওড়িয়াভাষী, মৈথিলীভাষী—সবাই ব্যবহার করতেন, বাঙালীরা তো বটেই। ঠিক এই কারণেই চর্যাপদের ভাষাগত মালিকানা নিয়ে বিরোধ বেধেছে॥

কিন্তু আগেই বলেছি, শুধু vocables-এর সাহায্যেই একটা ভাষার জাতি নির্ণয় সম্ভব নয়। বিষয়পরিবেশ, পদ, ইডিয়ম, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক-বিভক্তি সমস্ত বিচার করে সিদ্ধান্ত করতে হবে চর্যাপদের ভাষা বাংলা না হিন্দী, ওড়িয়া না মৈথিলী। এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখা গেছে, চর্যাপদের বিষয়-পরিবেশ বাঙলার, যার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে 'চর্যাপদে লৌকিক জগৎ' অধ্যায়ে; তার ব্যাকরণগত বিশেষত্বও আধুনিক বাংলার পূর্বগামী, যা পরবর্তী স্তরের পরিণত বাংলার মধ্যে মুক্তি পেয়েছে ॥

সেই বিশেষত্বগুলিই এখন আলোচনা করা হবে ॥

চর্যাপদের ভাষায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলার মতোই। তবে যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের বানানে অনেক গরমিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সবর, শবর; পানি, পাণী; উন্মত্তো, পুন্ন, সন্তোপেঁ (সন্তোপে) ইত্যাদি। এই অসংগতি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন:

> "—তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের বানানে কখনই সংগতি ছিল না, তাহার উপরে নেপালে লেখা পুথি, সুতরাং লিপিকর প্রমাদ তো বানানকে জটিলতর করিয়া তুলিবেই। তাহাই হইয়াছে এবং তৎসম শব্দও বাদ যায় নাই। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহারে গোলমাল আছে আর আছে তিন স-কারের ও দুই ন-কারের ব্যবহারে। অ-কার, ই-কার, এ-কারের মধ্যে বিপর্যয়ও কম নাই। বিশেষ লক্ষণীয় হইতেছে পদান্ত ই-কার স্থলে য়-কার বা অ-কার।"

এই সিদ্ধান্তের উদাহরণ চর্যাপদ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি ॥

হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরে উচ্চারণের পার্থক্য আধুনিক বাংলাতে নেই, প্রাচীন বাংলাতেও ছিল না; কাগজে কলমে 'পাত্রী' লিখলেও উচ্চারণে 'রাত্রি'র সঙ্গে কোনো পার্থক্য করা হয় না। চর্যাপদে এই ধরনের উদাহরণ অনেক আছে, যেমন, চুম্বী চ্ছাড়ী চ্ছিনালী উজূ (সংস্কৃত ঋজু থেকে), বিআতী বহুড়ী ডোম্বী। আবার শবরি (ডোম্বি গাতি) ইত্যাদি হ্রস্ব-ইকারান্ত বানানও আছে। 'শ' 'ষ' 'স'—তিনটিই ব্যবহৃত হয়েছে চর্যাপদের ভাষায়, যেমন করগুকশালা, অহনিসি (দুটোই চর্যা ১৯ থেকে); শবর ষবরালী (চর্যা ৫০)। মণ এবং মন দুটোই দেখতে পাচ্ছি (চর্যা ২০ এবং চর্যা ৩০)। পদান্তে ই-কারের অ-কারে পরিবর্তনের উদাহরণ—দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ ॥ (চর্যা ২)। এখানে খাঅ এসেছে এই-ভাবে—খাদিতম্>খাইঅ> খাঅ। সম উদহরণ জাগঅ, মাগঅ, জাঅ ইত্যাদি ॥

চর্যাপদে একবচনে কর্তৃ, কর্ম, করণ ও অধিকরণ কারকে কোনো বিভক্তি ব্যবহৃত হোত না, আজও হয় না। যেমন, **সসুরা** নিদ্ গেল **বহুড়ী জাগঅ** (**সসুরা, বহুড়ী** একবচন কর্তৃকারক, বিভক্তি নেই)। তেমনি কর্মকারকে একবচনে বিভক্তিহীন— রূপা থোই নাহিক ঠাবী। করণে—বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ **পানী** (এখানে অর্থ জলের দ্বারা) কিন্তু বিভক্তি নেই। আধুনিক বাংলায় যেমন 'ছেলেরা ফুটবল খেলে।' অধিকরণকারকে—বেঢ়িল হাক পড়অ **চৌদীস** (চৌদিকে)। তুলনীয় আধুনিক বাংলায়, সকালবেলা এস। বহুবচন বোঝানোর জন্য বহুত্ববোধক শব্দ চর্যাপদের বাংলায় ব্যবহৃত হোত, যেমন 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই', 'তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ-মণ্ডল সঅল ভাজই।' এখানে সঅল অর্থ সকল। সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়েও বহুবচন বোঝানো আছে—কায়া তরুবর পঞ্চ-বি ডাল ; বেড়ল চৌদিস ; তিনা সাঁঝে ; চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী (চৌষট্টি পাপড়ি)। দুবার পর পর বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করে বহুবচন বোঝানোর নিদর্শনও চর্যাপদে আছে, যেমন, 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী'। সংস্কৃতের অনুসরণে বহুবচনে বিভক্তি ব্যবহারের উদাহরণও আছে ; যেমন, জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি **পঞ্চজণা** (চর্যা ২৩)। তবে আধুনিক বাংলার রা, এরা প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার চর্যাপদে বিশেষ নেই ॥

চর্যাপদে ব্যবহৃত বাংলাভাষায় পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহারের নিয়ম অপভ্রংশের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। তবে ক্লীবলিঙ্গ নেই। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিশেষণটিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে ; যেমন 'নিশি অন্ধারী মুষার চারা'। 'ইল' প্রত্যায়ান্ত কিংবা 'এর' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিয়েছে ; যেমন 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী', 'সুজ লাউ সসী লাগেলি তান্তী', 'গাণা তরুবর মউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী', 'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ', 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী'। ঈ (ই) বা আ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ ;—হরিণী, শবরী, হরিণা, কঠিণা। নি (নী) যোগ করে—শুণ্ডিনি ॥

চর্যাগীতির মধ্যে ব্যবহৃত ভাষার শব্দরূপের গঠনে একবচন এবং বহুবচনের তফাত নেই। সম্বন্ধ বোঝানো ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গেরও তফাত নেই। উদাহরণ (বিশেষ্য পদের) :—

কর্তৃকারক : কাআ, বীরা, বহুড়ী, ভবণই, সসুরা ॥

অনুক্ত কর্তা : চোরে (নিল), কুম্ভীরে (খাঅ) ॥

কর্ম : বাখড়, বান্ধন, অপণা, ডোম্বী ॥

করণ : সুখদুখেতেঁ, কুঠারেঁ, জোইনিজালে, সমাহিঅ,
আলিএঁ কালিএঁ, বেগেঁ, দিআঁ চঞ্চালী ॥

গৌণ কর্ম : গঅবরেঁ, বাহবকে, মকুঁ গঠা, করিণিরেঁ, ধামার্থে, ঠাকুরক ॥

অপাদান : খেপহুঁ, জামে (জন্ম থেকে), কামে (কর্ম থেকে) দশ দিসেঁ (দশ দিক থেকে) ॥

সম্বন্ধপদ : জাহের, ডোম্বীএর, হরিণার, ছান্দক, অপণা, হাড়েরি, খণহ ॥

অধিকরণ : মাঝেঁ, চরণে, নিঅড়ি (নিকটে), ঘরে, দিবসই, খণহি, বাটত, গঅণ মাঝেঁ ॥

সর্বনাম শব্দের শব্দরূপের উদাহরণ :—

কর্তা : হঁউ, হাঁউ, অম্ভে, আম্হে ; তু, তঁই, তো ; সে, তে, সো, জো ; অইসনি, কইসনি, জইসেঁণ—ইত্যাদি ॥

অনুক্ত কর্তা : আম্হে, মই, তঁই, মোএ ইত্যাদি ॥

কর্ম : মো, তো, জা, তুম্হে, তুম্হে, তোহোরে ॥

করণ : মই, তোএ, তঁই, জেঁ, জেঁণ ইত্যাদি ॥

গৌণকর্ম : মকুঁ, তোরেঁ, তোহোর ইত্যাদি ॥

অপাদান : জথা, তথা ।

সম্বন্ধ : মোহোর, মোর, তোহোর, তোহারেঁ, তোরা, তো, তা, তসু, তাহের ॥

অধিকরণ : এথু, কহিঁ, তহিঁ ইত্যাদি ॥

ক্রিয়াপদের ধাতুরূপের উদাহরণ :

॥ বর্তমান কাল ॥

উত্তমপুরুষ : পেখমি, জাণমি, চাহমি, পুছমি ; করহু, জাণহু, লেহুঁ ইত্যাদি ॥

মধ্যমপুরুষ : আইসসি (অইসসি), পুছসি, যাইসি, জাণহ, ভুলহ, বিন্ধহ ইত্যাদি ॥

প্রথমপুরুষ : পেখই, ভণই, বাহই, জাগই, বসই, যামায়, হোই, তুট, চাহন্তি, কহন্তি, ভণন্তি ; ভণথি বোলথি ইত্যাদি ॥

॥ অতীত কাল ॥

উত্তমপুরুষ : দেখিল, ফিটলেসু, ভইলি (হইল) ইত্যাদি ॥

মধ্যমপুরুষ : অছিলেস (চর্যা ৩৭), নিলেসি (চর্যা ৩৯)

প্রথমপুরুষ : গেলা, ভইল, রুন্ধেলা, জিতেল ; ভরিলী, লাগেলী, পোহাইলী, ভাইলা, পড়িলা ইত্যাদি ॥

॥ ভবিষ্যৎকাল ॥

উত্তমপুরুষ : করিব (নিবাস), মারমি ডোম্বী, লেমি পরাণ ইত্যাদি ॥

মধ্যমপুরুষ : যাইবে (চর্যা ৩৭), হোহিসি, মারিহসি ইত্যাদি ॥

প্রথম পুরুষ : কহিহ, করিহ ইত্যাদি ॥

॥ অনুজ্ঞা ॥

মধ্যমপুরুষ : বাহঅ, বাহতু, বিন্ধহ, লেই, হোহী,
পেখ, কর, সিঞ্চহ ইত্যাদি ॥

প্রথমপুরুষ : করউ, এড়িএউ, জাইউ ইত্যাদি ॥

॥ অসমাপিকা ক্রিয়া ॥

রচি, ধুনি (ধুনিয়া), ফাড়িঅ (ফাড়িয়া), মারিআ,
বুঝিআ, পুচ্ছি, চড়ি (চড়িয়া), চাপী (চাপিয়া),
থোই (থুইয়া), বাহনকে, জান্তে, শুনন্তে, অচ্ছন্তে ;
ভইলে, চড়িলে, মইলেঁ ইত্যাদি ॥

॥ সংখ্যাবাচক শব্দ ॥

এক, একু , দুই, দো, তিনি, চউ, পঞ্চ (পাঞ্চ), দশ,
চৌষঠঠী ইত্যাদি ॥

॥ বাগধারা ও শব্দগুচ্ছ ॥

সড়ি পড়িআঁ, উঠি গেল, নিদ গেল, অহার কএলা,
পার করেই, গুণিঅঁ লেহুঁ, ধরণ ন জাই (জাঅ),
কহন ন জাই ইত্যাদি ॥
'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী', 'বর সুণ গোহালী
কিমো দুটঠ বলন্দেঁ', 'দিবসে বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ,
রাতি ভইলে কামরু জাঅ', 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' ইত্যাদি ॥

॥ সমাস ॥

সমস্ত রকমের সমাসের দৃষ্টান্তই চর্যাপদে পাওয়া যায। উদাহরণ—

তৎপুরুষ : কমলরস, আসবমাতা, কান্ধবিয়োএ
(স্কন্ধবিয়োগে, চর্যা ৪২) ইত্যাদি ॥

কর্মধারয় : ভাঙ্গতরঙ্গ, মহাতরু, মহাসুখ ইত্যাদি ॥

বহুব্রীহি : খমণভতারি, অলকখলকখণ-চিত্তা ইত্যাদি ॥

রূপক কর্মধারয় : ভবণই, ভবজলধি, মোহতরু ইত্যাদি ॥

উপমিত কর্মধারয় : কায়াতরুবর, সুজলাউ ॥

দ্বন্দ্বসমাস : জামমরণ (জন্মমৃত্যু), চান্দসূজ, সুখদুখ ॥

॥ চর্যাপদের অনুবৃত্তি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি আশ্চর্য বাণীতে বলা হয়েছে—যে-মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।*

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে ; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বাণীর তাৎপর্য : যে-দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিই।

তবে মানুষ কি নিজেরই পূজো করবে? নিজেকে ভক্তি করার ক্ষমতা কি মানুষের দ্বারা সম্ভব—তা করলে কি পূজো জিনিসটা অহংকার হয়ে যায় না?

উপনিষদ বলছেন পূজো জিনিসটা অহংকার নয়। বাইরে দেবতাকে রেখে কতকগুলি স্তব পূজার আড়ম্বর, শাস্ত্রপাঠ, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এ সমস্ত পালন করা সহজ, কিন্তু নিজের মনের মধ্যে নিজের ভাবনায়, নিজের চিন্তায়, নিজের কর্মে পরম মানুষকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন। এইজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে, যারা সত্যকে অন্তরে পায় না তারা দুর্বল—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। উপনিষদ আরো বলছেন :

> য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকহ-
> বিজিঘৎ সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ
> সোহন্বেষ্টব্য স বিজিজ্ঞাসিতবঃ।

—আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে॥

কবি এই শ্লোকে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন যার মধ্যে সকল কালের সারবস্তু

অর্থ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
অন্যোহসৌ অন্যোহহম অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম॥

ঘনীভূত। বাহ্যজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের জানার মধ্যে একটা সীমা এবং গণ্ডী আছে। মনের মানুষকে জানা তেমন করে জানা নয়, সে-জানা হচ্ছে অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। 'নদী সমুদ্রকে পায় যেমন করে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। একদিকে সে ছোট নদী আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেন-না সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সে ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে রেখেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের গাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে। সেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায়, আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে, নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে।······মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে-জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেইজন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা-আমির কর্মই বন্ধন, সকল-আমির কর্ম মুক্তি।'*

চর্যাপদের মধ্যেও এই নিজের মধ্যে পরমকে জানার ব্যাকুলতা। নিজের মধ্যে যে-মানুষ সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। তিনিই 'দেহহি বসন্ত বুদ্ধ।' তিনিই মনের মানুষ। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা বাইরের জপ তপ ধ্যান স্নান আচমন বলিদানকে বর্জন করে সহজ-সাধনার মধ্যে দিয়েই সেই পরমপ্রিয়কে খুঁজেছেন নিজের মনে। এইভাবেই উপনিষদের সাধনা চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় মানবধর্মের সুপ্রাচীন সুমহৎ ঐতিহ্যটিকে প্রবহমান রেখেছে॥

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক যাঁরা—খ্রীস্ট এবং বুদ্ধ তাঁদেরও সেই একই বাণী। খ্রীস্ট বলছেন, I and my father are one। খ্রীস্ট যেদিন আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে আপন অভেদ দেখেছিলেন সেইদিনই তাঁর প্রীতি এবং কল্যাণবুদ্ধি সকল মানবের প্রতি সমান প্রসারিত হল। বুদ্ধের বাণীতেও সেই মানবের প্রতি স্বীকৃতি এবং ভালোবাসা। 'সমস্ত জগতের মানুষের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে, দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে বা নির্বাণপ্রাপ্ত না হবে ততদিন এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে।' সেই নিখিল মানবের জন্যেই ভগবান তথাগতের প্রার্থনা :

* রবীন্দ্রনাথ॥ মানুষের ধর্ম॥ তৃতীয় অধ্যায়।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্খাপমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

—সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক॥

নিজের মধ্যে বিশ্বকে জানলে তবেই সর্বমানবকে জানা যাবে। এই দেহভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড আছে—এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন উপনিষদ। প্রভু খ্রীস্ট আরেক-যুগে সেই বাণীকেই বলেছেন আরেক ভাবে—আমি এবং পরমপিতা এক ও অভিন্ন। বুদ্ধের বাণীতেও সেই একই কথা—মানুষের সমস্ত বৈচিত্র্যের একটি বিন্দুতে সংহতি হলে, নিশ্চল হলে সে হয় তো একটা আত্মভোলা আনন্দ পাবে। কিন্তু কী হবে সেই একার আনন্দে, সে আনন্দ চরমও নয়, শ্রেয়ও নয়। সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, আছে অভাব, আছে অপমান—ততক্ষণ কোনো একটি মাত্র মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। 'ভগবান তথাগত আপনার মুক্তিতেই যদি সত্যি সত্যি মুক্ত হতেন, তবে মানুষের জন্য এত ত্যাগ করতেন না। তাঁর সমস্ত কর্ম সমস্ত মানুষকে নিয়ে। তিনি মহাত্মা, তাই বিশ্বকর্মা'॥

হাজার বছর আগে উপনিষদের যে-ধর্মসাধনাকে ভিত্তি করে চর্যাগীতির উদ্ভব, পরবর্তীকালের ইতিহাসের দুর্গম মরুপথে সাময়িকভাবে সেই ধর্মসাধনার ধারাটি ক্ষীণ এবং ক্রমে ক্রমে বাইরের দিক থেকে লুপ্ত হয়ে গেলেও, অন্তঃসলিলা নদীর মতো তার ভিতরের স্রোতটি অক্ষুণ্ণ রইল অন্যরূপে। সেই ধারার আদিতে উপনিষদের গোমুখী, অন্তে মানবপ্রেমের মরমিয়া মহাসাগর। চর্যাপদে বিধৃত ধর্মমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তকে অনুসরণ করে দেখবার চেষ্টা করেছি, ধর্মের মৌল মনোময়-তার প্রতি যে-আবেগ উপনিষদে উচ্ছ্বসিত, তারই এক অঞ্জলি ধরা আছে চর্যাপদে। সেখানেও সেই উপনিষদ-প্রদর্শিত দার্শনিকতার মূলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এমন একটা দৃষ্টি যা নিছক শুষ্কতার মধ্যেই নিঃশেষিত নয়—সেই দৃষ্টিতে আছে ত্যাগ করে ভোগ করার আশ্চর্য কবিত্বময় উপলব্ধি, দীনতা হীনতা যন্ত্রণা বেদনা আনন্দ ও উপভোগের আলো অন্ধকারে মণ্ডিত জীবনের সমগ্রতাকে, তার স্বরূপ ও মাধুর্যকে উপলব্ধি করার দুর্বার স্পৃহা। জীবন অনুভবের এই আনন্দ ও যন্ত্রণাকে তাঁরা শুকনো সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে দেখেন নি—'রসে বশে' থেকেই তাঁরা এই বেদনা ও সুখকে হৃদয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। এই সাধনায় আচার অনুষ্ঠান মন্ত্র তন্ত্র জপ ধ্যান স্নান আচমন প্রভৃতি বাইরের অঙ্গগুলি খুব একটা গুরুত্ব পায় নি—ব্রাহ্মণ্য আচার-পরায়ণতার প্রতি দৃঢ় অথচ কৌতুকমিশ্রিত অনুকম্পায় তাঁদের প্রতিবাদী মন মুখর

হয়েছে 'সহজ-সাধনা'র উন্মুক্ত ক্ষেত্রে। এই সহজ-সাধনার প্রধান উপকরণ মানব মানবী, তাদের আনন্দ, বেদনা, বিষণ্ণতা, উল্লাস, শ্রদ্ধা ও প্রীতি। ব্রাহ্মণ্য আচার-পরায়ণতায় এই মানুষ ছিল অবজ্ঞাত, ব্রাহ্মণের সৃষ্ট এক গণ্ডীবদ্ধ নিষ্ঠুর জগতের অপমানের লোকালয়ে এই মানুষ ছিল অবজ্ঞার সজ্জাহীন কুটিরে প্রীতি-প্রেমের আলোকস্পর্শহীন অন্ধকারে কুণ্ঠিত। চর্যাপদের বাঙালী কবিরা সেই অবজ্ঞার শুষ্ক মরুভূমিতে দিক্‌ভ্রান্ত মানবতাকে নিয়ে এলেন আশ্চর্য প্রেম বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার শ্যামাশ্রীমণ্ডিত মরূদ্যানে। বাঙালী হৃদয়ের মানবপ্রেম বিশ্বদেবতার প্রেমে মহীয়ান হল এই একটি দৃঢ় প্রত্যয়ে—দেহহি বুদ্ধ বসন্তি ন জানই।' মানুষের মধ্যেই অনন্তের মুক্তি, মানুষের মধ্যেই পরম শান্তি, মানবাত্মাতেই বিশ্বাত্মার মহৎ বিকাশ॥

আধ্যাত্মিক মানবপ্রেমের মহান্ সাহিত্যিক অভিব্যক্তির সশ্রদ্ধ প্রকাশ বাংলা কাব্যে চর্যাপদেই প্রথম এবং প্রধান। সেই মানবপ্রেমই পরবর্তীকালের কাব্যে চর্যাপদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে, আউল-বাউল সহজিয়া-দের গানে, এবং তাদের মধ্যে দিয়ে এই আশীর্বাদটি এসেছে আধুনিকতম যুগের বাঙালী কবির রচনায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেবতার মহিমা প্রচারের জন্যেই তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু সেখানেও মানুষ উপেক্ষিত নয়। মনসামঙ্গল কাব্যকেই এর প্রমাণ হিসাবে নিতে পারা যায়। মানব-চরিত্রের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি এবং মমতাই এই কবিদের কবিতার প্রধান আকর্ষণ। অপার্থিব দেব-চরিত্র মনসাকে এঁরা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা শুরু করেন, কিন্তু সেখানে কবির সুগভীর মানবপ্রেম বারবার দেবী মনসার নির্মমতাকে নির্ভয়ে অনাবৃত করে দিয়ে বলেছে 'পাপিষ্ঠা মনসা পাষাণ তার হিয়া', কিন্তু মানুষের প্রতি এই কবিদের সহানুভূতির সীমা নেই। মুমূর্ষু লখিন্দরের আক্ষেপ, মাতা সনকার মানবিক স্নেহ-পরায়ণতা, দুর্দম পৌরুষের ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান্ চাঁদ সদাগর, বেহুলার কোমল নারীত্বের মহিমা—এই সমস্তই দেবতাকে ছাপিয়ে মনসামঙ্গলে প্রধান হয়ে উঠেছে। এঁরা দেবতারই মাহাত্ম্য প্রচার করেন নি সেই সঙ্গে মানুষেরও মঙ্গলগান গেয়েছেন—তাই তাঁদের কাব্যে শেষ পর্যন্ত দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় নি, মানুষেরই বিজয় ঘোষিত হয়েছে।

মধ্যযুগের অন্যতম বিশিষ্ট কাব্যসম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই মানবপ্রেমের সুমধুর জয়গান। বৈষ্ণব কাব্যকে আধ্যাত্মিক অর্থে বিচার না করলে দেখা যাবে, সেখানে একটা মানবিক সংবেদনাই রূপে রসে উজ্জ্বল। আর এই মানবিক সংবেদনার উপরেই বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বৈষ্ণব পদা-বলীর মৌলিক আবেদন নিহিত আছে বৃষভানুনন্দিনী এবং কৃষ্ণের, নারী এবং পুরুষের রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে। এই সম্পর্কের মধ্যেই লীলায়িত মান মিলন বিরহ

আক্ষেপ প্রার্থনা ও নিবেদন—আর এর গোপনতম গভীরে আছে নরনারীর আদিমতম প্রবৃত্তি—যৌন-আকর্ষণ। 'এই নিতান্ত জৈবিক আকর্ষণকে অবলম্বন করেই যুগ যুগ ধরে নারীপুরুষের পরস্পর-বিলম্বী ভাব-সৌন্দর্য গড়ে উঠেছে। জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি—প্রাক্‌চৈতন্য যুগের লীলারসচারণ কবিরা সকলেই এই ভাবসৌন্দর্যের সাধক ছিলেন।' এই আধ্যাত্মিক ভাবচেতনা এসেছে সুগভীর মানবপ্রেম থেকেই। সুমহান ভালোবাসাই সেখানে পূজার পবিত্র স্তরে উন্নীত। বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্য-রসে মুগ্ধ সাধারণ মানুষের তাই বারবার মনে হয়, এই পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন, এই শ্রাবণ-শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে শরম ও সম্ভ্রমমিশ্রিত চার চোখের মিলন—সে কি শুধু দেবতার ? তার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই মানবিকতার আস্বাদ গ্রহণ করি, যে-আস্বাদে আমাদের পরিচিত পৃথিবী দ্বিগুণ মধুময় হয়ে উঠে, কুটিরপ্রান্তের কদম্বছায়ায় মৌনভালোবাসা বুকে নিয়ে মুখে পূর্ণ প্রেমজ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে যে-ধরার সঙ্গিনী রয়েছে তাকে আরো রহস্যময় মনে হয়, —রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা তার চোখে, তার নারীহৃদয়-সঞ্চিত অকথিত ভাষা গানের মতো সুরময়। সেই অখণ্ড মানবিকতার সাগরসংগম থেকে আমরা হৃদয়ের কলস ভরে নিই। এই দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতা করার সুমহান সাধনার ভাবরূপ রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে, আর সেইজন্যেই বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের এত প্রিয় ॥

চর্যাগীতিগুলির মধ্যে দিয়ে যে-মানবতাবোধের উদ্বোধন বাংলাকাব্যে তার ধারা শুধু মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীতেই সমাপ্ত নয়—তা বিবর্তিত হয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণব, নাথ সম্প্রদায়, আউল বাউল ইত্যাদির সাধনার মধ্যে। বাউলদের সাধনায় যে-কথাটি সবচেয়ে বড় তাও মানবপ্রেম। এই প্রেম কোনো বাইরের বস্তুকে আশ্রয় করেই শুধু ব্যক্ত নয়—এই প্রেমের আরেক আধার তাদের 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষ আছে দেহেরই মধ্যে অর্থাৎ এই জগৎ এবং জগতের মানুষের মধ্যেই। সেই পরমপ্রিয়কে খোঁজবার জন্যেই তাদের আকুলতা, মানুষের হৃদয়ের দরজায় দরজায় তাদের আঘাত :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে
(আমি) কী উদ্দেশ্যে বেড়াই ঘুরে।

সেই মানুষের মনের সঙ্গে মন মিশালে তবেই পরমমুক্তি ধরা দেবে। সেই মুক্তি-

সাধনার পথে মন্দির মসজিদের বেড়া, শুষ্ক আচারপরায়ণতা তার মস্ত বাধা ; তাই বাউল কেঁদে বলে—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে
তোমার ডাক শুনি তাই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥

সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলছেন,

কিস্তো মন্তে কিস্তো তন্তে কিস্তোরে ঝাণবখানে।

সেই কথাই বাউল বলছেন অন্য সুরে,

মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে কি সে ধরা।
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা ॥

সিদ্ধাচার্য বলছেন, দেহহি বুদ্ধ বসন্তি ন জানই। বাউলও বলছেন :

নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন
তোমার ঘরের মাঝে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন ॥
যদুনাথ বাউল বলে শুন শুন সাধুজন।
কেন আত্মতীর্থ ত্যাজ্য করে মিছে তীর্থ-পর্যটন ॥

চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য যেমন বলেন, মন্ত্র তন্ত্র বেদ পুরাণ তীর্থ তপোবন সবই বৃথা, আসল হচ্ছে ভিতরের মানুষ, তেমনি বাউলও সন্ধান করেন সেই মনের মানুষকে, তার জন্যেই বাউলের আকুল হাহাকার :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে কী উদ্দেশ্যে
(আমি) দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

বাউলের সাধনায় যে বলা হচ্ছে, মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ—সেখানেও সেই উপনিষদের বাণীই সরলতর সহজতর রূপ নিয়ে মানবতার সাগর-সংগমে স্নান করছে। মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম, যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে-স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি কর্ম অন্তহীন দেশে সীমাহীন কালে নিরন্তর প্রকাশমান—বাউল তাকেই খুঁজছে মানুষের মধ্যে, নিজের মনে। সেইজন্যেই বাউল নিঃসংকোচে বলেন—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কি দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার ॥

বাউলদের জীবনদেবতা আছেন তাঁদেরই জীবনে এবং তাঁরই বাণী আমাদের অন্তরের বাণী। এই আশ্চর্য বোধ মানুষের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কবির সবচেয়ে বড় দান; জীবনের প্রতি পাত্রে জীবনদেবতাকে অনুভব করার সাধনাই তাঁদেরকে একটি সশ্রদ্ধ মানবতার অমৃতধারায় স্নাত পবিত্র করেছে। এই বোধটি কেবল বাঙালী বাউলদের মধ্যেই নয়, সুফী সাধকদের মধ্যেও সুস্পষ্ট। হাদীসের সেই 'মার্ন আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'র সঙ্গে বাউলদের ভাবনার কোনো অমিল নেই। মানুষের মধ্যেই-যে মানুষ-রতন রয়েছে সুফী সাধকরা তাকেই জানতে চান, বুঝতে চান। বাইবেলেও এই কথার প্রতিধ্বনি "Know thyselt and you will know God"। নিজের মধ্যেকার মানুষ-রতনের সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয় হয়েছে সেই তো সত্যিকার মুক্তপুরুষ ॥

ভাবলে ভারি আশ্চর্য লাগে, মধ্যযুগের ভারতীয় লোককবিদের ধ্যানধারণা ও মানবতার প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সমসাময়িক কালের মরমিয়া সাধকদের একটা গভীর ভাবের মিল ছিল। এই সাধকদের ধ্যানধারণা সারা পৃথিবী জুড়েই একটা বিরাট মানবতার ভাব-আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল। কবি জয়দেবের সমকালেরই সুফী সমাজের আদি প্রবর্তক ধূ-ল-নুন মিশরী (মৃত্যু ৮৬০) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর অনুগামী বায়াজিদ্-অল-বিস্তামী (মৃত্যু ৮৭৪), মনসুর হল্লাজ (৮৫৪-৯২২), অল্ গাজালী (১০৫৮-১১১১), ফরীদুদ্দিন শেখ (১২শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে জন্ম), ইবন-অল আরবী (১১৬৫-১২৪০), জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-১২৭৩), সাদী (১১৮৪-১২৯১), হাফিজ (মৃত্যু ১৩৮৯), জামী (জন্ম ১৪১৪), ইবন অল জীলী (১৩৬৫-১৪০৬)—এঁরা সবাই পবিত্র ইসলামের বাঁধাধরা পথ ছেড়ে জীবনের মধ্যেই জীবনদেবতাকে খুঁজেছেন ॥

আরো পশ্চিমে যদি যাই তবে দেখব, কবি জয়দেব এবং চর্যাপদের প্রায় সমসময়ে বুলগেরিয়ায় মরমিয়া-সমাজ পরিণতি লাভ কোরে আস্তে আস্তে হাঙ্গারী, রুমানিয়া, ডালমাটিয়া, আপুলিয়া, লোম্বার্ডি ও জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁরা 'কাথারি' বা পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত হন ফ্রান্সের অলবিতে এবং দশম শতাব্দীতেই সমগ্র ফ্রান্স পার হয়ে রাইনল্যাণ্ড ও ফ্লাণ্ডার্সে ছড়িয়ে পড়েন। এই কাথারি সমাজেরই ভুয়াণ্ড 'পুয়োর ক্যাথলিক' শাখার পত্তন করেন। সেণ্ট ডোমিনিক (১১৭০-১২২১) ও জন্ একহার্ট (১২৬০-১৩২৭) এঁদেরই সাধনার উত্তরসাধক। একহার্টের শিষ্য জন্ ট্যলার (১২৯০-১৩৬১) ও হেনরি সুসো (১৩০০-১৩৬৬) পত্তন করলেন 'ফ্রেণ্ডস

অফ্ গড্' সমাজ। হল্যাণ্ডে 'ব্রিদরেন অফ কমন লাইফ' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন জিরার্ড গ্রুট (১৩৪০-৮৯)। এই সমাজেরই ইগনাসিয়াস লয়োলা থেকে জেস্যুইট-পন্থীর সূচনা। এঁরা সবাই জীবনের বেদীতেই জীবন-দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সারা পৃথিবী জুড়ে এই-যে মানবতার জয়গান চলেছিল তার একটি ধারা বিকশিত হয় ভারতবর্ষে বৈষ্ণব পদাবলীতে, বাউল গানে, সন্ত সাধক কবীর রামানন্দ হরিদাস নানক ইত্যাদির সাধনায়। ভারতের পূর্বপ্রান্তে চর্যাপদে সেই মানবতার উদ্বোধন, ক্রমে তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। চর্যাপদের গানের ভাবভাষা কবীরের দোহায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়াই এটার একটা বড় প্রমাণ॥

আমাদের সাহিত্যে এই মানবতার সাধনা বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গল কাব্যতেই স্তিমিত হয়ে যায় নি—শাক্ত পদাবলীতেও সেই মানবতার লীলা। সেখানেও গৌরী উমা আমাদের ঘরের মেয়ে; মা বলে যেখানে দেবীকে সম্বোধন করা হচ্ছে, সেখানে যে ভক্ত ও ঈশ্বরীর লীলা—তা কোনো অপার্থিব সূত্র থেকে আসে নি, আমাদের লৌকিক বাৎসল্যই তার ভিত্তিভূমি। সেখানে মানবজীবন এবং মানবতাকেই বারবার বন্দনা করা হয়েছে ঈশ্বরবন্দনার ছলে॥

চর্যাপদে যে-মানবতার উদ্বোধন, বাউলদের এবং সহজিয়া সাধকদের মাধ্যমে তা আরো গভীরতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে সমগ্র মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের ভাবনায়। সন্ত কবীর, দাদূ, নানক, রামানন্দ, রজ্জব—সবাই মানুষের মিলনের, প্রাণের মিলনের এবং নিজের মধ্যে অন্তরাতীতকে পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষার বেদনায় বিধুর। সাধু রজ্জব বলছেন, প্রতি বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুর ডাক আছে। তবু একলা যদি একটি বিন্দু সাগরের দিকে ধাবিত হয়, পথেই তো সে নিঃস্ব হয়ে মরবে। সকলের প্রাণের সঙ্গে মিলিত হও, তবেই দেখবে তোমার মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে—

> প্রীত অকেলী ব্যর্থ মহা, সিন্ধ বিরহী দিল হোয়।
> বুংদ পুকারে বুংদকো, গদিমিলে সংযোয়॥
> বুংদ বুংদ সাধন মিল, হরিসাগর জাহিঁ।
> প্রাণ গঙ্গা না পহুঁচা, মুর্দ সঙ্গ সমাহিঁ॥

সকল বসুধাই বেদ, পরিপূর্ণ সমষ্টিই কোরাণ। গুটি কয়েক শুকনো পুথির পাতাকে আস্ত জগৎ মনে করে পণ্ডিত আর মৌলভীরা ব্যর্থ হয়েছেন। তোমার অন্তরই কাগজ। তাতে প্রাণের অক্ষরে সকল সত্য উজ্জ্বল। সকল হৃদয়ের মিলনে যে বিরাট মানব-ব্রহ্মাণ্ড, তাতে পরিপূর্ণ বেদ-কোরাণ ঝল্‌মল্ করছে। বাইরের এই কৃত্রিম বাধা সরিয়ে সেই প্রাণ, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে পাঠ করো। জীবনে জীবনে যে-প্রাণময় বেদ, পড়তে হলে, হে রজ্জব, সেই লিপিই পড়ো—

রজ্জব বসুধা বেদ সব
কুল আলম কুরাণ ॥
পণ্ডিত কাজী ব্যর্থ রৈ
দপ্তর দুনিয়া যান ॥
সৃষ্টি শাস্তর হে সহী
বেত্তার করৈ বখান ॥

তপস্যা ধ্যান যাগযজ্ঞ—এসব শুকনো জিনিসে কী হবে? কী হবে জলে স্নান করে? মুক্তি সেখানে নেই। তা-আছে তোমারই জীবনে, তোমারই জীবনের সুখে দুঃখে, আঘাতে বেদনায়। সেই জীবনের ধ্যান করো মানুষের হৃদয়ের আসনে। মধ্যযুগের সন্ত সাধকরা চর্যাপদের সুরে সুরে এই কথাই বলেছেন সুগভীর জীবনবোধের বিশ্বাসে ॥

বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই মানববন্দনাই মহান কাব্যের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে। ভিতরে বাইরে যে-মানুষ তারই মিলন-ক্ষুধায় তিনি ফিরেছেন সারাজীবন। তাঁর জীবনদেবতা জীবনের বাইরে নয়, জীবনের মধ্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর লীলা। সেই মানুষ অন্তরময়, 'অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়'। তিনি সমগ্র জীবন ধরে যে-সাধনা করেছেন সে-সাধনায় তাঁরই অনুসন্ধান, যিনি আছেন কবির মনে। তাঁর জন্যেই এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়। তাঁকে দেখতে পাবার জন্যেই কবির আকুলতা—

আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে আমায় দেখতে দাও ॥

নিজের মনের মধ্যে যিনি লুকিয়ে আছেন, যিনি কবির সমস্ত ভালোমন্দ তাঁর সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ নিয়ে কবির জীবনকে রচনা করে চলেছেন—তাঁকেই কবি বলেছেন তাঁর জীবনদেবতা। 'তিনি যে কেবল আমার ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করে বিশ্বের সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন, আমি তা মনে করি না। আমি জানি অনাদিকাল থেকে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করেছেন, আবার বিশ্বের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁকে অবলম্বন করে আমার অগোচরে আমার মধ্যে আছে।···নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটি বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই। আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি—এইটাকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি

এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—এইজন্যেই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন পরিব্যাপ্ত করে নেয়।······নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে, যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্যে থেকে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে আমাকে কাল-মহানদীর নতুন নতুন ঘাটে বাটে বহন করে নিয়ে চলেছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বল্লাম।'

রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন তা তাঁর নিজের কথায় আমরা শুনলাম। তিনি এক এবং অখণ্ড, 'তিনি আমার অগোচরে আমার মধ্যে' কবির অন্তরাত্মাকে তিনি নিজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে নেন এবং তিনি প্রাণের পালে প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে কাল-মহানদীর ঘাটে ঘাটে কবিকে বহন করে নিয়ে চলেছেন। তিনি শুষ্ক ভক্তি চান না, সেই পরম প্রিয়, যিনি আছেন কবির হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে, তাঁর অন্তরে গভীর ক্ষুধা—সে ক্ষুধা ভালোবাসার ; তিনি গোপনে চান আলোকসুধা—সে-আলোক প্রেমের। কবির বিরহের রাত্রির বুকে সেই ভালোবাসার আলোকসুধা 'তোমার প্রাতের আপন প্রিয়'। এই জীবনের মধ্যে জীবনাতীতের মিলনে কবিগুরুর সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনা বাঙ্ময়। সেইজন্যেই কবির জীবনদেবতা জীবনের বাইরে নেই। তিনি আছেন কবির দেহের মধ্যেই, তাঁকেই ডেকে কবি বারবার বলছেন—

> তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
> প্রভু আমার জীবনে।
> তোমার পরশ রতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
> প্রভু গভীর গোপনে॥
> দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি,
> অস্তরবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে
> আমার রাতের স্বপনে॥
> আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
> সে-যে তোমার বাঁশরী।
> আমি শুনি তোমার আকাশ পারের তারার রাগিণী
> আমার সকল পাশরি।

কানে আসে আশার বাণী—খোলা পাব দুয়ারখানি
রাতের শেষে শিশির ধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে ॥

কবিগুরু বিশ্বদেবতাকে নিজের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে তিনি তার জন্যেই নিজের অন্তরের যোগ দেখতে পান। অখণ্ড প্রাণ, অখণ্ড জীবন এবং অখণ্ড মানবতাই কবির কাব্যজীবনের প্রাণরস। সৃষ্টির আদিকাল থেকে সেই প্রাণের লীলা প্রবহমান বৃক্ষ, লতা, পাতা, নদী, মানুষ—সমস্তের মধ্যে দিয়ে। কবি তাই আশ্চর্য প্রত্যয়ে বলেন—ঝরণা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়, তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে ॥

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশও এই অখণ্ড প্রাণলীলাকে অনুভব করেছেন নিজের মধ্যে—অবশ্য অন্য ভঙ্গিতে। তিনি আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখেন, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে শ্রাবস্তীর কারুকার্যসমন্বিত যে-মুখ তাঁকে শান্তি দিয়েছিল,—সেই এক নারীই পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে আজকের নাটোরের বনলতা সেন হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। জীবনের সব লেনদেন ফুরালেও 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' এই বনলতা সেনই চিরকালের এক এবং অখণ্ড মানুষ। তাঁর প্রতিই মানুষের চিরআনুগত্য। ক্রোধ, রিরংসা, রক্তক্ষত, দ্বেষ, সন্দেহের ছায়াপাত, শব ব্যবচ্ছেদ—সব মিলে পৃথিবীকে আজ ব্যবহারের গণিকা করে তুললেও সমস্ত অন্ধকার ছাপিয়ে কবির মনে সেই চিরসূর্যের আলোকপ্রত্যয়—

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

সেই অখণ্ড মানবিকতার বোধেই কবি নিঃসংশয়ে বলেন :

মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?

অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নাই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলই গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন।
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে —'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

এই সাহিত্যিক মানবিকতার উদ্বোধন বাংলা কাব্যে প্রথম হয়েছে চর্যাপদে। তার প্রবাহ আজও চলেছে সমস্ত বাঙালী কবির মধ্যে। চর্যাপদ বাংলা কাব্যের প্রধান সুরটি চিনিয়ে দিয়েছে হাজার বছর আগে। সেইজন্যেই চর্যাপদ বাংলা কাব্যের উষালগ্নে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—সেই জ্যোতিষ্কের আলো আজও নিষ্প্রভ হয় নি, বাংলা কাব্যের সীমাহীন আকাশে তার জ্যোতি শান্ত মাধুর্যে মহীয়ান॥
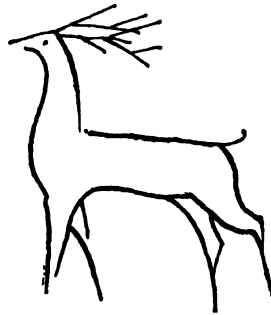
॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ চর্যাপদ ॥

॥ মূল ও পাঠান্তর ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

॥ রূপকার্থ শব্দার্থ ও টীকা ॥

॥ চর্যা ১ ॥

॥ লুইপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ়[১] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সকল সমাহিঅ[২] কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিড়ি[৩] লাহু রে পাস॥
ভণই লুই আম্‌হে সানে[৪] দিঠা।
ধমণ[৫] চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা[৬]॥*

॥ পাঠান্তর ॥

১. দিট। ২. সহিঅ। ৩. ভিতি। ৪. ঝানে। ৫. ধবন: ৬. বইণ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

কায়া তরুর মতো: পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (মৃত্যু) প্রবেশ করেছে। (চিত্ত) দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলছেন, (কীভাবে তা করতে হবে) তা গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। সমস্ত সমাধিতে কী করে; সুখ দুঃখে সে নিশ্চিত মরে (অর্থাৎ সমাধিতে সাময়িকভাবে দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু সমাধি ভাঙলেই আবার সেই পূর্বাবস্থা)। এড়িয়ে যাও ছন্দের (বাসনার) বন্ধন ও করণের (ইন্দ্রিয়ের) পারিপাট্যের আশা (অর্থাৎ, বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির আশা পরিত্যাগ কর), শূন্যপাখা পাশে চেপে ধর (শূন্যতত্ত্ব বিচারের দিকে অগ্রসর হও)। লুই বলেছেন, আমি সংজ্ঞায় (ধ্যানে) দেখেছি। ধমণ (পূরক) চমণ (রেচক) দুই পিঁড়িতে (আমি) উপবিষ্ট॥

---

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৫৬ দ্রষ্টব্য॥

॥ চর্যা ২ ॥

॥ কুক্কুরীপাদ ॥

॥ রাগ গবড়া (গউড়া) ॥

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন[১] ঘরপণ[২] সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি[৩] নিল অধরাতী॥
সসুরা[৪] নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাউই[৫] ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥
অইসনি[৬] চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ।
কোড়ি মঝেঁ একু[৭] হিঅহিঁ সমাইউ[৮]।

॥ পাঠান্তর ॥

১. অঙ্গন। ২ 'ঘরয়ণ' আছে প্রাতালাপতে, বৃত্তি অনুসারে 'ঘর আন'। ৩. চৌরেঁ। ৪. সুসুরা, বৃত্তি অনুসারে 'সসুরা'। ৫. 'মূলে 'কাড়ই', বৃত্তি অনুসারে 'কাউই'। ৬. অইসন। ৭. একুড়ি অহি। ৮. সনাইড় ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

কাছিম দুইয়ে পিটায় (কেঁড়েয়) ধরা যাচ্ছে না। গাছের তেঁতুল সব কুমিরেই খায়। ঘরের মধ্যে আঙিনা, শোন ওগো অবধূতী। অর্ধরাত্রে চোরে (কানের) কানেট নিয়ে গেল। শ্বশুর ঘুমিয়ে গেল, বউ জেগে আছে। কানেট যে চোরে নিল, তা কোথায় গিয়ে সে খুঁজবে (চাইবে)। দিনের বেলায় বউটি কাকের ভয়ে ভীত; রাত্রি হলে সে কামরূপে (কামে প্রীত হতে) যায়। এই রকম চর্যা কুক্কুরীপাদের দ্বারা গাওয়া হল। কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে তা প্রবেশ করল ॥

॥ রূপকার্থ ॥

যারা অনভিজ্ঞ তারা চিত্তকে নির্বাণমার্গে চালিত করতে পারে না, সহজানন্দও উপভোগ করতে পারে না; কিন্তু যে গুরুর উপদেশ পেয়েছে সে কুম্ভক সমাধির সাহায্যে তার চিত্তকে নিঃস্বভাবে নিয়ে যেতে পারে।

দেহরূপ ঘরের মধ্যেই মহাসুখের বা সহজানন্দের আঙিনা, সেখানেই নির্বাণ লাভ করা যায়। সহজানন্দ-রূপ চোর প্রকৃতিদোষ হরণ করে নিয়ে যায় অর্ধরাত্রে বা প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভিষেক দানের সময়ে। তখন যোগীর মনে অতীন্দ্রিয় আনন্দ, ভববিকল্পগুলি তিরোহিত, তাই যোগীর মনে তখন পরিশুদ্ধ প্রকৃতিরূপিণী বধূ জেগে থাকে ; সহজানন্দ অনুভূত হবার পরে চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয়, গ্রাহ্যগ্রাহকভাব তিরোহিত হয়। দিন অর্থ চিত্তের সজাগ অবস্থা, তখন চিত্ত জগতের ভীষণ পরিণতি দেখে ভীত হয় ; আর রাত্রি অর্থ চিত্তের পরিশুদ্ধ সুষুপ্তি অবস্থা, তখনই সে মহাসুখসংগমে বা কামরূপে যায়। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এই তত্ত্বটি দুরূহ, সেইজন্যেই কুক্কুরীপাদ বলছেন, এই চর্যার অর্থ কোটির মধ্যে এক জনের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

দুলি = স্ত্রী-কচ্ছপ। পিটা = দেহরূপ পীঠ। দেহের মধ্যে ২৪টি পীঠ বৌদ্ধ বজ্রযানীরা কল্পনা করেছেন। রুখের < বৃক্ষের। 'ঋ' ফলার লোপ—পালিতে বৃক্ষ > রুখ ॥ আঙ্গণ < অঙ্গন ॥ বিআতী = বিজ্ঞপ্তি থেকে ॥ কানেট = কৃষ্ণত্ব ? > কানেট্ট ? কানেট ? ॥ ভায় = ভীত হয়. ভয় থেকে নামধাতু ॥ হিঅহি = সং. হৃদয় > প্রা. হিঅঅ > হিআ, অধিকরণে হিঅহি ॥ সমাইড় -- সং. সম্মাপয়তি > প্রা. সম্মাঅই > সামাঅ > সমাঅ + অতীতের ইল > সমাইল > সমাইড় (মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় 'ল' ধ্বনির 'ড়' এবং বিপরীত ভাবে 'ড়' ধ্বনি 'ল'-তে পরিবর্তন অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব) ॥

॥ চর্যা ৩ ॥

॥ বিরুআ ॥

॥ রাগ গবড়া (গউরা) ॥

এক সে শুণ্ডিনী[১] দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥
সহজে থির করি বারুণী বান্ধ[২]।
জে অজরামর হোই দিঢ়[৩] কান্ধ[৪] ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত[৫] পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক ঘড়ুলী[৬] সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. শুণ্ডিনিনী। ২. সান্ধে। ৩. দিট। ৪. কান্ধঃ। ৫. দেট। ৬. স ডুলি, ঘড়লী (ঘটি) ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢোকে, সে চিকণ বাকল দিয়ে বারুণী (মদ) বাঁধে। সহজকে স্থির করে বারুণী বাঁধ, যেন তুমি অজর অমর এবং দৃঢ়স্কন্ধ হতে পার। দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে (অর্থাৎ, শুঁড়ীর ঘরের চিহ্ন দেওয়া আছে দুয়ারেই, যাতে সবাই চিনে নিতে পারে) গ্রাহক নিজেই চলে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় (ঘটিতে) মদ ঢালা হয়েছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকল তার আর নিষ্ক্রমণ নেই (মদের নেশায় এমনই বিভোর !)। সরু নাল দিয়ে একটি ঘড়ায় (বা ঘটিতে) মদ ঢালা হচ্ছে, বিরুবা বলছেন—(সরু নল দিয়ে) চাল স্থির করে (মদ ঢাল)।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

শুণ্ডিনী = নৈরাত্মাদেবীর রূপক, তিনি কখনও ডোম্বী, কখনও শবরী ॥ দুই ঘরে = দুই নাড়ীতে ॥ চীঅণ < সং. চিক্কণ ॥ বারুণী = বোধিচিত্ত ॥ দশমি দুআরত = নবদ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ দশম দ্বার ॥ গরাহক < গ্রাহক, বিপ্রকর্ষের প্রভাবে গরাহক ॥ চউশঠী = দেহের চৌষট্টি পীঠের রূপক ॥ দেল < দত্ত + ইল, বিশেষণ ॥ থির করি চাল = বোধিচিত্তকে স্থির করে চালিত কর ॥

॥ চর্যা ৪ ॥

॥ গুণ্ডরীপাদ ॥

॥ রাগ অরু ॥

তিঅড়া[১] চাপী জোইনি দে[২] অঙ্কবালী।
কমল-কুলিশা ঘাণ্টে[৩] করহুঁ বিআলী ॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥
খেঁপহু[৪] জোইনি লেপ ন[৫] জায়।
মণিকুলে[৬] বহিআ ওড়িআণে সমাঅ[৭] ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ বেণি পখা ফাল ॥
ভণই গুডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. তিঅড্ডা। ২. দেই। ৩. ঘাণ্ট। ৪. পেপহু। ৫. 'লেপন জায়'। ৬. মণিমূলে। ৭. সগাঅ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

ত্রিনাড়ী (কিংবা মতান্তরে জঘন কিংবা মেখলা) চেপে যোগিনি, আলিঙ্গন দাও। পদ্মবজ্রের ঘাঁটে বিকাল করব (অর্থাৎ, বজ্রপদ্ম সংযোগে চিত্তকে শূন্যতায় পরিপূর্ণ করে কালরহিত অবস্থায় সহজানন্দ লাভ করব)। যোগিনি, তোমাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও বাঁচি না, তোমার মুখে চুম্বন করে আমি কমলরস পান করে থাকি। উৎক্ষিপ্ত হতে হে যোগিনী, লেপন করা যায় না। মণিকূল (বা মণিমূল) বেয়ে উর্ধ্বস্থানে প্রবেশ করে। শাশুড়ীর ঘরে তালাচাবি পড়ল, চাঁদ সূর্য দুই পাখা খণ্ডন কর (অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব দূর কর)। গুণ্ডরীপাদ বলছেন, আমি ইন্দ্রিয়সম্ভোগে (সুরতে) বীর, নর-নারীর মাঝখানে চিহ্ন (পতাকা) তোলা হল ॥

॥ রূপকার্থ ॥

টীকা অনুযায়ী, এই চর্যায় যে-সমস্ত রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ এই রকম :—ত্রিনাড়ী—ললনা, রসনা আর অবধূতিকা। আলিঙ্গন দেওয়ার অর্থ, আনন্দ ও আশ্বাস দান করা। পদ্মবজ্রের অর্থ, চিত্তকমলের সঙ্গে শূন্যতারূপ বজ্রের মিলনে। বিকাল কথাটির সাংকেতিক অর্থ কালহীন বা সময়-নিরপেক্ষ। 'বিকল করব' কথাটির তাৎপর্য, কালরহিত অবস্থায় বা নিরবচ্ছিন্নভাবে সহজানন্দ লাভ করব। জোইনী বা যোগিনী এখানে নৈরাত্মা। 'যোগিনি, তোমাকে ছাড়া ক্ষণমাত্র বাঁচি না' এই কথাটির দ্বারা কবি বোঝাতে চাইছেন, নৈরাত্মা ছাড়া সাধক এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। 'উৎক্ষিপ্ত হতে লেপন করা যায় না'—এর দ্বারা সাধক বোঝাতে চাইছেন, নৈরাত্মাকে পাবার উদগ্র বাসনা জাগরিত হলে বোধিচিত্ত মোহলিপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে না, কারণ বোধিচিত্ত মোহলিপ্ত অবস্থায় থাকলে নৈরাত্মাকে পাবার বাসনাও তো জাগবে না। 'মণিকূল বেয়ে উর্ধ্বস্থানে প্রবেশ করে'—এর আধ্যাত্মিক অর্থ, আনন্দরস পান করার পর বোধিচিত্ত মূলাধার-চক্র থেকে মহাসুখ-চক্রে অন্তর্হিত হয়। চন্দ্রসূর্য গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবের প্রতীক। যতক্ষণ সাধকের মনে গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব থাকবে ততক্ষণ সে মুক্তি পাবে না, তাই নির্বাণ লাভ করতে গেলে এই ভাব দুটি ছাড়তে হবে ॥

॥ চর্যা ৫ ॥

॥ চাটিলপাদ ॥

॥ রাগ গুর্জরী (গুঞ্জরী) ॥

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই[১]।
পারগামি-লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ[২] মোহতরু পটি[৩] জোড়িঅ।
আদঅদিঢ়ি[৪] টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ[৫] ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্‌ডী[৬] বোহি দূর মা[৭] জাহী ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু[৮] চাটিল অনুত্তরসামী ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. গটই, গড়ই। ২. ফাড্ডিঅ। ৩. পাটি। ৪. দিটি। ৫. কোহিঅ। ৬. নিয়ড়ী। ৭. ম। ৮. পুচ্ছহ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

ভবনদী গহন এবং গম্ভীর, সবেগে তা প্রবাহিত হচ্ছে। দুই ধারে তার কাদা, মাঝখানে থই পাওয়া যায় না। ধর্ম-সাধনার জন্যে চাটিলপাদ তার উপর একটা সাঁকো গড়ে দিয়েছেন, যাতে ওপারে যেতে ইচ্ছুকরা নির্ভয়ে (এই ভবনদী) পার হতে পারে। মোহতরু ফেড়ে ফেলা হয়েছে, পাটিও জোড়া দেওয়া হয়েছে, অদ্বয় (জ্ঞানরূপ) টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণে দৃঢ় কর। সাঁকোয় চড়ে ডান দিক বাম দিক কোর না, বোধি (তোমার) নিকটেই, (তার জন্যে) দূরে যেও না। যদি তোমরা, হে লোকেরা, পারগামী হতে চাও, তবে অনুত্তরস্বামী চাটিলপাদকে জিজ্ঞাসা করে পার হবার কৌশল জেনে নাও।*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

ভবণই = ভবনদী ॥ গম্ভীর = প্রকৃতি দোযাদ্ গভীরম্, প্রকৃতিদোষ হেতু গভীর ॥ বেগেঁ < বেগেন ॥ বাহী = বহে যায়, বাহিঅই > বাহিএ > বাহী ॥ দুআন্তে = দু +

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৫৭ দ্রষ্টব্য

অন্তে দুই ধারে। চিখিল=সং. চিখল্ল, পঙ্কলিপ্ত ॥ থাহী=সং. স্থিত ॥ ধামার্থে= ধর্মার্থে। ফাড়িঅ=স্ফাটায়িত্বা ॥ সাঙ্কম<সং. সংক্রমম্ ॥ গড়ই<গঠতি ॥ দিঢ় কোরিঅ<দৃঢ়ং করোতি ॥ অদঅ দিঢ়ি=অদ্বয়জ্ঞানকে দৃঢ় করে। নিয়ড্ডি বোহি=নিকটে বোধি। নিকট>নিঅড়>নিয়ড্ডি। বোধি>বোহি ॥ অনুত্তর= সর্বশ্রেষ্ঠ ॥

॥ চর্যা ৬ ॥

॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

কাহেরে[১] ঘিনি মেলি অচ্ছহু[২] কীস।
বেঢ়িল[৩] হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু[৪] অহেরি ॥
তিণ ন চ্ছুপই[৫] হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. কাহৈরি, কাহের। ২. আচ্ছহুঁ। ৩. বেটিল। ৪. ভুকু। ৫. খুণ্ডই।

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

কাকে গ্রহণ করে ছেড়ে আছ (বা আছি) কিসে, আমাকে ঘিরে চারদিকে হাঁক পড়ছে। নিজের মাংসের জন্যেই হরিণ নিজের শত্রু। ক্ষণমাত্রও ভুসুকু শিকারী ছাড়ে না। হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না (বা দাঁতে কাটে না), সে জলও ছোঁয় না, হরিণ হরিণীর নিবাস কোথায় তা জানে না। হরিণী হরিণকে বলছে—ও হরিণ, তুই শোন তো,—এই বন ছেড়ে তুই ভ্রান্ত হ' (দূরে চলে যা)। তরঙ্গে তরঙ্গে (হরিণের গতি যেন ঢেউ তুলে তুলে ছোটার মতো, তাই তার দৌড়ানোকে বলা হচ্ছে তরঙ্গে তরঙ্গে) হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলছেন—মূঢ়ের হৃদয়ে (এই তত্ত্ব) প্রবেশ করে না ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

কাহেরে=কীরূপে ॥ ঘিণি<সং. গৃহীত্বা। গ্রহ্ ধাতু থেকে গৃহ্ণাতি>ঘিণি ॥ অচ্ছহু<অচ্ছ্ ধাতু থেকে 'আমি আছি' এই অর্থে ॥ কীস<কস্য ॥ বেঢ়িল=বেষ্টিত ॥ হাক্<দেশি 'হক্ক' শব্দ থেকে ॥ পড়অ=পততি>পড়ই>পড়এ>পড়অ ॥ চৌদীস<চতুর্দিশ ॥ কহেরি<সং. আখেটীক, শিকারী ॥ চ্ছুপই<সং. স্পৃশতি ॥ হোহু ভান্তো=রূপকার্থ—'ভ্রান্তিরূপ বিকারহীন হও' ॥ হিঅহি=হৃদয়ে। হৃদয়>হিঅঅ>হিআ, অধিকরণে হিঅহি ॥ পইসই<প্রবিশতি ॥*

॥ চর্যা ৭ ॥

॥ কাহ্নু পাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

আলিএঁ[১] কালিএঁ বাট রুন্ধেলা[২]।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥
কাহ্নু কহি গই[৩] করিব নিবাস।
জো মনগোঅর সো উআস ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না[৪]।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা[৫]।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা[৬] ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মো-হিঅহি ণ পইসই[৭] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. অলিএঁ। ২. বাটএ রুন্ধেলা। ৩. কহিঁব গই। ৪. 'তিনি অভিন্না'। ৫. গইলা। ৬. ভইঈলা। ৭. পইট্‌ঠই ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

আলি-কালিতে পথ রুদ্ধ হল। তা দেখে কানু বিমন হল। কাহ্নু কোথায় গিয়ে নিবাস করবে? যারা মনগোচর তারাই উদাস। তারা তিন (জন), তারা তিন, (সেই) তিনজন অভিন্ন। কাহ্নুপাদ বলছেন, ভব (পৃথিবী) বিনষ্ট হল। যারা যারা এসেছে (এল), তারা তারাই গিয়েছে (গেল)। গমনাগমনে কাহ্নু

*রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৫৮ দ্রষ্টব্য ॥

বিমন হল। কাহ্নুর নিকটেই আছে জিনপুর তা দেখতে পাচ্ছি। কাহ্নুপাদ বলছেন, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না (কিংবা, সেই জিনপুরে মোহহেতু প্রবেশ করতে পারি না) ॥*

॥ **শব্দার্থ ও টীকা** ॥

আলিএঁ কালিএঁ=বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা অনুসারে আলি হচ্ছে লোকজ্ঞান, কালি হচ্ছে লোকভাস। কাহ্নুপাদের আরেকটি চর্যায় (নং ১১) আলি-কালির অর্থ "পরিশোধিত চন্দ্র-সূর্য"। আবার আরেক জায়গায় আলি-কালির অর্থ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আলিএঁ কালিএঁ=আলিকালির দ্বারা, করণে ৩য়া ॥ তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না'—কথাটির 'তিন' শব্দটির সন্ধ্যা বা সংকেত হচ্ছে—বাহ্য অর্থে —স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল ; অধ্যাত্ম অর্থে—কায়-বাক্-চিত্ত। কিংবা দিন-রাত-সন্ধ্যা (বাহ্য অর্থে), যোগ-যোগিনী-তন্ত্র (অধ্যাত্ম অর্থে) ॥ জিনপুর=মহাসুখপুর, সহজভাব প্রাপ্তি ॥ মনগোঅর<মনগোচর ॥ উআস<উদাস ॥ অবণাগবণ<গমনাগমন ॥ নিঅড়ি=নিকটে ॥ বট্টই<বর্ততে ॥ মো-হিঅহি=আমার হৃদয়ে, অধিকরণে ৭মী ॥

॥ **চর্যা ৮** ॥

॥ **কামলি (কম্বলাম্বরপাদ)** ॥

॥ রাগ দেবক্রী ॥

সোনে ভরিলী[১] করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহি কে[২] ঠাবী ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই[৩] কইসেঁ ॥
খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চঢ়িলে[৪] চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা[৫]।
বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা ॥

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৫৯ দ্রষ্টব্য ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. ভরিতী। ২. মহিকে, বৃত্তি অনুসারে 'নাহি কে'। ৩. বহুউই। ৪. চন্‌হিলে। ৫. মাঙ্গা ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

সোনায় পরিপূর্ণ (আমার) করুণা-নৌকা, রূপা যে রাখব তার জায়গা নেই। কামলি, তুমি গগন উদ্দেশে (নৌকা) বেয়ে চল। গতজন্ম কিসে ঘুরে আসে (দেখি)। খুঁটি উপড়িয়ে (তুমি) কাছি মেলে দাও, সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে তুমি (নৌকা) বেয়ে চল। পিছনে চড়লে (তুমি) চারদিকে তাকাও; হাল নেই, (এই অবস্থায়) কে (নৌকা) বাইতে পারে? বামদিক ডানদিক চেপে মিলে মিলে মার্গে (অর্থাৎ বিরমানন্দের পথের সঙ্গে সর্বদা মিলিত ভাবে থেকে) বাটে মহাসুখ-সঙ্গ মিলন (পাওয়া গেল) ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

সোনে=এখানে দুটি মানে। একটি অর্থ সোনা, অন্য অর্থ শূন্য। 'শূন্য' ও 'করুণা' চর্যাগীতিকারদের ব্যবহৃত দুটি মৌলিক শব্দ। শূন্য ও করুণা=পুরুষ-প্রকৃতি (সাংখ্য), ব্রহ্ম ও মায়া (বেদান্ত), সহজ সাধনার নিরঞ্জন ও নৈরাত্মার প্রতীক। একটি মানে, 'সোনায় ভরতি করুণা-নৌকায় রূপা রাখবার জায়গা নেই; অন্য অর্থ, 'শূন্য বা সহজাবস্থা পাওয়াতে রূপের জগতের বা ভেদজ্ঞানের বোধ নেই' ॥ ঠাবিঁ= ঠাঁই ॥ উবেসেঁ=উদ্দেশে ॥ বাহুড়ই<সং. ব্যাঘুটতি, ফিরে আসে ॥ কইসেঁ <কীদৃশেন, কেমন করে ॥ খুণ্টি=কাঠের থাম, খুঁটি; রূপক অর্থ 'আভাসদোষ' ॥ কাচ্ছি=কাছি ॥ কেডুআল<সং. কূপীটপাল>প্রাকৃত কঈড়বাল>প্রাচীন বাংলায় কেডুআল ॥ বাহবকে=বাহ্‌ ধাতু+ভবিষ্যৎ কালে 'ইব'>বাহব+চতুর্থীর 'কে'= বাহবকে; বাইতে, বাইবার জন্যে ॥ বাম দাহিণ—বাম দক্ষিণ; রূপকার্থ—গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে ॥ মহাসুখ সঙ্গা–মহাসুখসঙ্গ, নৈরাত্মজ্ঞানের অভিষঙ্গ ॥

॥ চর্যা ৯ ॥

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িঅ[১]।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িঅ[২] ॥

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৫৯ দ্রষ্টব্য ॥

কাহ্নু[৩] বিলসই আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥
জিম জিম করিয়া[৪] করিণিরেঁ[৫] রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥
ছড়গই[৬] সঅল সহাবে সূধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥
দশবর[৭] রঅণ হরিঅ দশ দিসে।
বিদ্যাকরি[৮] দমকুঁ[৯] অকিলেসে[১০]॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. মোড়িডউ। ২. তোড়িউ। ৩. কাহ্নু। ৪. করিণা। ৫. করিণিতেঁ। ৬. ছড়িগই। ৭. দশবল। ৮. অবিদ্যাকরি। ৯. মদন· দমন·) কুরু। ১০. অহিনেসে, অনাসঙ্গেণ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

এবংকার (দিবারাত্রিজ্ঞান, কালবোধ) দৃঢ় বাখোড় (বন্ধনস্তম্ভ) ভেঙে বিবিধ ব্যাপক (সব) বন্ধন টুটে ফেলে, কাহ্নুপাদ আসবমত্ত (হয়ে) বিলাস করে, সহজ নলিনীবনে প্রবেশ করে নিবৃত্ত (শান্ত) হয়। যেমন যেমন করী করিণীতে আসক্ত হয়, তেমনি তেমনি মদকল (মদস্রাবী হস্তী) তথতা (নিজ সত্য স্বভাব) বর্ষণ করে। ষড়্গতিতে সকল স্বভাবে শুদ্ধ। ভাবে এবং অভাবে কেশের অগ্রভাগও বিচলিত (ক্ষুব্ধ) হয় না। দশদিকে দশ বররত্ন আহরণ করা হয়েছে, বিদ্যারূপ করীকে বিনাক্লেশে (অক্লেশে) দমন করার জন্য॥

॥ রূপকার্থ ॥

নিজেকে মত্তহস্তীর সঙ্গে তুলনা করে কাহ্নুপাদ বলছেন, মত্তহস্তী যেমন বন্ধনস্তম্ভের শিকল ছিঁড়ে ফেলে কমলবনে প্রবেশ করে ক্রীড়ারত হয়, তেমনি কাহ্নুপাদ সংসারের সমস্ত লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে জ্ঞানাসব পানে প্রমত্ত হয়ে মহাসুখস্বরূপ সহজনলিনীবনে গিয়ে নির্বিকল্প ক্রীড়ায় মগ্ন। হস্তিনীকে দেখে হস্তী মদস্রাবী হয়, তেমনি নৈরাত্মার সান্নিধ্যে তিনি তথতামদ বর্ষণ করছেন। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে তিনি বুঝতে পারছেন, ভাবাভাব বা স্থিতি ও লয় বিন্দুমাত্রও অপরিশুদ্ধ নয়, কারণ সকলেই ধর্মকায় থেকে উৎপন্ন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, তথতারূপ দশরত্ন পৃথিবীর দশদিকে ছড়ানো; যোগাভ্যাসের দ্বারা, তাদের সাহায্যেই অবিদ্যাজাত জগতের অস্তিত্ব বিষয়ক সাধারণজ্ঞানকে দমন করা যায়॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

এবংকার=দিবারাত্রিজ্ঞান বা সময়ের জ্ঞান ॥ বাখোড়=টীকা অনুসারে 'স্তম্ভদ্বয়ম্' ॥ মোড়িউ<মর্দ্দয়িত্বা, ভেঙে ফেলে ॥ তোড়িউ<তোড়য়িত্বা ॥ আসবমত্ত =আধ্যাত্মিক মদ্য বা জ্ঞানাসব পানে প্রমত্ত ॥ নলিনীবন=মহাসুখরূপ কমলবন ॥ নিবিতা='নিবৃত্ত' থেকে ॥ তথতা—পালি তথত্ত (নির্বাণ) শব্দ থেকে। সহাবে সুধ=স্বভাবেন পরিশুদ্ধা ॥ হরিঅ=হরিত, স্ফুরিত, বিস্তৃত ॥

॥ চর্যা ১০ ॥

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ দেশাখ ॥

নগর[১] বাহিরেঁ[২] ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই[৩] যাইসি[৪] বাহ্ম[৫] নাড়িআ ॥
আলো[৬] ডোম্বী তোএ সম করিবে[৭] ম[৮] সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ[৯] ॥
এক সো[১০] পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো[১১] ডোম্বী তো পুছমি সদ্ভাবে।
অইসসি[১২] জাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর ন চঙ্গতা[১৩]।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া[১৪] ॥
তু লো[১৫] ডোম্বী হাঁউ[১৬] কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. নগরিকা। ২. বারিহিরে। ৩. ছোই ছোই। ৪. যাইসো। ৫. ব্রহ্মণ। ৬. অলো। ৭. করিব। ৮. মো। ৯. লাগ। ১০. একসো। ১১. হঞ্জু লো। ১২. আইসসি। ১৩. চাঙ্গেড়া। ১৪. নড়এট্ট। ১৫. তুল। ১৬. হঁউ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

নগরের বাইরে, ডোম্বি, তোমার কুঁড়ে ঘর ; ব্রাহ্মণ নেড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ওগো ডোম্বি, আমি তোমার সঙ্গ করব (বা আমি তোমাকে সাঙ্গা করব), আমি কাহ্নু-কাপালিক, যোগী, নির্ঘৃণ এবং উলঙ্গ। একটি সেই পদ্ম, তাতে চৌষট্টিটি পাপড়ি, তার উপর চড়ে নাচে ডোম্বী ও বাপুড়ী। ওগো ডোম্বি, আমি তোমাকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করি,—'ডোম্বি, তুমি কার নায়ে (নৌকায়) যাওয়া-আসা কর ?' তন্ত্রী বিক্রয় করে না ডোম্বী, করে না চাঙ্গাড়ী ; তোমার জন্যেই এই নটসজ্জা ছাড়া হল। তুমি গো ডোম্বি, আমি কাপালিক ; তোমার জন্যেই আমি হাড়ের মালা পরেছি। সরোবর ভেঙে ডোম্বী মৃণাল খায় ; ডোম্বী, তোমাকে আমি মারব, তোমার প্রাণ নেব ॥

॥ রূপকার্থ ॥

ডোমজাতীয় রমণী যেমন অস্পৃশ্যতা হেতু নগরের বাইরে থাকেন আর তাঁর রূপমুগ্ধ কামান্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কুঁড়েঘরের পাশে ঘোরাঘুরি করে কিন্তু সেই রমণীকে আয়ত্ত করতে পারে না,—তেমনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে থাকেন নৈরাত্মা দেবী, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বল বাইরের সাধকরা তাঁকে পেতে চান, কিন্তু তাঁরা সেই নৈরাত্মাদেবীর আভাস মাত্র পান, তাঁকে অর্থাৎ নির্বাণরূপ মহাসুখকে আয়ত্ত করতে পারেন না। কারণ, কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে সেই মহাসুখকে পাওয়া যায় না। কাহ্নুপাদ তাই ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করে নগ্ন হয়ে অর্থাৎ অন্তরের যাবতীয় লোকাচার ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামিকে ত্যাগ করে সেই নৈরাত্মা দেবীকে পাবার জন্য কাপালিক হয়েছেন বা নিজেকে সেই সাধনার যোগ্য করেছেন। নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি অনুভব করছেন, চৌষট্টি পাপড়ি-যুক্ত একটি পদ্মে উঠে তিনি নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে নৃত্য করছেন। (বজ্রযানে বিবিধ চক্র ও পদ্মের স্থান শরীরের মধ্যে নির্দেশিত, সাধনায় সফলকাম হলে একে একে তাদের অস্তিত্বের অনুভূতি সাধকের মনে আসে। এখানেও বোধ হয় ঐ রকম কোনো চক্রের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে)। নৈরাত্মানুভূতি-যে ইন্দ্রিয়াতীত সেটা বোঝাবার জন্যে তিনি বলছেন, ডোম্বি, চিত্তের সংবৃত্তিরূপ নৌকায় যাওয়া আসা কর কি ? অর্থাৎ, কর না। তাই নৈরাত্মা অবিদ্যার রূপক তন্ত্রী ও বিষয়াভাসরূপ চেঙ্গাড়ি পরিত্যাগ করেছেন—কাহ্নুপাদও তাঁকে পাবার জন্যে নটের পেটিকা বা সংসার ত্যাগ করেছেন, বিকারহীন হয়ে হাড়ের মালা পরিধান করেছেন। নৈরাত্মাদেবী দেহ-সরোবর ভেঙে বোধিচিত্তের মৃণাল গ্রহণ করেন। সংসারের অবিদ্যাকেও কাহ্নুপাদ ধ্বংস করবেন, এবং তখনই তিনি নৈরাত্মাকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

ডোম্বি=নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক। নৈরাত্মাদেবী কখনও কখনও শবরী বলেও কল্পিতা। উদ্দেশ্য একই—ডোম্বী শবরী ইত্যাদি যেমন নগরের বাইরে, লোকালয়ের সীমার ওপারে থাকেন, তেমনি নৈরাত্মাও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাইরে অবস্থিতা ॥ ব্রাহ্মণ=শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বল, অতএব সাধক হিসাবে অপূর্ণ যোগী ॥ সাঙ্গ= সঙ্গম বা সাঙ্গা ॥ নিঘিণ=নির্ঘৃণ ॥ কাপালি=কাপালিক ॥ লাংগ<নগ্ন ॥ বাপুড়ী= হতভাগ্য। সংস্কৃত বপ্তা বা বপ্র থেকে বাপা বা বাপ, তারই আদরে 'বাপুড়ী' ?— তুলনীয় শৌরসেনী অপভ্রংশ 'বপ্‌পুড়া' ॥ আইসসি=আ+ √বিশ্‌=আবিশসি> আইসসি ॥ তান্তি<সং. তন্ত্রী ॥ বিকণঅ=বিক্রয় করে। সং. বিক্রীনাতি ॥ চাঙ্গেড়া= সং. চাঙ্গালিকা, বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে তৈরী পাত্র ॥ নড়পেড়া=সং. নট্টপেটিকা ॥ ঘেনিলি=গ্রহণ করলাম ॥ মোলাণ=সং. মৃণাল>প্রা. মুণাল>বর্ণ-বিপর্যয়ের ফলে মোলাণ।

॥ চর্যা ১১ ॥*

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

নাড়ি শক্তি দিট[১] ধরিঅ খট্টে[২]।
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে[৩] ॥
কাহ্নু কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ-নঅরী বিহরএ একাকারেঁ[৪] ॥
আলি-কালি ঘণ্টা-নেউর চরণে।
রবি-শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দ্বেষ[৫] মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তিহার ॥
মারিঅ[৬] শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্নু ভইঅ কবালী ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. দিঢ়। ২. খাটে। ৩. বীরনাটে। ৪. একারেঁ। ৫. দেশ। ৬. মারি ॥

*মূল গীতি-সংগ্রহে দশম গানটির পরে আর একটা গান ছিল বলে মনে হয়। কারণ ঐ গানটির টীকার শেষে উল্লেখ আছে—লাড়ী ডোম্বীপাদানাম্ সুনেত্যাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি। মুনিদত্ত এই গানটির ব্যাখ্যা করেন নি, তাই লিপিকরও বোধ হয় গানটি তোলেন নি ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

নাড়ি শক্তি দৃঢ় করে খাটে ধরা হল। অনহা (অনাহত) ডমরু বীরনাদে বাজছে। কাপালিক কাহ্নুপাদ যোগাচারে পর্যটনে লেগেছে। একাকারে দেহ-নগরীতে বিহার করছে। আলি কালি (যেন তার, অর্থাৎ কাহ্নুপাদের) চরণে ঘণ্টানূপুর, রবি শশীকে (সে) কুণ্ডল আভরণ করেছে। পরম-মোক্ষের মুক্তাহার লাভ করেছে। শাশুড়ী ননদ শালীদের মারা হল, মায়াকে মেরে কাহ্নুপাদ কাপালিক হয়েছে ॥

॥ রূপকার্থ ॥

বত্রিশটি নাড়ীর মধ্যে প্রধান যে-নাড়ী তাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে একটি বিশেষ যোগাচারে কাহ্নুপাদ প্রবিষ্ট। শূন্যতা-রূপ ডমরু ঘন ঘন বাজছে, কাহ্নুপাদের দেহ-নগরীর সমস্ত ক্লেশ উপেক্ষিত—এই অবস্থায় কাপালিক কাহ্নুপাদ যোগধ্যানে নিমগ্ন। আলি-কালি বা লোকজ্ঞান ও লোকাভাসকে তিনি করেছেন পায়ের ঘণ্টানূপুর, রবি শশী অর্থাৎ দিবারাত্রি জ্ঞান (বা গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবকে) তিনি করেছেন কানের কুণ্ডল। এর তাৎপর্য—এই সমস্ত ভাবকে তিনি পরিশোধিত করে নিয়েছেন। রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদিকে মহাসুখ স্বরূপ অগ্নিতে দগ্ধ করেছেন, তাদের ভস্মে তাঁর দেহ অনুলিপ্ত ; তিনি মোক্ষরূপ মুক্তাহার পরিধান করেছেন—শ্বাস রোধ করে, ইন্দ্রিয় দমন করে, মায়ারূপ অবিদ্যাকে ধ্বংস করে কাহ্নুপাদ কাপালিক হয়েছেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

নাড়ি শক্তি=প্রধানা নাড়ী ॥ ধরিঅ<সং. ধৃত্বা ॥ অনহা ডমরু=অনাহত ডমরু ॥ বীরনাদে=শূন্যতা সিংহনাদের দ্বারা ॥ পইঠ<সং. প্রবিষ্ট ॥ অচারে=যোগাচারে ॥ নেউর=নূপুর ॥ ছার<ক্ষার, ছাই ॥ শাসু=শাশুড়ী, রূপকার্থ শ্বাস। সমাধি অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়। ণণন্দ=ননদ, রূপকার্থ যা আনন্দ দেয় ॥ মাঅ= (অবিদ্যারূপ) মায়া ॥

॥ চর্যা ১২ ॥

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ ভৈরবী ॥

করুণা পিড়ি[১] খেলহুঁ নঅ-বল।
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥
ফীটউ[২] দুআ মাদেসিরে ঠাকুর[৩]।
উআরি[৪] উএস কাহ্নু নিঅড় জিণউর[৫] ॥

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়িইউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ[৬] ॥
মতিএঁ[৭] ঠাকুরক পরিনিবিত্তা[৮]।
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভলি দায়[৯] দেহুঁ[১০]।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. পিহাড়ি। ২. ফীটউ। ৩. ঠকুর। ৪. তআরি। ৫. জিনবর। ৬. ঘোলিউ। ৭. মুন্তিএ। ৮. পরিনিবিতা। ৯. দাহ। ১০. দেউঁ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

করুণা পিঁড়িতে আমি নয়বল (চতুরঙ্গ বা দাবা) খেলি; সদ্‌গুরুবোধে ভববল (সংসারশক্তি) জেতা হল। দুআ (আভাসদ্বয়) সরিয়ে ঠাকুরকে (রাজাকে) মারা হল, উপকারীর উপদেশে কাহ্নুপাদ (দেখলেন) নিকটে জিনপুর। প্রথমেই তেড়ে গিয়ে বড়েগুলি মারা হল, গজ-(দাবার গজ) বরকে তুলে পাঁচজনকে ঘায়েল করা হল। মন্ত্রীর দ্বারা ঠাকুর নিবৃত্ত, অবশ করে ভববল জেতা হল। কাহ্নুপাদ বলছেন, আমি ভালো দান দিই, (ছকের) চৌষট্টি কোঠা গুণে নিই ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

খেলহুঁ = √খেল্‌+অহম্‌ জাত হুঁ=খেলহুঁ (আমি খেলি)॥ নঅবল= চতুর্থানন্দ (কায়বাকচিত্তের অতীত চতুর্থ আনন্দ)। লক্ষণীয়, নঅ বা 'ন' আমরা এখনও চতুর্থ বোঝাতে ব্যবহার করি, যেমন ন' দাদা, ন' কাকা ইত্যাদি ॥ বোহেঁ =সং. বোধেন ॥ জিতেল=সং. √জি+অতীতকালের ইল্ল=জিতেল্ল>জিতেল ॥ ভববল—রূপকার্থ সংসারশক্তি ॥ ফীটউ=সং. স্ফেটিত>প্রা. ফেটিঅ>ফীটউ ॥ দুআ=আভাসদোষদ্বয় ॥ মাদেসি=প্রা. মদেসি ॥ ঠাকুর=বিদেশী শব্দ, তুর্কী। তাতে মনে হয়, দাবা খেলাটা বাইরে থেকে এসেছে। রূপকার্থ, অবিদ্যামোহিত চিত্ত। উআরি<উপকারিক ॥ উএসেঁ—সং. উপদেশেন, উপদেশের দ্বারা ॥ জিনউর= জিনপুর বা মহানন্দধাম ॥ পহিলেঁ<সং. প্রথম>পঠম্‌>পহম্‌ (পহ+ইল্ল ?)—পহিল —অধিকরণে ৭মী পহিলেঁ ॥ তোড়িআ=সং. ত্রোটয়িত্বা>তোড়য়িত্বা>তোড়িআ ॥ গঅবরে—গজবরে, রূপকার্থ—'নির্বাণারোপিত চিত্তরূপ গজদ্বারা' ॥ পাঞ্চজনা=পঞ্চ-

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬১ দ্রষ্টব্য।

বিষয়গত অহংকার ॥ মতিএঁ =সং. মন্ত্রিণা>মন্তিএঁ>মতিএঁ ॥ চৌষঠ্ঠি কোঠা=দাবা খেলার ছকের চৌষট্টিটি ঘর, দেহের চৌষট্টি পীঠের রূপক ॥

॥ চর্যা ১৩ ॥

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥

তিশরণ[১] ণাবী কিঅ অঠকমারী[২] ।
ণিঅ দেহ করুণা শূণ মেহেরী[৩] ॥
তরিত্তা[৪] ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা ।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম[৫] মুনিআ ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল ।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥
গন্ধ পরস রস[৬] জইসোঁ তইসোঁ ।
নিন্দ বিহুনে সুইনা নইসো ॥
চিঅ কন্নহার সুণত-মাঙ্গে[৭] ।
চলিল কাহ্নু মহাসুহ-সাঙ্গে ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. তিরাচন। ২. অঠকুমারী। ৩. শূণমেহেরী। ৪. তরিত্তা। ৫. তরঙ্গম্। ৬ পরসর। ৭ মাঙ্গ। ৮ সাঙ্গ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

(বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ—এই) ত্রিশরণ হল নৌকা, তার আটটি কামরা (বা কুমারী)। নিজের দেহ হল করুণা, শূন্য অন্তঃপুর। উত্তীর্ণ হলাম ভবজলধি যেন মায়া-স্বপ্নে। আমি মাঝ-বেণীতে (নদীতে) ঢেউ বুঝতে পারলাম। পঞ্চতথাগতকে কেড়ুআল বা দাঁড় করা হল, কায়া-(নৌকা) বেয়ে কাহ্নুপাদ (তুমি) মায়াজাল উত্তীর্ণ হও। গন্ধ স্পর্শ রস যেমন তেমনিই (থাকুক), নিদ্রাহীন স্বপ্ন যেমন। চিত্ত-কর্ণধার আছে শূন্যতারূপ মার্গে (বা, পিছনের গলুইয়ে); কাহ্নুপাদ চলল মহাসুখের সংগমে ॥

॥ রূপকার্থ ॥

বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান জিনিস বুদ্ধ ধর্ম এবং সংঘকে আশ্রয় করে এবং অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবসায়িতা—এই আটটি বুদ্ধৈশ্বর্যের অনুভূতি সম্বল করে কাহ্নুপাদ নিজদেহে করুণা এবং শূন্যের

মিলন সংসাধন করে ভবজলধি পার হয়েছেন। সাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি মহাসুখ তরঙ্গ উপলব্ধি করতে পারছেন। পঞ্চতথাগতকে দাঁড় হিসাবে ব্যবহার করে তিনি দেহ-নৌকা বেয়ে মায়াজাল ছেদন করেছেন ; গন্ধস্পর্শরস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিজ বিষয়গুলি এখন তাঁর কাছে নিদ্রাহীন স্বপ্নের মতো অলীক মনে হচ্ছে। শূন্যতারূপ নৌকায় চিত্তকর্ণধারকে স্থাপিত করে কাহ্নুপাদ মহাসুখসংগমে (নির্বাণানন্দে) চলেছেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

ণাবী = নৌকা, দেহের রূপক ॥ অঠকমারী = আটটি ঘর, আটটি বুদ্ধৈশ্বর্য (অণিমা লঘিমা ইত্যাদি)। দেহের সাধনার মধ্যে দিয়েই এই আটটি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তাই আট ঘরের বাড়ি বলে দেহকে কল্পনা করেছেন সহজিয়ারা। তুলনীয়— সহজিয়া বাউল গান—'দেহের মধ্যে বেঁধেছে ঘর, ঘরামীর সন্ধান মেলা ভার। ঘরামীর কত বাহাদুরি, আট কামরা পাঁচ দুয়ারী,'······ইত্যাদি ॥ মেহেরী = অন্তঃপুর, বিদেশী শব্দ, তুলনীয় আবেস্তীয়—মএথন, ফারসী—মেহেন্ ॥ সুইনা = স্বপ্ন > সুপিন > সুইন + নির্দেশক 'আ' > সুইনা ॥ কণ্ণহার—সং. কর্ণধার > কন্নআর বা কন্নহার ॥ মুনিআ = সং. √মন্ + ক্তাচ্ = মত্বা > মণিঅ > মুণিঅ > মুণিআ ॥

॥ চর্যা ১৪ ॥

॥ ডোম্বীপাদ ॥

॥ রাগ ধনসী ॥

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে[১] বহই নাঈ[২]।
তহি বুড়িলী[৩] মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহ তু[৪] ডোম্বী বাহ লো[৫] ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাঅপএঁ[৬] জাইব পুণু জিণউরা ॥
পাঞ্চ[৭] কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ-দুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি ॥
চান্দ[৮] সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা ॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বহিবা ন[৯] জাই[১০] কুলে কুল বুড়ই[১১] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. মাঝেরে। ২. নঙ্গ। ৩ চুড়িলী। ৪. বাহতু। ৫. বাহলো। ৬. পাঅপএ। ৭. পঞ্চ। ৮. চন্দ। ৯. বাহবান। ১০. জোই। ১১. বুলই ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

গঙ্গা ও যমুনার মাঝখানে ওরে নৌকা বাওয়া হয়, তাতে নিমজ্জিত মাতঙ্গী যোগীকে অবহেলায় পার করে দেয়। ডোমনি, তুমি নৌকা বেয়ে চল, ওগো ডোমনি, বেয়ে চল, পথে দেরী হল। সদ্‌গুরু পাদপ্রসাদে (আমি) আবার জিনপুর যাব। পাঁচটি বৈঠা পড়ছে, মার্গে (বা, পিছনের গলুইয়ে) পিঁড়া কাছি আছে বাঁধা, গগন-সেঁউতিতে জল সেঁচ, (যেন নৌকার জোড়ার ফাঁকে জল) না প্রবেশ করে। চাঁদ সূর্য দুই চাকা সৃষ্টি সংহারকারী পুলিন্দা (মাস্তুল?), ডান দিক বাঁ দিক দুই গন্তব্য পথ (মার্গ) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেয়ে চল। (ডোমনী) কড়ি নেয় না, বুড়িও নেয় না, স্বেচ্ছায় পার করে দেয়; যে রথে চড়ল (নৌকা) বাইতে জানলো না, সে কূলে কূলে ঘুরে (বা ডুবে মরে) ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

গঙ্গা-জউনা = গ্রাহ্য-গ্রাহক ॥ মাতঙ্গী = সহজযান-মত্ততা হেতু হস্তিনী রূপে কল্পিতা অবধূতী ॥ জোইআ = যোগীন্দ্র ॥ উছারা = উচ্ছ্রিত > উছর—বেলা অতিক্রান্ত, তুলনীয় 'উছর হয়েছে বেলা' (ধর্মমঙ্গল, মাণিকরাম) ॥ পাঅপএঁ = পাদপ্রসাদে ॥ গঅণ-দুখোলেঁ = গগন বা শূন্যতারূপ সেঁউতি ॥ চান্দ সূজ্জ—চন্দ্র প্রজ্ঞা ও সূর্য অদ্বয় জ্ঞানের প্রতীক ॥

॥ চর্যা ১৫ ॥

॥ শান্তিপাদ ॥

॥ রাগ রামক্রী ॥

সঅ-সম্বেঅণ[১] সরুঅ বিআরেঁতে অলকখ লকখণ ন জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥
কূলেঁ কূল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ[২] একু বাক্ক[৩] ন ভুলহ রাজপথ কণ্‌টারা ॥
মাআমোহাসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥

---

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬০ দ্রষ্টব্য।

সুনা[৪] পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এথা[৫] অট মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট[৬] ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. সম্বেইণ। ২. ভিন, তিন। ৩. বাকু, বাঙ্গ। ৪. শূন্য। ৫. এমা। ৬. ঘাস॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

স্বীয় সংবেদন স্বরূপ বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ হয় না (যায় না), যারা ঋজুবাটে (সোজাপথে) গেল তারা অনাবর্ত হল (ফিরে এল না)। কূলে কূলে ঘুরে বেড়িও না, ওরে মূর্খ, সংসার সোজা পথ ; বালকের মতো তিলেক বাঁকে ভুলো না, রাজপথ বস্ত্র দিয়ে ঘেরা (কানাত-ঘেরা)। ওরে (তুই) মায়ামোহরূপ সমুদ্রের অন্ত বুঝিস না, গভীরতাও (থইও) বুঝিস না। আগে নৌকা বা ভেলা কিছুই দেখা যাচ্ছে না, ভ্রান্তিবশত কেন গুরুকে জিজ্ঞাসা করিস্ না ? শূন্য প্রান্তর, সীমা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যেতে ভুল করিস না ; এখানে অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হয় (যদি) ঋজুপথে (সোজাপথে) চল। শান্তিপাদ সংক্ষেপে বলছেন, বাম ও দক্ষিণ দুই পথ ছেড়ে (যেখানে) ঘাট, গুল্ম তৃণ (বা খাদ-তড়াই) কিছু নেই, সেই পথে চোখ বুজে চলে যাও॥

॥ রূপকার্থ ॥

সিদ্ধাচার্য শান্তিপাদ এখানে বলতে চাইছেন, সহজানন্দের অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীত বলে সেই উপলব্ধি অলক্ষ্য এবং লক্ষণের সাহায্যে বা ভাষায় এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁরা এই সহজ পথে গেছেন বা সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সাধনা করেছেন তাঁরা মহাসুখ পেয়েছেন, তাই আর ফিরে আসেন নি। সহজানন্দ লাভ করে বস্তুজগতের অস্তিত্বের সমস্ত ধারণা তাঁদের মন থেকে চলে যায়। শান্তিপাদ তাই বলছেন, বস্তুজগতের কূলে কূলে পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়িও না। মূর্খরাই এই বস্তুজগৎকে বা সংসারকে মহাসুখের সার বলে মনে করে। কিন্তু পণ্ডিতরা তা করেন না। রাজা যেমন কানাত-ঘেরা পথ দিয়ে উদ্যানে যান, তুমিও তেমনি সহজ সাধনার রাজপথ ধরে মহাসুখবনে প্রবেশ কর। বালযোগীরা এই মায়ামোহরূপ সংসারসমুদ্রের অন্তও বোঝে না, গভীরতাও বোঝে না, আর তত্ত্বজ্ঞান না জন্মালে তো এই সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা হয় না। সংসারসমুদ্রে যদি পার হবার উপায় না দেখতে পাও, তবে

কেন গুরুকে জিজ্ঞাসা কর না। গুরুর উপদেশ ছাড়া তো এই সংসারসমুদ্র পার হবার উপায় নেই। তাই, অজ্ঞ যোগি, তুমি যদি এই সহজপথের সন্ধান বা উদ্দেশ না পাও তবুও এ পথ ছেড়ো না, কারণ একমাত্র এই সহজ পথেই অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ করা যাবে। আভাস-দোষদ্বয় ছেড়ে দিয়ে শান্তিপাদ এই পথেই চলতে বলেন, এই পথে তৃণগুল্মের খাদ-তড়াইয়ের প্রতিবন্ধক নেই ; চোখ বুজে এই সহজপথেই চল ॥

॥ **শব্দার্থ ও টীকা** ॥

সঅ-সম্বেঅণ সরুঅ বিআরে = স্বীয় সংবেদন স্বরূপ বিচারে ॥ অনাবাটা— অনাবর্ত, ফিরে না আসা ॥ উজু বাট = ঋজুবাট। ঋকারের উকারে পরিবর্তন প্রাকৃতের বিশেষত্ব—মৃণাল > মুণাল ॥ মূঢ়া—সম্বোধনে ॥ সুনা পান্তর—শূন্য প্রান্তর ॥ ঘাট ন গুমা খড়তড়ি = ঘাট (ঘটকটি)—ন—গুমা (গুল্ম), খড় (তৃণ) তড়ি (তরাই) বা খাদ ও তরাই ॥

॥ **চর্যা ১৬** ॥

॥ মহিণ্ডাপাদ ॥*

॥ রাগ ভৈরব ॥

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অনহ[১] কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই[২] ॥
মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে ঘোলই ॥
পাপপুণ্য বেণি তিড়িঅ[৩] সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্তা পইঠ নিবানা ॥
মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিষয়রে[৫] নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী ॥
খররবি-কিরণ-সন্তাপে রে গগন গঙ্গা[৬] গই পইঠা।
ভণন্তি মহিণ্ডা[৭] মই এথু বুড়ন্তে[৮] কিম্পি ন দিঠা ॥

॥ **পাঠান্তর** ॥

১ অণহা। ২. ভাগই। ৩. তোড়িঅ। ৪. টকা। ৫. পঞ্চবিষয়ের। ৬. গঅণাঙ্গণ। ৭. মহিত্তা। ৮. বুলন্তে ॥

---

* চর্যাপদটির রচয়িতা হিসাবে মূলে আছে মহিত্তা, প্রতিলিপিতে আছে 'মহিণ্ডা,' বৃত্তি অনুসারে লেখকের নাম 'মহীধর' ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

তিনটি পাটে (অর্থাৎ কায় বাক্ মন) জাগল অনাহত ধ্বনি, কালো মেঘ গর্জন করে উঠল। তাই শুনে ভয়ংকর মার সমস্ত (বিষয়) মণ্ডল সমেত পলায়ন করল। মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র ধাবিত হয়, নিরন্তর গগনপ্রান্ত তৃষ্ণায় ঘুলিয়ে তোলে। পাপ পুণ্য— এই দুই শিকল ছিঁড়ে ফেলে, স্তম্ভ-স্থান ভেঙে ফেলে গগন-শিখরে উঠে চিত্ত নির্বাণে প্রবেশ করল। ওরে মহারস পানে সেই (চিত্ত) মাতাল, ত্রিভুবন সমস্তই উপেক্ষিত; পঞ্চ বিষয়ের নায়ক রে, বিপক্ষ কাউকেই দেখা গেল না। ওরে খররবি কিরণ-সন্তাপে গগনাঙ্গনে (গগনগঙ্গায়) (সেই চিত্ত) প্রবিষ্ট; মহিণ্ডা বলেন, এইখানে ডুবে আমি কিছুই দেখতে পাই নি (দেখি নি) ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

তিনিএঁ পাটে=কায় বাক্ মন এই তিনটি পাট। টীকায় বলা হয়েছে 'পাটত্রয়ং কায়ানন্দাদিকং'॥ অণহ=অনাহত॥ কষণ ঘণ=কৃষ্ণ ঘন (মেঘ)॥ ভাজই< ভাগই, ভাগিল॥ মাতেল=মাতাল॥ গাজই=গর্জন করে। গর্জন থেকে নাম ধাতু॥ বিসঅ-মণ্ডল=বিষয়-মণ্ডল। এখানে বলা হচ্ছে, বিষয় মণ্ডলগুলি অনাহত ধ্বনি শুনে পলায়ন করল—এর তাৎপর্য, সহজানন্দে প্রবেশ করলে মণ্ডলচক্রগুলি সমরসীভাব প্রাপ্ত হয়ে চক্রবিমুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য—'চর্যাপদের ধর্মমত' অধ্যায়॥ চীঅগঅন্দা=চিত্তগজেন্দ্র॥ তুসেঁ=তৃষ্ণায়, করণে ৩য়া॥ খম্ভাঠাণা=স্তম্ভস্থান॥ উএখী=উপেক্ষা করে॥ পঞ্চবিষয়=পঞ্চ স্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়॥ বিপখ=বিপক্ষ॥ বুড়ন্তে=ডুবে থাকে॥

॥ চর্যা ১৭ ॥

॥ বীণাপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী[১] চাকি[২] কিঅত অবধূতি॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি-ধনি বিলসই রুণা॥
আলি-কালি বেণি সারি মুণিআ[৩]।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥

---

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬১ দ্রষ্টব্য॥

জবে করহা করহকলে চাপিউ[৪]।
বতিশ তান্তি ধনি[৫] সএল বিআপিউ॥
নাচন্তি বাজিল[৬] গান্তি দেবী[৭]।
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই॥

।। পাঠান্তর ।।

১. ডাণ্ডি। ২. বাকি। ৩. সুণেআ, মুণেআ। ৪. 'করহকে লোপ চিউ।' ৫. ধ্বনিনা। ৬. রাজিল। ৭. দেই (ছন্দের অনুরোধে) ॥

।। আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ।।

সূর্য (হল তানপুরার বা একতারার) লাউ, চাঁদকে লাগানো হল তন্ত্রী (হিসাবে), অনাহত (সেই বীণার) ডাণ্ডি, চাকি করা হল অবধূতীকে। ওগো সই, হেরুক-বীণা বাজাচ্ছি (বাজছে), শূন্যতারূপ তন্ত্রীধ্বনি বিলসিত হচ্ছে (ব্যাপ্ত হচ্ছে) করুণায়। আলি-কালিকে দুই সারি (বা দুই স্বর) মনে করা হল, (চিত্ত) গজবর-সমবসকে সন্ধি (তারের বা তাঁতের বীণাযন্ত্রে যে-ক্ষুদ্র অংশটি বৃহৎ অংশকে জোড়া দেয়) গণ্য করা হল। যখন হাতের পাশ করতলে চাপা হয় (হাত চেপে স্বর তোলা হয়), তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনিতে সমস্ত ব্যাপ্ত হয়। নাচেন (চিত্ত) বজ্রধর, দেবী গান করেন, বুদ্ধনাটক এই রকম বি-সম হয়॥*

।। শব্দার্থ ও টীকা ।।

সুজ লাউ—সুয-রূপ লাউ॥ তান্তী—তন্ত্রী॥ সুনতান্তিধনি=শূন্যতাতন্ত্রের ধ্বনি॥ গঅবর—গজবর (চিত্তের প্রতীক)॥ করহা—করপার্শ্ব॥ করহকলে=করতলে॥ বতিশতান্তিধনি—বীণা পক্ষে বত্রিশ বহু বোঝাতে, আর দেহের রূপকে বত্রিশ নাড়ী॥ বুদ্ধনাটক—নির্বাণ নাটক॥ বিসমা=সবসত্তার নির্বাণ লাভ, বা বিশেষরূপে সমতা লাভ॥

।। চর্যা ১৮ ।।

।। কাহ্নুপাদ ।।

॥ রাগ গউরা ॥

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ-লীড়েঁ[১]॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরীআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী॥

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬২ দ্রষ্টব্য॥

তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজ ণ[2] কারণ সসহর টালিউ॥
কেহো[3] কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ[4] ন মেলঈ॥
কাহ্নে গাইউ[5] কামচণ্ডালী।
ডোম্বিত আগলি[6] নাহি চ্ছিণালী॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. লীলেঁ। ২. কাজণ। ৩ কেহে। ৪ কণ্ঠে। ৫. গাইতু। ৬. 'ডোম্বী ত আগলি'॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

তিনভুবন আমার দ্বারা অবহেলায় বাহিত হল। মহাসুখলীলায় আমি প্রসুপ্ত রয়েছি। ওগো ডোম্বি, কী রকম তোমার চতুরালি, (তোমার) অন্তে কুলীনজন, মাঝখানে কাপালিক। ওগো ডোম্বি, তোমার দ্বারা সব কিছু বিচলিত হল। কাজ নেই, কারণ নেই, (তবু) চন্দ্রকে টলিয়ে দিলে! কেউ কেউ তোমাকে বিরূপ (বা মন্দ) বলে, (কিন্তু) জ্ঞানীরা তোমাকে গলা থেকে ছাড়ে না। কাহ্নুপাদ গাইলেন, (তুমি) চণ্ডালী কামচতুরা; ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (ছলনাময়ী) নেই॥

॥ রূপকার্থ ॥

কাহ্নুপাদ তিনভুবন অর্থাৎ কায়-বাক-চিত্তরূপ ভববিকল্প অবহেলায় অতিক্রম করে সহজানন্দ মহাসুখলীলায় প্রসুপ্ত। দুষ্টা স্ত্রীলোকের মতোই নৈরাত্মাদেবীর চতুরালি। একদিকে অবিদ্যামোহিত (কু-তে লীন) সাধকরা, অন্যদিকে সর্বভাব-সমতাযুক্ত মহাসুখলীন কাপালিকরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করছেন। দুষ্টা স্ত্রীলোক যেমন নিজের ঘরকে এবং বাইরের লোককে—দুইজনকেই অশুচি করে, বিচলিত করে, তেমনি নৈরাত্মা বদ্ধ এবং মুক্ত দুইরকম সাধকদের নিয়েই ক্রীড়া করেন। কিন্তু কার্যকারণ বোধ যার নেই, তেমন সাধকরা (যেহেতু তাঁরা অবিদ্যার প্রভাবে জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত) নৈরাত্মাকে পান না, তাঁরা নিজেরাই ব্যর্থ হয়ে যান। তখন তাঁরাই এবং অন্য কেউ কেউ নৈরাত্মাকে অলীক বলেন, কটূক্তি প্রয়োগ করেন; কিন্তু পরমতত্ত্ব যিনি জেনেছেন এমন তত্ত্বজ্ঞ তাঁকে না পেলেও ত্যাগ করেন না, তাঁরই সাধনা করে যান। ছলনাময়ী রমণীর ছলনায় প্রেমিক হতাশ

হয়ে তাকে ত্যাগ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে তাকে আঁকড়ে থাকে, একদিন না একদিন সে সেই প্রেমিককে ধরা দেবেই। তেমনি নৈরাত্মাদেবীর সাধনায় যে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকবে—সে ছলনাময়ী নৈরাত্মাকেও নিশ্চয় পেতে পারবে ॥

।। শব্দার্থ ও টীকা ।।

তিনি ভুঅণ='ত্রিভুবনং কায় বাক চিত্তম্'। কায়-বাক-চিত্তরূপ তিন ভুবন ॥ হাঁউ=অহম্>অহকম্>হকম>হাঁউ ॥ সুতেলি—সং. সুপ্ত+ইল>সুতেল>সুতেলি (উত্তম পুরুষের একবচনে) ॥ ডোম্বী=নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক ॥ কুলিন=কু-তে লীন, বস্তুজগতে বা রূপাদিবিষয়সমূহে যারা লীন। বিটালিউ=√টল্ থেকে Progressive form টাল্; বি পূর্বক টাল্>বিটাল, বিচলিত করা, এখানে বিটালিউ কর্মবাচ্যের মধ্যমপুরুষের একবচনে ব্যবহৃত ॥ কাজ ণ কারণ=কার্য-কারণ না, অর্থাৎ কার্যকারণ বোধ যার নেই ॥ তোহোরে=ত্বম্>তো +ষষ্ঠীর "র">তোহোর বা তোর+৭মীর 'এ'=তোহোরে ॥ ডোম্বিত=ডোম্বি থেকে, অপাদানে ৭মী। তুলনীয় 'মাঅ বাপত গুরুজন নাইঁ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) ॥

।। চর্যা ১৯ ।।

।। কাহ্নুপাদ ।।

॥ রাগ ভৈরব ॥

ভবনির্বাণে পড়হ-মাদলা।
মন পবণ বেণি[1] করণ্ডকশালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ।
কাহ্নু ডোম্বী-বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহণিসি[2] সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণিজালে রএণি পোহাঅ ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো ॥

।। পাঠান্তর ।।

১. ঘেণি। ২. অহিণিসি ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

ভব ও নির্বাণ পটহ ও মাদল ; মন পবন দুইটি করণ্ড (ঢোল ?) ও কাঁসি। দুন্দুভিশব্দে জয় জয় ধ্বনি উছলিয়ে উঠল ; কাহ্নুপাদ ডোম্বীকে বিবাহ করতে চললেন। ডোম্বীকে বিয়ে করে পুনর্জন্ম হল (কিংবা জন্ম সফল হল), যৌতুক করা হল অনুত্তর ধাম। দিবারাত্রি সুরতপ্রসঙ্গে যায়, যোগিনীজালে (যোগিনীদের সঙ্গে) রাত পোহায়। ডোম্বীর সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত (হয়), ক্ষণমাত্রও সে সহজ-উন্মত্ত (সেই ডোম্বীকে) ছাড়ে না ॥

॥ রূপকার্থ ॥

বিবাহযাত্রা ও বিবাহের রূপকে এখানে কাহ্নুপাদের নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বা পরমতত্ত্ব অবগত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে বর বিয়ে করতে যায়, কাহ্নুপাদও তেমনি নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে ভব ও নির্বাণকে বিকল্পমাত্রে পরিণত এবং মন ও চিত্তকে সংহত করেছেন। এইভাবে তিনি অবিদ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সেইজন্য নৈরাত্মা-সাধনায় অগ্রসর হওয়ার অধিকারী। অবিদ্যার প্রভাবে নির্বাণ লাভ হলে আর পুনর্জন্ম হয় না, সেজন্যে কাহ্নুপাদ বলছেন, ডোম্বীকে বিবাহ করে জন্ম সফল হল, কারণ নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। বিবাহের যৌতুক অনুত্তরধাম বা নির্বাণ। নববধূর সঙ্গে সদ্যবিবাহিত বর সুরতানন্দে দিবারাত্রি কাল কাটায়, তেমনি নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে কাহ্নুপাদও দিবারাত্র মহাসুখে কাল কাটাচ্ছেন, জ্ঞানের প্রভায় অজ্ঞান-অন্ধকার রাত্রি এইভাবেই অতিবাহিত হয়। এই নৈরাত্মার সঙ্গ যে-সমস্ত যোগী পেয়েছেন, তাঁরা সহজানন্দের দুর্লভ আনন্দ পেয়ে ক্ষণমাত্রও সেই সহজানন্দকে ছাড়তে চান না ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

ভব নির্বাণে=ভব ও নির্বাণ পৃথক নয়, ভবের স্বরূপ অবগত হলেই নির্বাণে আরোপিত হওয়া যায়—এই রকম সিদ্ধাচার্যরা মনে করতেন ॥ করণ্ড=বাদ্য বিশেষ (ঢোল ?) ॥ পড়হ মাদলা=পটহ ও মাদল ॥ দুন্দুহি-সাদ=দুন্দুভি-শব্দ ॥ উছলিআঁ=উৎ+ √ছল্>উচ্ছল+ক্তাচ্ প্রত্যয় বোঝাতে ইআঁ>উছলিআঁ ॥ অহারিউ=বিনষ্টিকৃত। √হর্-এর Progressive হার, অ+হার+মধ্যমপুরুষের কর্ম-বাচ্যের একবচনে>অহারিউ (তুলনীয়, বিটালিউ) ॥ জাম=জন্ম ॥ ধাম=ধর্ম ॥

॥ চর্যা ২০ ॥

॥ কুক্কুরীপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

হাঁউ নিরাসী খমণ সাঈ[১] ।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥
ফিটলেসু[২] গো মাএ অন্তউড়ি চাহি ।
না এথু চাহমি[৩] সো এথু নাহি ॥
পহিল[৪] বিআণ মোর বাসনয়ুড়া ।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বায়ুড়া[৫] ॥
জা ণ[৬] জৌবন মোর ভইলেসি[৭] ।
মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥
ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা ।
জো এথু বুঝএ[৮] সো এথু বীরা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. খমণ সাঙ্গ, খমণভতারে, সমনভংতারে। ২. ফেটলিউ। ৩. বাহাম। ৪. পহিলে। ৫. বাপুড়া। ৬. জাণ, নব। ৭. ভোর হইলেসি। ৮. বুঝএঁ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

আমি নিরাশ, স্বামী ভ্রমণ (বা শূন্যরূপ মন); আমার বিশেষ জ্ঞান বলা যায় না। গর্ভ মোচন করলাম গো মা, আমি আঁতুড় ঘরের দিকে তাকিয়ে; যে জিনিস আমি এখানে চাই, তা এখানে নেই। আমার প্রথম প্রসব (বিআণ) বাসনাপুট (অর্থাৎ কামপূর্ণ দেহ যা বাসনার পুঁটলি); নাড়ী বিচার করতে গিয়ে দেখি সেও লুপ্ত। যা নব-যৌবন (বা জ্ঞান যৌবন) তা আমার পরিপূর্ণ হল, আসল খন্তায় (নখলীতে) সংহার করা হল। কুক্কুরীপাদ বলছেন, এই সংসার স্থির; যে এখানে তা বোঝে সে-ই এখানে বীর ॥

॥ রূপকার্থ ॥

কুক্কুরীপাদ বলছেন, আমি নিরাশ, আসক্তিহীন; সর্বশূন্যতায় পরিপূর্ণ তাঁর মন তাঁর স্বামী। এই মনের সঙ্গে বা সর্বশূন্যতায় যুক্ত হয়ে তিনি যে-আনন্দ পেয়েছেন বা বিশেষজ্ঞান লাভ করেছেন—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পৃথিবীতে আঁতুড়ঘর দেখে বা মানুষের জন্মলাভ করতে এবং পরে সারাজীবন তাকে দুঃখ

পেতে দেখে তিনি বিষয়ের প্রতি মোহ ছেড়েছেন। তিনি বুঝেছেন, যা তিনি চাইছেন অর্থাৎ নির্বাণ তা এই সংসারসুখের মধ্যে বিষয়ভোগ করে পাওয়া যাবে না। প্রথম যখন তাঁর জ্ঞান লাভ হয়েছিল তখন তিনি ভেবেছিলেন, এই দেহে (বা সংসারেই) সব কিছু আনন্দ, কিন্তু পরে দেখলেন, তা মিথ্যা ; এখন বিষয়কে সংহার করেই তিনি মুক্তি পাবার পথ দেখতে পেলেন। কুক্কুরীপাদ বলেছেন—এই সংসার স্থির, এখানে কিছু আসেও না, যায়ও না ; এই তত্ত্ব যিনি বুঝেছেন তিনি জন্ম মৃত্যুতে বিচলিত হন না, তাই তিনিই প্রকৃত বীর ॥

॥ **শব্দার্থ ও টীকা** ॥

নিরাসী=নিরাশ, স্ত্রীলিঙ্গে নিরাসী ॥ বিগোআ=বিশেষ জ্ঞান, 'বিশিষ্ট সংযোগ করসুখানুভব' ॥ বাসনয়ুড়া=বাসনার সমষ্টি এই দেহ ॥ পহিল=প্রথম>পঠম> পহম>পহল>পহিল ॥ সেব=সা+এব=সেব ; তা-ই, সেও ॥ নখলি=খন্তা ॥ সংঘারা=সংহার>সংঘার ॥

॥ **চর্যা ২১** ॥

॥ **ভুসুকুপাদ** ॥

॥ রাগ বরাড়ী ॥

নিসি[১] অন্ধারী[২] মুসার[৩] চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥
মার রে[৪] জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ তুটঅ অবণা-গবণা ॥
ভব বিন্দারঅ[৫] মুসা[৬] খণঅ[৭] গাতী[৮]।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী ॥
কাল[৯] মুষা উহ ণ[১০] বাণ।
গঅণে উঠি করঅ[১১] অমণ ধাণ ॥
তব সে[১২] মুষা উঞ্চল[১৩]-পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু-বোহে করিহ সো নিচ্চল ॥
জবেঁ মুষাএর চার[১৪] তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥

॥ **পাঠান্তর** ॥

১. নিসিঅ। ২. আন্ধারী. অচারী। ৩. সুসার। ৪. মাররে। ৫. 'বিন্দার

ভ'। ৬. মুসার। ৭. বলআ। ৮. গত্তি। ৯. কলা। ১০. উহণ। ১১. চরঅ। ১২. 'তবসে', 'তাব সে'। ১৩. হুঞ্চল। ১৪. চা, অচার ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

রাত্রি অন্ধকার, মূষিক বিচরণশীল; অমৃতভক্ষ মূষিক আহার করে। পবনের মতো চঞ্চল মূষিককে, হে যোগি, তুমি মার, যেন তার আনাগোনা টুটে যায় (বন্ধ হয়ে যায়)। পৃথিবী-বিদ্ধকারী মূষিক গর্ত খনন করে, মূষিক চঞ্চল—এটা জেনে (তাকে) নাশ করার জন্য স্থিত হও (স্থির কর)। মূষিক কৃষ্ণবর্ণ, তার উদ্দেশ ও গায়ের রঙ (দেখা যায় না); গগনে উঠে সে অমনস্ক ধ্যান করে (কিংবা, বৃত্তি অনুসারে 'অমৃত পান করে')। সেই মূষিকের ততক্ষণ চঞ্চলতা, যতক্ষণ না সে সদ্‌গুরুর উপদেশে (বোধে) নিশ্চল হয়। ভুসুকু বলছেন, যখন মূষিকের বিচরণ টুটে যায় (বন্ধ হয়) তখন তার বন্ধন খোলে ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

নিসি অন্ধারী=রাত্রি অন্ধকারময়ী। নিশি স্ত্রীলিঙ্গ বলে অন্ধার-ও স্ত্রীলিঙ্গে অন্ধারী ॥ ভখঅ=সং. ভক্ষ্য ॥ মুসার চারা=মূষিকের বিচরণ ॥ বিন্দারঅ=বিদ্ধকারী বিদ্ধকারক থেকে? ॥ খণঅ=খনন করে ॥ উঞ্চল-পাঞ্চল=হাঁচোর-পাঁচোর কথাটি কি এর থেকে এসেছে? মুষাএর=মূষিকের। মূষকস্য>মূষঅর>মুষাএর, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী ॥

॥ চর্যা ২২ ॥

॥ সরহপাদ ॥

॥ রাগ গুঞ্জরী ॥

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥
অম্হে[1] ন জানহুঁ[2] অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ[3] ণাহি বিশেসো ॥
জা এথু[4] জাম মরণে বি সঙ্কা[5]।
জো করউ রস রসানেরে কংখা ॥

*রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬২ দ্রষ্টব্য ॥

জে[৬] সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্‌পি ন হোন্তি॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥

॥ **পাঠান্তর** ॥

১. অম্হে। ২. জাণহুঁ। ৩. সঅলেঁ। ৪. জাএথু। ৫. বিশঙ্কা। ৬. যে যে॥

॥ **আধুনিক বাংলায় রূপান্তর** ॥

নিজের মনে ভবনির্বাণ রচনা করে মিথ্যাই লোক নিজেকে বাঁধে। যা অচিন্ত্য তাকে আমরা জানি না, (আরও জানি না) জন্ম মরণ ভব কীভাবে হয়। যেমন জন্ম, মরণও সেই রকম, জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য নেই। যার এখানে জন্ম এবং মৃত্যুতে আশঙ্কা, সে রসরসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। যারা সচরাচর ত্রিদশে ভ্রমণ করে (অর্থাৎ চরাচর সমেত দেবলোকে, কিংবা চরাচর, লোক এবং দেবতায় ভ্রমণ করে) তারা কোনো ভাবেই অজরামর হয় না (হতে পারে না)। জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম হতে জন্ম (এই সমস্যায়) সরহ বলছেন, সেই ধর্ম অচিন্ত্য॥

॥ **রূপকার্থ** ॥

যারা অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, এই রকম লোকেরা মনে করে, ভব আর নির্বাণ, অর্থাৎ স্থিতি ও লয়—এই দুটি বুঝি পৃথক; কিন্তু আসলে এই ধারণা ভুল, কারণ স্থিতির সম্বন্ধে ধারণা হলেই নির্বাণলাভ সহজ হয়। তত্ত্ব বিচারে দেখা যাচ্ছে, ভবের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ তা কোনোদিনই উৎপন্ন হয় নি—আমরা তাই যা দেখি, সবই অবিদ্যা মোহিত চিত্তের মিথ্যানুভূতি মাত্র। যোগীরা তাই বুঝতে পেরেছেন, ভবেরই যখন অস্তিত্ব নেই তখন জন্ম মৃত্যুর ধারণাও অলীক, জন্ম মৃত্যু দৃষ্টির বিভ্রম, দুটোই ভ্রান্তিমূলক, তাই দুটোই এক পর্যায়ভুক্ত। জীবন ও মৃত্যুতে কোনো প্রভেদ নেই। জীবনে যা প্রাণের অভিব্যক্তি, মৃত্যুতে তা মহাপ্রাণে মিশে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। যারা পৃথিবীতে মরতে ভয় পায়, তারাই নানারকম রস রসায়ন খোঁজে, মরতে চায় না। কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব যাঁরা বুঝেছেন তাঁদের তো এই রসায়নের প্রয়োজন নেই—কারণ তাঁরা তো জানেন, জন্ম মরণ আসলে কী। যারা যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে চরাচর সমেত দেবলোকে (বা চরাচর লোক এবং দেবতায়) যেতে চায়, তারা কোনোভাবেই অজরামর হতে পারে না। জন্ম থেকে কর্ম, কি কর্ম থেকে জন্ম, এই বিকল্পাত্মক বিচারের প্রয়োজন কোথায়? সরহ বলছেন, এই নিগূঢ় ধর্মে এই চিন্তার কোনো স্থান নেই॥

।। শব্দার্থ ও টীকা ।।

অপণে=নিজের মনে ॥ অম্হে=সং. অস্মে>অম্‌হে>অম্হে ॥ জানহুঁ= √জ্ঞা থেকে জান+অহম জাত হুঁ>জাণহুঁ ॥ জাম<জন্ম ॥ যইসো তইসো=যাদৃশ, তাদৃশ ॥ জীবন্তে=জীবৎ+শতৃ=জীবন্ত, ৭মীতে জীবন্তে, জীবিতাবস্থায়। তেমনি মঅলেঁ=মৃত+ইল>মঅল (মইল)+৭মী=মঅলেঁ, মৃতাবস্থায় ॥ এথু=অত্র>এথ >এথু ॥ তিঅস=ত্রিদশ (চরাচর, লোক এবং দেবতা), কিংবা চরাচর সমেত দেবলোক ॥ ধাম=ধর্ম>ধম্ম>ধাম ॥

।। চর্যা ২৩ ।।

।। ভুসুকুপাদ ।।

॥ রাগ বড়ারী ॥

জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি[১] জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅলি।
হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি[৩] ॥
মাআজাল পসরিউ রে[৪] বাধেলি মাআহরিণী।
সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কহাণী[৫] ॥

[এর পর থেকে মূল পুথির চারখানা পাতা লুপ্ত। এই চর্যাটির শেষ চার পঙ্‌ক্তি ও টীকা, ২৪ নং চর্যার সমস্ত অংশ ও টীকা এবং তার পরের অর্থাৎ ২৫ নং চর্যার মূল ও টীকার প্রথম অংশ বিনষ্ট। তবে এই চযাগুলির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সেই অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৪২ সালে। সেই অনুবাদ অবলম্বনে এই চর্যাগুলির মূল কী ছিল তা অনুমান করে একটি পাঠ-পরিকল্পনা দিয়েছেন ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থের ৭৬ থেকে ৭৯ পৃষ্ঠায়। সেজন্য এই বইয়ে পরিকল্পিত মূল পাঠ কী ছিল তা না দিয়ে আমি বিনষ্ট চর্যাগুলির তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণ করে বাংলা রূপান্তর দিচ্ছি।]

।। পাঠান্তর ।।

১. অহেই। ২. ণঅণি। ৩. পইসহিনি। ৪. পসরি উরে। ৫. কদিনি ॥

।। আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ।।

ভুসুকু, যদি তুমি শিকারে যাবে, তবে মেরো পাঁচজনাকে ; পদ্মবনে প্রবেশ করতে তুমি একমনা হও। জীবিতাবস্থায় থাকা ব্যতীত মৃত্যু নিয়ে এলে, ঐ রকম

মাংসবিহীন হয়ে, ভুসুকু, পদ্মবনে প্রবেশ করলে। মায়াজাল বিস্তার করে ওরে তুমি মায়াহরিণীকে বাঁধলে, সদ্গুরুবোধে (উপদেশে) বোঝা যায় কার কী কাহিনী ॥

।। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে পরবর্তী চার পঙ্‌ক্তির বাংলা রূপান্তর ।।

দেহতে নিজের বিনাশ নেই, মালাও যোগাড় করে কাল এবং অকাল এই দুটিকে নিয়ে। জালও নেই শিকল নেই , হরিণ একটাকে কামনা করে। (হরিণ) চঞ্চল গতিতে ছুটে শূন্যের মধ্যে মিলে যায় (লীন হয়) ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অহেরি জাইবেঁ=শিকারে যাবে ॥ মারিহসি=মারবে ॥ হোহিসি=ভবিষ্যসি, হও ॥ হণ=তাদৃশন>তঙ্গহণ (মাগধী প্রাকৃত)। হণ, ঐ রকম ॥ মাআ-হরিণী =অবিদ্যারূপ হরিণী ॥ কাসু কহানী=কার কাহিনী, কিং বৃত্তান্তম্। জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা কার কী, সেই সম্বন্ধে বোঝা যায় সদ্গুরুর উপদেশে ॥

।। চর্যা ২৪ ।।

।। কাহ্নুপাদ ।।

॥ রাগ ইন্দ্রতাল ॥

।। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ।।

যেমন চাঁদ (আকাশে) উদিত হয়, সেই রকম চিত্তরাজ (শূন্যতা গগনে) শোভা পায়। (চাঁদ উঠলে যেমন অন্ধকার দূরে যায়, তেমনি চিত্তরাজ শূন্যতা গগনে শোভা পেলে) মোহের অন্ধকার গুরুর উপদেশে বিদূরিত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় গগনে লীন হয়। গগন-বীজ গগনেই যায়, নিজের গাছ থেকে তিনলোকে (চরাচর, লোক এবং দেবতায়) ছায়া ছড়িয়ে দেয়। সূর্য উঠলে যেমন রজনী সমাপ্ত হয়, (তেমনি জ্ঞানসূর্যের উদয়ে) পৃথিবীর সমস্ত মোহ (-রূপ রাত্রি) অপসৃত হয়। হংসরাজ বা রাজহংস যেমন নীর গ্রহণ করে (অর্থাৎ নীর মিশ্রিত ক্ষীরের সার-অংশ গ্রহণ করে), তেমনি কাহ্নুপাদ বলছেন, পৃথিবীর (সার) সংগৃহীত হল ॥

॥ চর্যা ২৫ ॥

॥ তান্তিপাদ ॥

॥ রাগ লেখা নেই ॥

॥ তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

ধর্মের উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয় তা বজ্রস্থানের দ্বারাই বলা

হয়। পাঁচটি কাল, তন্তুতে শুদ্ধ বা পবিত্র বস্ত্র বোনা হয়। আমি সেই তন্তুবায়, সুতো আমার নিজের, (আমি আমার) সুতোর লক্ষণ নিজেই জানি না। সাড়ে তিন হাত মাদুর (নিজের দেহ ?) তিনভুবনে প্রসারিত, এই বস্ত্রের বয়নে (শূন্যতা) গগন পরিপূর্ণ ॥

এর পর থেকে মূল চর্যা ঃ—

অনহা[১] বেমকট বয়ন[২]………।
বেণবি[৩] তোড়ি[৪]…… ‥ ॥
বইঠা ম নিত্তি[৫]……….।
তন্ত্রী[৬]………. …… ॥

॥ **পাঠান্তর** ॥

১. অণহা। ২. বেম্‌কটরেণত্তি। ৩. বেণবি, বৃত্তি অনুসারে। ৪. তোড়য়িত্বা। ৫. বইঠামনীত্তি। ৬.. তন্ত্রীতি, বৃত্তি অনুসারে ॥

॥ **আধুনিক বাংলায় রূপান্তর** ॥

অনাহত তাঁতে মাদুর বোনা (স্থির), দুই জায়গা ভেঙে ফেলে (দৃঢ়ভাবে জোড়া হয়েছে)। উপবিষ্ট আমি (নিত্য শুনতে পাই), তন্তু (-বায় বৃত্তি ছেড়ে আমি বজ্রধর হয়েছি) ॥

॥ **চর্যা ২৬** ॥

॥ **শান্তিপাদ** ॥

॥ রাগ শবরী ॥

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে[১] আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
তউ সে[২] হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥
তুলা[৩] ধুণি ধুণি শুনে অহারিউ।
শূণ[৪] লই-আঁ অপ্‌ণা চটারিউ ॥
বহল বাট[৫] দুই-আর[৬] ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥

কাজ ন কারণ জ এহু[৭] জুঅতি[৮]।
সঅঁ-সম্বেঅণ[৯] বোলথি সান্তি ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. আঁসুরে। ২. তউষে। ৩. তুল। ৪. পুণ। ৫. বট। ৬. দুই মার। ৭. জএহু। ৮. জঅতি। ৯. সঁঅ সঁবেঅণ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

তুলা ধুনে ধুনে আঁশে আঁশে লীন করা হল, আঁশকেও ধুনে ধুনে নিরবয়ব করা হল,—তবু সে হেতু (হেরুক বীণা) পাওয়া যায় না ; শান্তি বলছেন (যতই) তাকে ভাবা (হোক না কেন)। তুলা ধুনে ধুনে শূন্যতায় জড়ো করা হল শূন্যে নিয়ে গিয়ে নিজেকে লীন করলাম (নিঃশেষ করলাম)। কর্দমাক্ত রাস্তা, দুই পথ আর দেখা যায় না ; শান্তি বলছেন, কেশাগ্রও ঢুকতে পারে না (মূর্খের হৃদয়ে)। কাজ না কারণ না—এই যুক্তি শান্তি বলছেন নিজের সংবেদন ॥

॥ রূপকার্থ ॥

শান্তিপাদ বলছেন, তিনি নিজের চিত্তকে ধুনে ধুনে অর্থাৎ তার সমস্ত বিকার নষ্ট করে নিরবয়ব করেছেন, শূন্যে বিলীন করে দিয়েছেন। চিত্তের এইভাবে অস্তিত্ব লোপ পাওয়াতে তার পুনরুৎপত্তির হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সংসারের সমস্ত মলিনতা আর দ্বৈতভাবের জ্ঞান তিরোহিত। এই অনুত্তর জ্ঞানের কণামাত্রও মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না, যিনি কার্য-করণ হেতুজাত সংসারের অলীকতা উপলব্ধি করেছেন, তিনিই এই অনুভূতি নিজের মনে অনুভব করতে পারেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

তউসে=তবু সে ॥ হেরুঅ=হেতু (হেরুক বীণা ?) ॥ ভাবিঅই>ভাব্যতে =ভাবা হয় ॥ চটারিউ=লীন করলাম, নিঃশেষ করলাম, √চট্ থেকে ॥ বহল বাট=কর্দমাক্ত রাস্তা ॥ দুই-আর=দুই মার্গ ॥ এহু জুঅতি<এষা যুক্তি=এই যুক্তি ॥ বোলথি=√ব্রূ—লট্ তি>বদতি>বলতি>বোলথি ॥

॥ চর্যা ২৭ ॥

॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ[১] ॥

চালিউ[২] সসহর[৩] মাগে অবধূই।
রঅণহু ষহজে কহেই (সোই)[৪] ॥
চালিঅ সসহর[৫] গউ ণিবাণেঁ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লোলেঁ[৬] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. উহুসিউ। ২. চালিউঅ। ৩. ষষহর। ৪. ছন্দের খাতিরে 'সোই'। ৫. ষষহর। ৬. লীলেঁ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

অর্ধেক রাত্রি ধরে কমল বিকশিত হল, বত্রিশ যোগিনী, তাদের অঙ্গ (হল) উল্লসিত। অবধূতীমার্গে শশধর চালিত হল, রত্নের প্রভাবে (সে) কথিত হয় সহজানন্দের দ্বারা। শশধর চালিত হয়ে গেল নির্বাণে, কমলিনী পদ্ম বহন করছে মৃণালে। বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ, যে (এই কথা) বোঝে এখানে, সে (এখানে) বুদ্ধ। ভুসুকু বলেন, আমি মিলনে বুঝেছি, সহজানন্দ মহাসুখ লীলায় (মজেছি) ॥

॥ রূপকার্থ ॥

প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভিষেক যে-সময়ে করা হচ্ছে সেটাই অর্ধেক রাত্রি। তখন সাধকের সত্যজ্ঞান লাভ হল অর্থাৎ সহস্রার পদ্ম বিকশিত হল। দেহের বত্রিশটি নাড়ী (সহজ মতে) তখন উল্লসিত, পরিশুদ্ধ চিত্ত তখন মহাসুখানন্দে বিভোর, রত্ন হেতু বা গুরুর উপদেশে এই মহাসুখ পাওয়া গিয়েছে। চিত্ত-শশধর এইভাবে নির্বাণে আরোপিত, দেহকে অবলম্বন করেই সেই বোধিচিত্ত-কমল স্থির। এই যে আনন্দ, তা লক্ষণহীন আর তা যে অনুভব করেছে সেই প্রকৃষ্ট বুদ্ধ। ভুসুকুপাদ গুরুপ্রসাদে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনজাত এই মহাসুখ অনুভব করেছেন—এই কথাই বলতে চান ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অধরাতি="অর্ধরাত্রৌ চতুর্থী সন্ধ্যায়াং প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদান-সময়ে"—টীকা ॥ বতিস=বত্রিশ্, এখানে বত্রিশ যোগিনী অর্থে সহজমতের বত্রিশটি নাড়ী ॥ রঅণহু=

রত্নের হেতু, গুরুর উপদেশের সাহায্যে ॥ চালিত=সং. চালিত> চালিঅ ॥ মই বুঝিঅ=আমি বুঝিলাম, বা আমার দ্বারা বোঝা হল। তুলনীয়, "মঈং জাণিঅ মিঅ-লোঅণি" ইত্যাদি "বিক্রমোর্বশী", কালিদাস। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রভাবে ॥

॥ চর্যা ২৮ ॥

॥ শবরপাদ ॥

॥ রাগ বলাড্ডি (বলাড়ি বা বরাড়ি) ॥

উঁচা উঁচা[১] পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি[২]।
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী[৩] ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিআ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলি।
সবরো ভুজঙ্গ[৪] ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ[৫] তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ[৬] পরম নিবাণে ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. উঞ্চা উঞ্চা। ২. তোহোরি। ৩. সুন্দারী। ৪. ভুঅঙ্গ। ৫. হিএ। ৬. বিন্ধহু, বিন্ধউ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

উঁচু উঁচু পাহাড় (পর্বত), সেখানে শবরী বালিকা বাস করে, শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, তোমার দোহাই, গোল কোর না, (তোমার) নিজের গৃহিণী (ঐ শবরী), নামে সহজসুন্দরী। নানা (পুষ্পে) তরুবর মুকুলিত রে, আকাশে ঠেকে গিয়েছে (সেই তরুবরের) শাখা, একলা শবরী

এই বনে বিহার করে, (সেই শবরী) কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী। তিনধাতুর খাট পাতা হল, শবর মহাসুখে শয্যা বিছাল ; শবর ভুজঙ্গ (নাগর ?) নৈরামণি রমণী (নাগরী ?) প্রেমে রাত কাটাল (প্রেম সম্ভোগে রাত্রি অতিবাহিত করল)। হৃদয়-তাম্বুল (তার সঙ্গে) মহাসুখে কর্পূর খেল, শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করে (বুকে নিয়ে) মহা-সুখে রাত পোহাল। গুরুবাক্যকে ধনু করে নিজের মনকে বাণে বিদ্ধ কর ; এক শর সন্ধান করে (নিজের মনকে) বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর পরম নির্বাণে ॥ গুরুতর রোষে শবর উন্মত্ত, গিরিশিখরের সন্ধিতে প্রবিষ্ট শবরকে খোঁজা যাবে কিসে !

॥ রূপকার্থ ॥

দেহরূপ পর্বতের উচ্চ শিখরে মহাসুখচক্র, সেখানে বাস করেন শবরীরূপিণী নৈরাত্মাদেবী। তিনি নানারকম ভাববিকল্পের অলংকারে ভূষিতা। [এখানে একটা মানে হতে পারে, পরমমুক্তিকে নানাজনে নানা সংজ্ঞায় বর্ণনা করেছেন, তাই তিনি নানা অলংকারে ভূষিতা]। কিন্তু তিনি যেন সহজপথের সাধককে বলছেন—উন্মত্ত সাধক, আর সবাই যেভাবেই আমার ব্যাখ্যা করুক না কেন, জেনো, আমি তোমারই প্রার্থিত সহজানন্দ। নানাফুলে তরুবর মুকুলিত, গগনে সেই বৃক্ষের শাখা বিস্তারিত—অর্থাৎ নানা অবিদ্যায় দেহ সজ্জিত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শাখা-প্রশাখার জটিল জালে নির্বাণের আকাশ অবরুদ্ধ—তবু আমি দেহের মধ্যেই একাকী ; অবিদ্যার কলুষ থেকে নিছক ইন্দ্রিয় সম্ভোগের উন্মত্ততা থেকে যে-সাধক মুক্ত তিনিই আমাকে সহজানন্দরূপে পাবেন। সেই সহজানন্দকে পেতে গেলে সাধককে কঠোর সাধনা করতে হবে। নরনারীর মিলনের আয়োজন উপকরণ খাট, শয্যা, তাম্বুল ইত্যাদি—কিন্তু এগুলি উপকরণমাত্র, আসল হচ্ছে মিলন। তেমনি সহজানন্দকে পেতে গেলে চিত্তের বিভিন্ন বিকারকে অবহেলা করতে হবে, নৈরাত্মাকেই প্রধান লক্ষ্য বলে একমন হতে হবে। চিত্তের বিকার নাশ করার অস্ত্র গুরুর উপদেশ। এই উপদেশ যিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সহজসুখের আস্বাদ পেয়েছেন, তিনি গিরিশিখরের সন্ধিতে অর্থাৎ মহাসুখে বিলীন—তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

শবরী = নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক, যেমন ডোম্বী, চণ্ডালী ইত্যাদি। নগর বাহিরে অস্পৃশ্যতা হেতু এঁরা নিঃসঙ্গ বাস করতেন। তেমনি দেহের অনুভূতির বাইরে নৈরাত্মার অধিষ্ঠান বলে, তিনি ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী ॥ মোরঙ্গি পীচ্ছ—ময়ুর-পুচ্ছ। ময়ুরপুচ্ছ বিচিত্র, তেমনি আমাদের ভাব-বিকল্পগুলিও নানা ধরনের।

কিরাতদের সাজসজ্জায় ময়ূরপুচ্ছ অপরিহার্য। চর্যাপদের কবির বাস্তবতাবোধের উদাহরণ। শবরীকে যতটা সম্ভব ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে তাঁদের নিজেদের বিশেষত্ব সমেত জীবন্তভাবে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে ।। গুহাড়া=গোহার থেকে, অর্থ অনুরোধ করা, আবেদন করা ।। তিঅ-ধাউ—তিন ধাতুর সমাহার, কায় বাক্ চিত্তের রূপক ।। লোড়িব—খুঁজব, খোঁজা হবে।

॥ চর্যা ২৯ ॥

॥ লুইপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
আইস সংবোহেঁ কোপতিআই ॥
লুই ভণই বট[১] দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ-ধাএ বিলসই উহ ন জানা[২] ॥
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো[৩] কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥
কাহেরে কিষ ভণি[৪] মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥
লুই ভণই ভাইব কীষ[৫]।
জা লই[৬] অচ্ছম তাহের[৭] উহ ণ দীস[৮] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. বচ। ২. লাগে ণা। ৩ তো। ৪. কিষভণি। ৫. কীষ্, খেষ। ৬. জালই। ৭. অচ্ছমতাহের। ৮. দীস্ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

ভাব না হয়, অভাব না যায়; এমন সংবোধে কে বিশ্বাস (প্রত্যয়) করে! লুইপাদ বলছেন, বাপু (মূর্খ—শিষ্যকে সম্বোধন), বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য, তিন ধাতুতে বিলাস করে তাকে (তার উদ্দেশ) জানা যায় না। যার বর্ণ রূপ কিছুই জানা যায় না, তা (আমি) কেমন করে আগমবেদের দ্বারা ব্যাখ্যা করব! কাকে (আমি) কী বলে প্রশ্নের উত্তর দেব, (কারণ) জলে প্রতিভাত চন্দ্র না সত্য, না মিথ্যা। লুইপাদ বলছেন, আমি কী ভাবব, যা নিয়ে আছি তার না জানি উদ্দেশ, না জানি দিক ॥

॥ রূপকার্থ ॥

কেউ কেউ মনে করেন, জগতের কোনোই অস্তিত্ব নেই এবং এই সম্যক বোধের দ্বারা তাঁরা বিশ্বাস করেন, জগতের অভাবেও কিছু লোপ পায় না। কিন্তু এই বোধের দ্বারা কি সহজানন্দের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জন্মাতে পারে! সহজানন্দের বিজ্ঞান আলাদা, তা ইন্দ্রিয়াতীত; তাই কায় বাক চিত্তের সাহায্যে যাঁরা এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাখ্যা করেন তাঁরা ঠিক জানেন না। যুক্তিবাদীরা হৃদয়ের অনুভূতির ধার দিয়েও যান না, সুতরাং যুক্তি দিয়ে যাঁরা পৃথিবীকে মিথ্যা বলেন, যুক্তির মাধ্যমেই যাঁরা সহজানন্দকে পেতে চান—তাঁরা আনন্দের রহস্যময় অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। যাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, যাঁর বর্ণ, চিহ্ন, রূপ—সবই বর্ণনার অতীত এবং আমাদের অজ্ঞাত—তাঁকে কি বেদ আগম শাস্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়! জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়—যোগীর হৃদয়ে জগৎ সম্বন্ধে ধারণাও তেমনি না সত্য, না মিথ্যা। আসলে যতক্ষণ যুক্তির প্রাধান্য ততক্ষণ সংশয়ের প্রাধান্য :—চিত্তকে যদি অচিত্ততায় লীন করা যায়, যুক্তির চেয়ে অনুভূতিকে বড় করা হয়—তবেই যোগী অতীন্দ্রিয় সহজানন্দে লীন হতে পারেন। লুইপাদ সেই অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন বলেই তিনি দিশাহারা ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

সংবোহেঁ = সম্বোধেন, সম্যক বোধের সাহায্যে ॥ পতিআই = প্রত্যয় করে ॥ বিণাণা = বিজ্ঞান। তিঅ-ধাএ = তিন ধাতুর (কায়, বাক্, চিত্তের) দ্বারা ॥ বানচিহ্ন-রূব = বর্ণ, চিহ্ন, রূপ ॥ পিরিচ্ছা = প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ॥ উহ ণ দীস = না উদ্দেশ, না দিক ॥

॥ চর্যা ৩০ ॥

॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

করুণা-মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল[১] দলিয়া ॥
উইএ[২] গঅণ-মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ[৩] ॥
জাসু গুণন্তে[৪] তুট্টই ইন্দিয়াল।
নিহএ[৫] নি-অমন দে[৬] উলাস[৭] ॥
বিসঅ-বিশুদ্ধিঁ মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥

এ তৈলোএ[৮] এতবি ষারা।
জোই ভুসুকু ফেড়ই[৯] অন্ধকারা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. দুংদুল। ২. উইত্তা। ৩ সরুঅ। ৪. শুনন্তে। ৫. নিহুরে। ৬ ণ দে। ৭. ছন্দ অনুরোধে 'উলাল'। ৮. এ তিলোএ। ৯ হেব্ভই।

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

করুণা-মেঘ নিরন্তর প্রস্ফুরিত, ভাব-অভাবের দ্বন্দ্ব দলিত। গগনে উদিত অদ্ভুত; ভুসুকু, তুমি সহজ স্বরূপ দেখ। যাকে গণনা করলে (শুনলে) ইন্দ্রিয়পাশ টুটে যায়, নিভৃতে নিজের মন উল্লাস দেয়। বিষয়সমূহের বিশুদ্ধি হেতু আমি আনন্দকে বুঝলাম; গগন যেমন চন্দ্রোদয়ে উজ্জ্বল। এই ত্রিলোকে এই (আনন্দই) সার বস্তু; যোগী ভুসুকু অন্ধকার বিদীর্ণ করে ফেলেন ॥

॥ রূপকার্থ ॥

ভাব অভাবের দ্বন্দ্ব যখন মিটে গেছে, গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব সাধকের মন থেকে অবলুপ্ত, তখনই করুণা-মেঘ বা নির্বাণের আনন্দ চিত্তের আকাশে প্রস্ফুরিত। চিত্ত-গগনে তখন সহজানন্দের বিকাশ, বিষয়সমূহের বোধ বিনষ্ট, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ছিন্ন—এই অবস্থায় মন তো উল্লসিত হবেই। আকাশে চাঁদ উঠলে যেমন নিবিড় অন্ধকার কোথায় মিলিয়ে যায়, তেমনি ভুসুকুপাদের মনে জ্ঞানোদয়ের উজ্জ্বল আলোকে অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত। তিনলোকে এই আনন্দই সার বস্তু—মায়াময় পৃথিবীর মোহান্ধকার বিদীর্ণ করে ভুসুকুপাদ এই সহজানন্দের আস্বাদ পেয়েছেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

ফরিআ = সং. স্ফুরিত্বা ॥ দলিআ = দলিত্বা ॥ উইএ = উদিত ॥ সহজ সরুআ = সহজ স্বরূপ ॥ দে উলাস = উল্লাস দেয়, হিল্লোলিত করে ॥ ফেড়ই = স্ফেটয়তি, ফেড়ে ফেলে ॥

॥ চর্যা ৩১ ॥

॥ আজদেব ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

জহি মন ইন্দিঅরণ[১] হো ণঠা[২] ॥
ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা ॥

অকট করুণা-ডমরুলি[৩] বাজঅ।
আজদেব নিরালে[৪] রাজই॥
চান্দেরি[৫] চান্দকান্তি জিম পতিভাসই।
চিঅ-বিকরণে তহি টলি[৬] পইসই॥
ছাড়িঅ[৭] ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর॥
আজদেবেঁ সঅল বিহলিউ[৮]।
ভয় ঘিণ দূর নিবারিউ॥

॥ পাঠান্তর

১. ইন্দিঅ পবণ। ২. ণ ঠা। ৩. ডমরুকা। ৪. ণিরাসে। ৫. চান্দেরে। ৬. টেলি। ৭. ছাড়িল। ৮. বিহরিউ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

যেখানে নষ্ট হয় মন ও ইন্দ্রিয়পবন, জানি না, (আমার) আত্মা কোথায় প্রবেশ করল। করুণা-ডমরু (কীরকম) অদ্ভুত বাজে, আজদেব (আর্যদেব) নিরালম্বে বিরাজ করেন। চন্দ্রে চন্দ্রকান্তি যেমন প্রতিভাসিত হয় (তেমনি চিত্ত যখন অচিত্ততায় লীন হয়—বা বিকরণ হয়), তখন চিত্ত (অর্থাৎ চিত্তের বিকল্পগুলি) সেখানে টলে প্রবেশ করে। আমি (আর্যদেব) ভয় ঘৃণা লোকাচার—সব ছেড়েছি, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি শূন্য বিকার। আর্যদেব সব কিছু বিফল করেছে, ভয় ঘৃণা দূরে নিবারিত॥

॥ রূপকার্থ ॥

অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন পবনের মতো চঞ্চল প্রধান ইন্দ্রিয়, মনের কাজ লোপ পায়, চিত্ত তখন কোথায় গিয়ে লীন হয় তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। ঐরকম অবস্থায় উপনীত হলে করুণা-ডমরুর অনাহত ধ্বনি উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ কার্যকারণবোধ লুপ্ত হয়। এই অবস্থায় এসেছেন আর্যদেব, তাই তিনি নিরালম্বে বিরাজ করছেন। চন্দ্র অস্ত গেলে জ্যোৎস্নাও মিলিয়ে যায়, তেমনি চিত্ত অচিত্ততায় বিলীন হলে চিত্তের বিকল্পগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। আর্যদেবের চিত্তের ভাব-বিকল্পগুলি বিনষ্ট, তাই তিনি ভয় ঘৃণা লোকাচারকে ত্যাগ করতে পেরেছেন, গুরুনির্দেশিত সাধনার পথে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত ভাবগুলি

অস্তিত্বহীন। সংসারের সমস্ত দোষকে তিনি বিফল করতে পেরেছেন, ভয় ঘৃণাকেও তিনি নিবৃত্ত করতে পেরেছেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

ণঠা = নষ্ট থেকে। প্রাচীন বাংলায় নঠো। তুলনীয় "যত ছোট তত নঠো" ॥ ইন্দিঅপবণ = ইন্দ্রিয় পবন। চঞ্চল ইন্দ্রিয় ও পবনের সাধারণ ধর্ম এক ॥ অপা = আত্মা ॥ করুণা-ডমরুলি = করুণা রূপ ডমরু। ডমরুকে টীকায় বলা হয়েছে অনাহত ॥

॥ চর্যা ৩২ ॥

॥ সরহপাদ ॥

॥ রাগ দেশাখ ॥

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাজ সহাবে মুকল ॥
উজুরে উজু[১] ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক[২]।
নিঅড়ি[৩] বোহি মা জাহু রে[৪] লাঙ্ক ॥
হাথে রে[৫] কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝতু[৬] নিঅমণ ॥
পার উআরেঁ[৭] সোই গজিই[৮]।
দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই[৯] ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. ঢুংঢুরে উজু। ২. বাঙ্ক। ৩ নিঅহি। ৪. জাহুরে। ৫. হাথের। ৬. বুঝতু। ৭. পারউআরে, পারোআরে। ৮. জোই। ৯. অবরি জাই, অবসি মজিই ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

না নাদ, না বিন্দু, না রবি, (না) শশিমণ্ডল, চিত্তরাজ স্বভাবে মুক্ত। ঋজুপথ (সোজাপথ) ছেড়ে বাঁকা (পথ) নিও না, বোধি নিকটেই, (বোধির জন্যে) লঙ্কায় (অর্থাৎ দূরে) যেও না। হাতের কঙ্কণ (দেখবার জন্যে) দর্পণ নিও না, আপনা-আপনিই তুমি নিজের মন বোঝ। পার-উত্তরণে সেই যায়, দুর্জন সঙ্গে সে অধোগতি পায়। বামদিক ডানদিকে খাল ডোবা, সরহ বলছেন, বাপু, সোজাপথ দেখতে পাওয়া গেল ॥

॥ রূপকার্থ ॥

চিত্তের সমস্ত বিকল্প ত্যাগ করেই সাধক মুক্ত হতে পারেন। এই সোজাপথে অর্থাৎ সহজিয়া সাধনার দ্বারাই সাধক বোধিজ্ঞান লাভ করতে পারেন, তার জন্য তাঁর অন্যপথ অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। বোধি নিকটেই (দেহের মধ্যে), তাই তাকে পাওয়ার জন্য জপতপ ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন নেই। হাতে কঙ্কণ আছে কি-না দেখবার জন্যে যেমন কেউ দর্পণ ব্যবহার করে না, তেমনি আত্মতত্ত্ব বোঝবার জন্যে অপরের উপদেশের দরকার নেই, নিজে নিজেই তুমি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর। যে এভাবে পরমার্থতত্ত্বের অনুগামী হয়, সে মোহমুক্ত হয়ে পরপারে যেতে পারে, কিন্তু যে মোহ-দুর্জনের সঙ্গে পতিত হয়, সে অধোগতি পায়। সহজ-সাধনার পথ সোজা ঋজু; সে-পথে বিচলিত হলে চলবে না। তাই সরহপাদ বলছেন, ঋজুপথই, সহজিয়া সাধনার পথই সবচেয়ে ভালো ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

চিঅরাজ = চিত্তরাজ ॥ মুকল = মুক্ত > মুক্ক > মুক + স্বার্থে ল ॥ লেহু = লভস্ব > লভস্সু > লভহু > লেহু ॥ নিঅড়ি = নিকট > নিঅড়, অধিকরণে নিঅড়ি ॥ উআরে = উত্তরণে ॥ ভাইলা = ভদ্র > ভল্ল > ভাইল > ভাইলা ॥

॥ চর্যা ৩৩ ॥

॥ ঢেণ্ঢণপাদ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত[১] ভাত নাহি নিতি আবেসী ॥
বেগ[২] সংসার[৩] বড্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে[৪] ষামায় ॥
বলদ[৫] বিআএল গাবিআ[৬] বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী[৭]।
জো সো চৌর সোই সাধী[৮] ॥
নিতে নিতে[৯] ষিআলা ষিহেঁ[১০] ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে[১১] বুঝই ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. হণ্ডী। ২. বেগে, বেঙ্গ। ৩. সংসয়। ৪. বেণ্ট, বেণ্ডে। ৫. বলদা। ৬. গাবিআ, গাবী। ৭. সোধ নি বুধী। ৮. সউ দুষাবী, দুষাধী। ৯. নিত্যে নিত্যে, নিতি নিতি। ১০. ষিহে। ১১ বিচিরলে॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

টিলার উপরে আমার ঘর, সেখানে প্রতিবেশী নেই, আমার হাঁড়িতে ভাত নেই, (অথচ) নিত্য প্রেমিক (অতিথি) ভীড় করে। বেগে বয়ে যাচ্ছে সংসার [অন্য অর্থ (১) ব্যাঙের সংসার ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে (২) ব্যঙ্গের দ্বারা সংশয় তাড়িত (৩) ব্যাঙের দ্বারা সাপ তাড়িত হয়], দোয়ানো দুধ কি বাঁটেই ফিরে যাচ্ছে। বলদ প্রসব করল, গরু বন্ধ্যা, তিন সন্ধ্যায় পিটা ভরে তাকে (সেই দুধকে) দোয়ানো হল। যে বুদ্ধিমান, সেই ধন্য বুদ্ধি, যে সেই চোর সেই আবার দারোগা (সেই সাধু)। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ঢেণ্ঢণপাদের গান খুব কম লোকেই বুঝতে পারে ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

টালত=টিলাতে, অধিকরণে 'ত' প্রত্যয়। এখানে 'টিলা' অর্থ, দেহরূপ সুমেরু শিখর॥ হাড়ীত=হাঁড়ির মধ্যে, অধিকরণে 'ত'; এখানে হাঁড়ি বলতে টীকায় বোঝানো হয়েছে—হণ্ডীতি স্বকায়াধারম্, নিজ দেহ॥ ভাত=সংবৃত্তিবোধিচিত্ত-বিজ্ঞানাধিরূপম্, জাগতিক জ্ঞানে বিভোর চিত্তই সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত। দুহিল= দোয়ানো হয়েছে যা, দুহ্+অতীত জ্ঞাপক ইল>দুহিল। বিশেষণ॥ গাবিয়া বাঁঝে=টীকায় বলা হয়েছে, 'গাবীতি যোগীন্দ্রস্য গৃহিণী বন্ধ্যা নৈরাত্মা'। বন্ধ্যাগাভী অর্থ নৈরাত্মা॥ ষিআলা=শৃগাল। ষিহেঁ=সিংহের সঙ্গে॥ ষম জুঝঅ=সমানে যুদ্ধ করে॥

॥ চর্যা ৩৪ ॥

॥ দারিকপাদ ॥

॥ রাগ বরাড়ী ॥

সুনকরুণরি[১] অভিন-চারে[২] কাঅবাকচিঅ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ॥
অলখ[৩] লখচিত্তা[৪] মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ॥

---

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬৩ দ্রষ্টব্য॥

কিন্তো মন্তেঁ[৫] কিন্তো তন্তেঁ[৬] কিন্তো রে ঝাণ বখাণেঁ[৭] ।
অপইঠান মহাসুহলীণেঁ[৮] দুলখ পরমনিবাণেঁ ॥
দুঃখে সুখে একু করিআ ভুঞ্জই[৯] ইন্দী জানী ।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরা বাধা ।
লুইপাঅপএ[১০] দারিক দ্বাদস ভুঅণেঁ লধা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১ সুনকরুণার । ২. বারেঁ । ৩. অলক্ষ । ৪. চিত্তেঁ । ৫. কমন্তে । ৬. তন্তে । ৭. ঝাণবখানেঁ । ৮. লীলেঁ । ৯. ভুঞ্জহ্, ভুঞ্জ । ১০. লুয়ী ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

শূন্য ও করুণার অভিন্ন-আচারে কায়বাকচিত্ত নিয়ে দারিক বিলাস করে গগনের পরপারে। অলক্ষ্য (বস্তুতে) লক্ষ্যচিত্ত হয়ে মহাসুখে দারিক বিলাস করে গগনের পরপারে। কী-ই বা হবে তোর মন্ত্রে, তোর তন্ত্রে, তোর ধ্যান-ব্যাখ্যানে ; অপ্রতিষ্ঠ মহাসুখলীলায় লীন হলে পরমনির্বাণেরও দুর্লক্ষ্য। দুঃখ ও সুখে এক করে ইন্দ্রিয়ভোগ করে জ্ঞানী (বা গুরুর কাছে জেনে)। স্ব-পর, অপর অনুভব করে না, সকল অনুত্তর মানে যে, (এমন সিদ্ধাচার্য) দারিক। রাজা, রাজা রাজা, অপর রাজা রে—সবাই মোহেতে আবদ্ধ। সিদ্ধাচার্য লুইপাদের প্রসাদে দারিক দ্বাদশ-ভুবনলব্ধ ॥

॥ রূপকার্থ ॥

শূন্য ও করুণা মিলিত হয়ে একীভূত, যোগীর কায়বাকচিত্ত পরিশুদ্ধ—এই অবস্থায় যোগী দারিকপাদ মহাসুখে প্রবিষ্ট। মন্ত্রে তন্ত্রে ধ্যানব্যাখ্যানে এই মহাসুখ লাভ করা যায় না, অন্যদিকে ঐরকম মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারলে পরমনির্বাণও লাভ করা যায় না। সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান করে যোগীর নিষ্কামভাবে বিষয়, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ভোগ করা উচিত। এই চরমসিদ্ধি লাভ করেছেন সিদ্ধাচার্য দারিক, তাই এখন তিনি আত্মপরভেদরহিত। ঐশ্বর্যশালীরা সকলেই নিজেকে রাজা বলে মনে করেন, কারণ তাঁরা বিষয়সুখে প্রমত্ত, সুতরাং সংসারেই আবদ্ধ। কিন্তু সিদ্ধাচার্য দারিকপাদ তাঁর গুরু লুইপাদের দয়ায় বা নির্দেশিত পথে সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করে সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

সুণকরুণরি = শূন্য ও করুণার ॥ অভিনচারেঁ = অভেদোপচারেণ, অভিন্নাচারে ॥ অপইঠান = অপ্রতিষ্ঠান ॥ ইন্দিজানী = ইন্দি = ইন্দ্রিয়, জানী < জ্ঞানী, বা যে-জানে এমন লোক ॥ রাআ = সং. রাজা। পালির প্রভাবে 'জ' ধ্বনি 'অ'তে পরিবর্তিত ॥

॥ চর্যা ৩৫ ॥

॥ ভাদেপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁসু মোহে[১]।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ[২] ণঠা।
গঅণ সমুদে[৩] টলিআ পইঠা ॥
পেখমি দহদিহ সর্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥
বাজুলে[৪] দিল মোহকখু[৫] ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ ॥
ভাদে[৬] ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. অচ্ছিলেঁ স্বমোহে, অচ্ছিলেঁ সুমোহে। ২. মঙ্গ। ৩. সমুদ্রে। ৪. রাবুলে, রাঙ্গুলে। ৫. মোহলখু। ৬. ভাবে, কাদে (বৃত্তি অনুসারে), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসারে ভাদে ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

এতকাল আমি ছিলাম মোহের বশে, এখন আমি সদ্‌গুরু উপদেশে বুঝলাম (নিজেকে বা নিজের চিত্তকে)। আমার চিত্তরাজ এখন নষ্ট, গগনসমুদ্রে (সে) টলে প্রবিষ্ট (হয়েছে)। দশদিক আমি সমস্তই শূন্য দেখি, চিত্তের অভাবে (বিহনে) পাপ পুণ্য আর কিছু নেই। বাজুল আমাকে মোহকক্ষ (বা লক্ষ্য) বলে দিলেন, আমি গগনসমুদ্রে জলপান করলাম। ভাদেপাদ বলছেন, আমি অভাগ্য নিয়ে চিত্তরাজকে আহার করলাম ॥

॥ রূপকার্থ ॥

কবি বলছেন, তিনি বিষয়সঙ্গহেতু এতকাল মোহাবিষ্ট ছিলেন, এখন সদ্‌গুরুর উপদেশে চিত্তের স্বরূপ তিনি বুঝেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, চিত্তের জন্যই এই জগৎ-সম্বন্ধীয় বোধ জন্মায় এবং চিত্ত বিনষ্ট হলে বাহ্যবিষয়ের ধারণাও নষ্ট হয়। কবি এই সত্য বুঝেছেন, তাই এখন তাঁর চিত্ত অচিত্ততায় লীন। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা তাঁর লুপ্ত ; পাপ পুণ্যের সংস্কারও তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত, প্রকৃত মোক্ষের সন্ধান পেয়ে তিনি গগনসমুদ্রে বা সর্বশূন্যতায় প্রবিষ্ট। ভাদেপাদ শেষে বলছেন, জগৎ-যে আদৌ উৎপন্ন হয় নি এবং চিত্তই-যে জগৎ সম্বন্ধীয় ধারণা সৃষ্টি করে—এই তত্ত্ব বুঝতে পেরে আমি চিত্তকে গ্রাস করেছি বা চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করেছি ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

হাঁউ—আমি। অহম্ > অহকম্ > হকম্ > হঁউ > হাঁউ ॥ অচ্ছিলেঁসু = ছিলাম, √অস্ থেকে √অচ্ছ, অতীতকাল উত্তমপুরুষে অচ্ছিলেঁসু ॥ চিঅরাঅ = চিত্তরাজ ॥ মকুঁ = আমার ॥ অহারিল = আহার করল ॥

॥ চর্যা ৩৬ ॥

॥ কাহ্নিলা (কাহ্নু পাদ) ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥

সুন বাহ[১] তথতা পহারী।
মোহভণ্ডার লই[২] সঅলা অহারী ॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥
চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল[৩] করি সুহে সুতেলা ॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘানিঅ[৪] অবণাগমন বিহুন[৫] ॥
শাখি[৬] করিব জালন্ধরিপাএ।
পাখি[৭] ণ রাহঅ[৮] মোরি পাণ্ডিআচাএ[৯] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. সুশ বাহ, সুন বাহ(র)—সুকুমার সেন। ২. লুই। ৩. মুকল। ৪. ঘোরিঅ। ৫. বিহল। ৬. শাখি। ৭. পারি, পাশি। ৮. চাহই। ৯. পাণ্ডিআচাড়ে, পাণ্ডিআচাদে ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

শূন্য আমার বাসস্থান (বা বাসনাগার) তথতা খড়্গের প্রহারে, মোহের ভাণ্ডার সব নিয়ে আহার করা হল (নষ্ট করা হল)। আত্মপর বিভেদ ভুলে ঘুমায়, সহজেই নিদ্রিত হয় কাহ্নুপাদের নগ্ন (মন)। চেতনা নেই, বেদনা নেই, সুগভীর নিদ্রিত, সমস্ত সুফল করে (সব কিছু পরিষ্কার করে, নিঃশেষে পরিশোধ করে) সুখে শুয়েছে। স্বপ্নে দেখলাম, ত্রিভুবন শূন্য,—যেন যাওয়া আসা নেই এমন ঘানি। জালন্ধরিপাদকে সাক্ষী করব, (মোহ) পাশ মুক্ত আমাকে পণ্ডিতাচার্য দেখতে পায় না ॥

॥ রূপকার্থ ॥

কবির যাবতীয় বাসনা তথতা বা নির্বাণরূপ খড়্গের আঘাতে নির্মূল, তাঁর মোহের ভাণ্ডার নিঃশেষিত, আত্মপরভেদ তাঁর মন থেকে লুপ্ত ; নগ্ন বা সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত কবি যোগনিদ্রায় অচেতন। তাঁর চেতনা বেদনা লুপ্ত, জাগতিক সমস্ত ব্যাপার নিঃশেষ করে তিনি সহজানন্দে প্রবিষ্ট। এই অবস্থায় ত্রিভুবন তাঁর কাছে শূন্য, স্বপ্নের মতো অলীক। গমনাগমন বা জন্মমৃত্যুর ঘুরপাকে আর তাঁকে পড়তে হবে না—গুরু জালন্ধরিপাদের নির্দেশে তিনি এই মুক্ত অবস্থায় উপনীত। তাঁর এই বন্ধনমুক্ত অবস্থা শাস্ত্রসম্বল তথাকথিত পণ্ডিতরা বুঝতে পারবেন না ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

বাহ=বাসস্থান বা বাসনাগার ॥ ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন বাসর। এখানে বাসনাগার চিত্তের প্রতীক ॥ তথতা=নির্বাণ ॥ ণ চেবই=ন চেতয়তি। চেতনা নেই ॥ সপরবিভাগা=স্ব এবং পর, নিজের এবং পরের ভেদ নেই এমন অবস্থা ॥ সুতেলা=সুপ্ত>সুত। সুত+ইল=সুতিল>সুতেল+আ>সুতেলা ॥ পাণ্ডি-আচাএ—পণ্ডিতাচার্যেন ॥

॥ চর্যা ৩৭ ॥

॥ তাড়কপাদ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥

অপণে নাহিঁ মো[১] কাহেরি শঙ্কা।
তা মহমুদেরী টুটি গেলি কংখা[২] ॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ।
চৌকট্টি[৩] বিমুকা জোইসো তোইসো হোই ॥

জইসন[৪] অছিলেস[৫] তইসন[৬] অচ্ছ[৭]।
সহজ পথক[৮] জোই ভান্তি মাহো বাস ॥
বাণ্ড কুরুণ্ড[৯] সন্তারে জাণী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী ॥
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. সো। ২. কংথা। ৩. চৌকোহি। ৪. জইসনি। ৫. অছিলে স, ইছিলেস। ৬. তইছন। ৭. আছ। ৮. পিথক। ৯. বাণ্ডকুরু, বণ্ডকুরুণ্ড ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

আমি নিজেই নেই, আমার কাকে (বা কিসে) শঙ্কা; তাই আমার মহামুদ্রা-লাভের আকাঙ্ক্ষা টুটে গেল। রে যোগি, ভুলো না, সহজ অনুভব (অর্থাৎ সহজানন্দকে যে অনুভব করতে হয়, তা ভুলো না); চতুষ্কোটি বিমুক্ত যেমন তেমন হতে হয়। যেমন ছিলে তেমনই থাক। যোগি, সহজ পথকে ভুল কোর না (কিংবা সহজ পথকে ভুল করে পৃথক ভেবো না)। পুরুষাঙ্গ—অণ্ডকোষ সম্বরণে জানা যায়, কিন্তু বাকপথের অতীত বস্তুকে কিসে ব্যাখ্যা করা যায়! তাড়কপাদ বলছেন, এখানে অবকাশ নেই, যে বোঝে তার গলায় পাশ ॥

॥ রূপকার্থ ॥

সব কিছুই যখন অনিত্য, যখন আমার অস্তিত্বই নেই—তখন আমার আর কাকে ভয়! সংসারের অনিত্যতা আমি বুঝেছি, তাই মহামুদ্রার জন্য আমার আর আকাঙ্ক্ষা নেই, কারণ যেই আমি বুঝতে পেরেছি সংসার অনিত্য, তখনই আমার চিত্ত নির্বাণে আরোপিত হয়েছে।

সহজানন্দ বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয়, তা অনুভূতিলভ্য। আমি সেই অনুভূতির দ্বারাই বুঝেছি—চার রকম বিকল্প, (সৎ, অসৎ, সদসৎ, ন সৎ ন অসৎ) থেকে মুক্ত আমি পূর্বে যা ছিলাম এখনও তাই আছি। জন্মের সময় যে-আনন্দ নিয়ে আমি এসেছিলাম, পরে পৃথিবীতে নানা মোহে আবদ্ধ থাকার জন্যে আমার সেই আনন্দ চলে গিয়েছিল, অনেক দুঃখও আমি ভোগ করেছি। এখন সমস্ত সঙ্গ থেকে বর্জিত হওয়ায় আমার আগের সেই আনন্দ আবার ফিরে এসেছে। তাই আমি পূর্বে যেমন ছিলাম এখনও আমি তাই আছি। নদী পার হবার সময় পাটনী

যাত্রীর কাপড় বটুয়া খুঁজে দেখে, খেয়াপারের মাসুল সে দিতে পারবে কি-না। কিন্তু সহজপন্থীদের ভবপারাবার পার হবার সামর্থ্য আছে কি-না তা ঐভাবে বাহ্যলক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় না, তা বাক্‌পথাতীত।

যারা সহজানন্দ সাধনার সাধক নন, তাঁদের এই ধর্মে প্রবেশ করার অবকাশ নেই। আবার যাঁরা এই আনন্দ বোঝেন, তাঁদেরও গলায় দড়ি—অর্থাৎ তাঁরাও ভাষায় এর ব্যাখ্যা করতে পারেন না ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

মহামুদেরী=মহামুদ্রার। নির্বাণের অন্য নাম মহামুদ্রা। এখানে বক্তব্য, সংসারের অনিত্যতা যখন বুঝেছি, তখনই আমার চিত্ত নির্বাণে আরোপিত, নির্বাণ সাধনার জন্য তখন আলাদা করে আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই ॥ অনুভব সহজ=সহজানন্দ অনুভূতিগম্য, কথায় তাকে প্রকাশ করা যায় না ॥ বাণ্ড কুরুণ্ড= বটুয়া ও কেঁড়ে। অন্য অর্থ, পুরুষাঙ্গ অণ্ডকোষ ॥

॥ চর্যা ৩৮ ॥

॥ সরহপাদ ॥

॥ রাগ ভৈরব ॥

কাঅ ণাবড়ি-খাণ্ডি[1] মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাহী[2]।
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী[3] নৌকা টাগুঅ[4] গুণে।
মেলি মেল সহজেঁ জাইউ ণ আণেঁ ॥
বাটত ভঅ[5] খাণ্ট[6] বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব[7] বি বোলিআ ॥
কূল লই[8] খরসোন্তে[9] উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ পমাএঁ[10] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. খাণ্টি, বাংডি। ২. নাঙ্গ। ৩. নোবাঅ। ৪. টাণঅ। ৫. বাটঅভঅ। ৬. খণ্ট। ৭. যঅ। ৮. লঅ। ৯. খরে সোন্তে। ১০. সমাএ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

কায়রূপ নৌকা, মন বৈঠা ; সদ্‌গুরুবচনেতে ধর পতবাল (হাল)। চিত্ত স্থির

করে তুমি নৌকা ধর, (বা হালের চাকা বা নৌকাগর্ভ ধর), অন্য কোনো উপায়ে নদী পার হওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে, সহজে মিলিত হও, অন্য পথে যেয়ো না। পথে ভয়, দস্যু বলবান; ভবসমুদ্রের উল্লোলে (উচ্ছ্বাসে) সবই বিনষ্ট। কূল অনুসরণ করে খরস্রোতে উজান বেয়ে গেলে, সরহ বলছেন, গগনে (সেই নৌকা) প্রবেশ করে॥

॥ রূপকার্থ ॥

দেহকে নৌকা এবং মনকে বৈঠা করে সদ্‌গুরুর উপদেশকে হাল হিসাবে গ্রহণ করে সাধককে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার নির্দেশ দিচ্ছেন কবি। এছাড়া অন্য পথ নেই। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে, কিন্তু দেহনৌকা ঐভাবে বাহিত হয় না— তার জন্যে প্রধান অবলম্বন সদ্‌গুরুর উপদেশ। সহজপথ ছাড়া অন্য কোনো সাধন-পথ নেই। কিন্তু এ পথেও ভয় আছে। কিসের ভয়? বিষয়াসক্তির ভয়। এই বিষয়াসক্তি জলদস্যুর মতো ভয়ংকর, তার দ্বারা ভবসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয় (disturbed হয়) এবং বিষয়তরঙ্গে নৈরাত্ম নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক রাস্তা ধরে সহজানন্দের পথে যদি যেতে পারা যায়, তবে নৌকা বা এই দেহ গগনসমুদ্রে বা নির্বাণে লীন হতে পারে॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

নাবড়ি-খাণ্ডি=ক্ষুদ্র নৌকাখানি। নাবটি থেকে ক্ষুদ্রার্থে নাবড়ি। খণ্ড থেকে খাণ্ডি (খানি)॥ কেড়ুয়াল=বৈঠা॥ পতবাল=হাল॥ নাহী=হালের চাকী বা নৌকাগর্ভ। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে নৌকা॥ নৌবাহী=নৌবাহক, মাঝি॥ খাণ্ট=দস্যু। খড়্গ>খণ্ড>খণ্ট>খাণ্ট। প্রাচীন বাংলায় খণ্ডাইত অর্থ খড়্গধারী ডাকাত। খণ্ডা অর্থে খড়্গ। খাণ্ট অর্থ খড়্গধারী, যোগরূঢ়ার্থে খড়্গধারী ডাকাত, পরে শুধু ডাকাত॥ সমাঅ<সং সমায়াতি, প্রবেশ করে॥

॥ চর্যা ৩৯ ॥

॥ সরহপাদ ॥

॥ রাগ মালশী ॥

সুইণেঁ[১] হ অবিদারঅ রে নিঅমন তোহোরেঁ দোসে।
গুরু বঅণ-বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড[২] কইসে॥
অকট হুঁ-ভব গঅণা[৩]।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে[৪] ভাঙ্গেল[৫] তোহার বিণাণা॥

অদ্‌ভুঅ[৬] ভব-মোহা রে[৭] দিসই পর অপ্পণা[৮]।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপনা ॥
অমিয়া[৯] আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ-পর[১০]-বস-অপা।
ঘরে পরেঁ[১১] কা বুঝ্‌ঝিলে ম রে[১২] খাইব মই দুঠ-কুণ্ডবাঁ ॥
সরহ ভণই[১৩] বর সুণ গোহালী কিমো দুট্‌ঠ[১৪] বলন্দেঁ[১৫]।
একেলেঁ[১৬] জগ নাশিঅরে বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ[১৭] ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. সুইনা, সুইনে। ২. ঘুণ্ট। ৩. ভবই অণা। ৪. পারে। ৫. ভাগেল। ৬. অদঅভুঅ। ৭. মোহারো। ৮. অপ্যণা। ৯. অমিঅঁ। ১০. পসর। ১১. ঘারে পারে। ১২. মো রে। ১৩. ভণন্তি। ১৪. দুঠ্য। ১৫. বলদেঁ। ১৬. একেলে। ১৭. বিরহুঁ ঈচ্ছন্দ্রেঁ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

ওরে মন, স্বপ্নেও তুমি অবিদ্যারত তোমার নিজের দোষে; গুরুবচন-বিহারে তুমি পর্যটক থাকবে কী করে! আশ্চর্য বা অদ্ভুত হুংকারোদ্ভূত এই গগন, বঙ্গে জায়া হরণ করলে পরে তোর বিজ্ঞান ভেঙে গেল। ওরে, অদ্ভুত এই ভবের মোহ, আপন এবং পর দেখা যায়। এই জগৎ জলবিম্বাকার, সহজে শূন্য হয় আত্মা। অমিয় আছে, তবু ওরে বিষ পান করিস, চিত্ত আত্মা পরবশ। ঘরে পরে কি আছে তা বুঝলে, আমি দুষ্ট আত্মীয়স্বজন ভক্ষণ করব। সরহ বলছেন, বরং দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়ালঘর ভালো, একলা জগৎ নাশ করে আমি স্বচ্ছন্দে বিহার করি ॥

॥ রূপকার্থ ॥

কবি বলছেন, তাঁর মন অবিদ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছে না বলে তাঁর মোহস্বপ্নও দূর হচ্ছে না, বিষয়-বাসনায় তাঁর মন মত্ত।—এখন সেই মনকে সংযত হতে হবে, পর্যটকের মতো বিবাগী হলে চলবে না—মনকে বিহার যদি করতেই হয়, তবে সে যেন সদ্‌গুরুর বচনে বিহার করে—এই তাঁর বক্তব্য। সদ্‌গুরুর বচনই অমূল্য এবং সত্যিকার দিক্‌দর্শক, কারণ সেই উপদেশেই তিনি বুঝতে পেরেছেন অবিদ্যাদোষের আসল রূপটি কী। তিনি সেই অবিদ্যাদোষ ছেড়ে অদ্বয়তত্ত্বে মন নিবিষ্ট করাতেই তাঁর বিষয়-সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর মোহ বিচিত্র, এই মোহই আত্মপরের ভেদ সৃষ্টি করে, কিন্তু সহজানন্দে চিত্ত প্রবিষ্ট হলে জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের মতো জগৎকে অসার বলে বোধ হয়। সহজানন্দ অমৃত আস্বাদন করলে বিষয়-বিষকে নাশ করা যাবে, নিজের দেহেই নৈরাত্মা আছে

এই কথা বুঝলে দুষ্ট আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ দেহজ রাগ দ্বেষ ঘৃণা ইত্যাদিকে ধ্বংস করা যাবে। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, কারণ একটি দুষ্ট গোরুই সব নষ্ট করে দিতে পারে; তেমনি দুষ্ট বিষয়বলের একটাই জগৎ নষ্ট করে দেবার ক্ষমতা রাখে। এই বিষয়বলকে জয় করতে পারলে স্বচ্ছন্দে সহজানন্দে বিহার করা যাবে ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

সুইনে হ=স্বপ্নে-অপি ॥ অবিদারঅ=অবিদ্যারত। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে "শূন্য শাখা বিদীর্ণ" ॥ নিঅমন=নিজমন ॥ ঘুণ্ড=পর্যটক। অকট=আশ্চর্য ॥ হুঁ-ভব= হুংকার-বীজোদ্ভব ॥ বঙ্গে=অদ্বয় বঙ্গালেন। বঙ্গ অঞ্চলে সেই সময়ে বোধ হয় লুটেরা দস্যুর ভয় ছিল, সম্ভবত লুটেরা দস্যু বোঝাতে বঙ্গ শব্দের ব্যবহার। অন্যত্রও দেখি, "অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ" (চর্যা ৪৯)॥ কুণ্ডবাঁ=কুটুম্ব। গুজরাটী কুণবা শব্দটিরও একই অর্থ ॥ দুঠ বলন্দে=দুষ্ট বলদে। দুষ্ট বিষয়ং বলং দদাতি ইতি দুষ্ট বলদ—দুষ্ট বিষয়ে বল দান করে বলে চিত্তকে বলদ বলা হয়েছে ॥

॥ চর্যা ৪০ ॥

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ মালসী গবুড়া ॥

জো মণ-গোএর আলা জালা।
আগম পোথী[১] ঠঠা[২]-মালা ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা[৩] জায়।
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায় ॥
আলেঁ[৪] গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ॥
জেতই[৫] বোলী তেতবি[৬] টাল।
গুরু বোব সে[৭] সীসা কাল ॥
ভনই কাহ্ন জিণ-রঅন বি কইসা[৮]।
কালেঁ বোব[৯] সংবোহিঅ জইসা ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. পোথী, পোথা। ২. ইট্টা। ৩. বোল বা। ৪. আলে। ৫. জে তই, তেজই। ৬. তেতবি। ৭. গুরু বোধসে। ৮. বিকসই সা। ৯. বোবেঁ কাণ।

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

যে মনগোচর তার জন্যেই বিকল্পজাল (বা ইন্দ্রজালের দ্বারা দৃষ্ট বাহ্যজগৎ) ; (তার জন্যেই) আগম-পুথি ইষ্টমালা (জপমালা) ইত্যাদি। বল, কেমন করে সহজ (সহজানন্দ) বলা যায়; কায়-বাক্-চিত্ত যার মধ্যে প্রবেশ করে না ! বৃথাই গুরু উপদেশ দেয় শিষ্যকে ; বাক্যের অতীত যা, তাকে কিসে ব্যাখ্যা করা যাবে ! যতই বলবে ততই ভুল হবে (কিংবা যে তবু বলে সে তবু ভুল করে)—গুরু বোবা, শিষ্য কালা ! কাহ্নুপাদ বলছেন, জিনরত্ন কেমন—(না,) যেমন কালা বোঝায় বোবাকে ॥

॥ রূপকার্থ ॥

যা কিছু মনগোচর বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য সবই বিকল্পাত্মক, তাই যা কিছু আমরা মনের দ্বারা জানি, সবই ইন্দ্রজালের মতো মায়াময়। আগমপুথি শাস্ত্রজ্ঞান—সবই তো মনের দ্বারা আমরা লাভ করি, তা হলে সহজানন্দকেও কি আমরা মনের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারব ! কীভাবে সেই সহজানন্দকে ভাষায় প্রকাশ করবে, কারণ সহজানন্দকে তো মন দিয়ে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অনুভবের সাহায্যে এবং সেই জন্যেই ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। বাক্য দিয়ে যত বলবে, ততই ভুল হবে। এই সহজানন্দকে বোঝানো যায় না বলেই গুরু বোবা—কারণ তিনি বোঝাবার ভাষা পান না, আর শিষ্য কালা, কারণ গুরুর কাছে ভাষায় এর ব্যাখ্যা পেয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে সে কালার অবস্থা পায় ! কাহ্নুপাদের তাই সমস্যা কীভাবে এই বাক্যের অতীত জিনরত্নকে বোঝানো যাবে ? তার উত্তর, বোঝানো যাবে আভাসে ইঙ্গিতে, যেমন বোবা বোঝায় কালাকে—এবং সেই আভাসে ইঙ্গিতেই সহজানন্দকে বোঝা সম্ভব ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

আলাজালা = বিকল্পজাল। তিব্বতী অনুবাদে ইন্দ্রজাল ॥ উএসই = সং. উপদেশং দদাতি। উএস = (উপদেশ) থেকে নামধাতু ॥ টাল = বিচলিত, √টল্ থেকে ॥ জিণরঅণ = জিনরত্ন, অতীন্দ্রিয় সহজানন্দ ॥ কইসা = কীদৃশম্, কেমন ॥

॥ চর্যা ৪১ ॥

॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ কহ্ন গুঞ্জরী ॥

আই অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো[১] পড়িহাই ।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে[২] কিং[৩] বোড়ো খাই ॥

অকট জোইআ রে[৪] মা কর হথা লোহ্লা।
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুট[৫] বাষণা তোরা॥
মরুমরীচি-গন্ধনইরী দাপতি বিম্বু[৬] জইসা।
বাতাবৰ্ত্তেঁ সো দিঢ়[৭] ভইআ অপেঁ পাথর জইসা॥
বান্ধি[৮] সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআতেলেঁ সমরসিংগেঁ[৯] আকাশ[১০] ফুলিলা॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া আচ্ছই[১১] ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু-পাব॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. ভাংতি এঁসো। ২. সাচে। ৩. কিং তং, কিং কং; ৪. অকট বিচারে রে, অকট জোই রে। ৫. তুটই। ৬. দাপতিবিম্বু, চাঁদ পতিবিম্বু, দাপণবিম্বু। ৭. দিট। ৮. বান্ধি। ৯. সসরু-সিংগে। ১০. আকাশই। ১১. অচ্ছসি॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

আদৌ অনুৎপন্ন এই জগৎ, ভ্রান্তিতে সে প্রতিভাত। রাজসাপ দেখে যে চমকায় (বা রজ্জুসর্প দেখে যে ভয় পায়), তাকে কি সত্যি সত্যিই বোড়ো সাপে কামড়ায়! আশ্চর্য (এই জগৎকে দেখে) হে যোগি, হাত লবণাক্ত কোর না, এই জগৎকে যদি তার স্বভাবে চিনতে পার (তবেই) তোমার বাসনা টুটবে। মরুমরীচিকা গন্ধর্বনগরী দর্পণের যেমন প্রতিবিম্ব, বাতাবর্তে সেই জল যেমন দৃঢ় হয়ে পাথর হয়, বন্ধ্যার পুত্র যেমন খেলা করে—খেলা করে বহুবিধ খেলা, বালুতেলে আর শশ শৃঙ্গে (সজারু শৃঙ্গে) আর আকাশ-ফুল নিয়ে, রাউত বলেন, ভুসুকু বলেন সকলেই এই স্বভাব। যদি তুই ভ্রান্তিতে থাকিস মূঢ়, তবে সদ্গুরু পদে জিজ্ঞাসা কর॥

॥ রূপকার্থ ॥

যাঁরা সত্যিকারের তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা জানেন, এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নি, নিতান্তই ভ্রান্তিবশত মানুষের মনে জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়। দড়ি দেখে সাপ বলে ভুল হাত পারে, কিন্তু সত্যি সত্যি সে সাপের মতো দংশন করে না, সেই রকম জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় মিথ্যা জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সেই সংসার অসার। তাই যোগীকে সাবধান করে দিচ্ছেন কবি, এই অসার সংসারে হাত লোনা কোর না, অর্থাৎ নিজেকে বিব্রত কোর না—জগৎ যে মিথ্যা এই ধারণা যদি মনে গেঁথে নিতে পারো, জগতের স্বভাব যদি তুমি জানতে পারো, তবে জাগতিক সব বাসনাই

তোমার মন থেকে চলে যাবে। আসলে এই সংসার মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী এবং দর্পণদৃষ্ট প্রতিবিম্বের মতো অলীক; ঘূর্ণাবর্তে উত্থিত জলস্তম্ভকে যেমন পাষাণ বলে ভুল হয়, সংসারও তেমনি ভ্রান্তি মাত্র। বন্ধ্যাপুত্র নানারকম জিনিস নিয়ে খেলা করছে—এ যেমন হাস্যকরভাবে মিথ্যা—বালির তেল, শশকের শৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম যেমন অলীক—সংসারও তেমনি মিথ্যা। ভুসুকুপাদ বলছেন, জগতের সব জিনিসই এই রকম মিথ্যা—যদি কেউ একথা বুঝতে না পারে, তার উচিত কোনো সদ্গুরুকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া॥

॥ **শব্দার্থ ও টীকা** ॥

আই অণুঅনা এ জগ রে=আদৌ অনুৎপন্ন এই জগৎ ওরে॥ ভাংতিএঁ= ভ্রান্তি>ভাংতি+তৃতীয়ার 'এন' জাত এঁ>ভাংতিএঁ॥ পড়িহাই=প্রতিভাসতে॥ দাপতি বিম্বু=দর্পণ-প্রতিবিম্ব॥ বালুআ তেলেঁ=বালির থেকে তেল পাওয়া যেমন অসম্ভব সেই রকম॥ সসর সিংগে=শশকের শৃঙ্গ নেই, কিন্তু অজ্ঞ লোক তার লম্বা কান দেখে সেগুলিকেই শৃঙ্গ বলে ভুল করে॥

॥ **চর্যা ৪২** ॥

॥ **কাহ্নুপাদ** ॥

॥ রাগ কামোদ ॥

চিঅ সহজে শূণ[১] সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্নু নাহি।
ফরই[২] অনুদিনং তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ[৩] নাঠ দেখি কাঅর।
ভাঙ্গ তরঙ্গ[৪] কি সোসঈ সাঅর[৫]॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় চ্ছন্তে ণ[৬] দেখই॥
ভব জাই ণ আবই এথু[৭] কোই।
আইস ভাবে[৮] বিলসই কাহ্নিল জোই॥

॥ **পাঠান্তর** ॥

১. শূন্য, শূনে। ২. ফুরই। ৩. দিঢ়। ৪. ভাগ তরঙ্গ। ৫. সারঅর। ৬. নচ্ছংতেঁ, অচ্ছন্তে ণ। ৭. এখু। ৮. ভবে॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

চিত্ত সহজাবস্থায়, শূন্য সম্পূর্ণ। স্কন্ধের বিয়োগে বিষণ্ণ হয়ো না। কিসে কাহ্নু নেই বল, অনুদিন সে ত্রৈলোক্যে প্রবেশ করে স্ফুরিত। দৃষ্ট বস্তু নষ্ট দেখে মূঢ়েরা কাতর, ভঙ্গ তরঙ্গ কি সমুদ্র শুষে ফেলে! মূঢ় ব্যক্তিরা দেখে না যে লোকরা আছে, দুধের মধ্যে স্নেহপদার্থ (সর) থাকলেও দেখতে পায় না। এই ভবে কেউ আসেও না, যায়ও না; এমন ধারণা নিয়ে বিলাস করেন কাহ্নুপাদ ॥

॥ রূপকার্থ ॥

কাহ্নুপাদ সিদ্ধাবস্থায় প্রবিষ্ট, তাঁর চিত্ত সহজাবস্থায় বা অচিত্ততায় লীন, শূন্যতার সাধনা সম্পূর্ণ। পঞ্চস্কন্ধ বিয়োগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ রূপ বেদনাদি অবলুপ্ত—এই অবস্থায় কাহ্নুপাদের জন্য বিষণ্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি সমগ্র ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট। একবিন্দু জল যেমন মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে অসীমতায় লীন হয়ে যায়, তিনিও সহজাবস্থায় সেই দশা প্রাপ্ত। দৃষ্ট বস্তু নষ্ট হচ্ছে দেখে মূর্খেরা কাতর হয়, কিন্তু তাতে কাতর হবার কিছু নেই, কারণ সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে সমুদ্রেই মিলিয়ে যায়, সমুদ্রকে তা গ্রাস করতে পারে না—সেই রকম রূপের অপচয়ে বিলোপের পরিকল্পনা ভ্রম মাত্র। দুধের মধ্যে যেমন স্নেহপদার্থ প্রচ্ছন্ন, তেমনি অভাবের মধ্যেই ভাব লুকানো। পৃথিবীতে কিছু আসেও না, যায়ও না,—সবই আমাদের মোহ এবং ভ্রান্তি। পৃথিবীর এই স্বরূপ কৃষ্ণাচার্য বুঝেছেন বলে তিনি পৃথিবীতে সুখে বিলাস করছেন; তাঁর বাঁধা পড়ার ভয় নেই ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

কান্ধবিয়োএ = রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের বিয়োগে। ফরই অনুদিনং = অনুদিনং স্ফুরতি ॥ তৈলোএ পমাই = ত্রৈলোক্যে প্রবেশ করে ॥ লড় = স্নেহপদার্থ, সর ॥

॥ চর্যা ৪৩ ॥

॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ বঙ্গাল ॥

সহজ মহাতরু ফড়িঅএ তৈলোএ[১]।
খসমসভাবে রে বান্ধ-মুকা[২] কোএ ॥
জিম জলে পাণআ টলিআ ভেউ[৩] ন জাঅ।
জিম মণরঅণা[৪] রে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥
জাসু নাহি[৫] অপ্পা তাসু পরেলা[৬] কাহি।
আই অনুঅণারে জামমরণ ভব নাহি ॥

ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
এথু[৭] জাই ণ আবয়ি রে ণ তংহি ভাবাভাব ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. তেলোএ। ২. বাণত কা, বাণ মূকা। ৩. ভেড়। ৪. মরণ অঅনা। ৫. যৎপুণাহি। ৬. অধ্যাতা স্বপরেলা, আত্মা তাসু পরেলা। ৭. ছন্দের খাতিরে এথু ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

সহজ মহাতরু স্ফুরিত এ ত্রৈলোক্যে, খসমস্বভাবে (শূন্যতা স্বভাবে) কে বন্ধন মুক্ত (কে বদ্ধ কে মুক্ত, কিংবা কে না বন্ধনমুক্ত)। যেমন জলে জল মিশে গেলে আলাদা করা যায় না, তেমনি ওরে মনরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে। যার আত্মা নেই তার পর কোথায়, আদৌ অনুৎপন্ন যা তার জন্মমরণ নেই। ভুসুকু বলেন, রাউত বলেন সকলই এই স্বভাব, গমনাগমনহীন পৃথিবীতে কিছু ভাবাভাব নেই ॥

॥ রূপকার্থ ॥

সহজানন্দরূপ মহাতরু স্ফুরিত হয়ে ত্রৈলোক্যে বিস্তৃত। সেই সহজানন্দে যাঁর চিত্ত অচিত্ততায় লীন, তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত, তখন মনোরত্ন সমরসতায় মিশে যায়, যেমন জলে জল মিশে যায়। তখন সাধকের আত্মপর ভেদজ্ঞান লুপ্ত। পৃথিবী আদৌ উৎপন্ন হয় নি এই বোধ জন্মানোর ফলে জন্মমৃত্যুর কল্পনাও বিলুপ্ত। পৃথিবীতে কিছুই আসে না, যায়ও না—সবই ভ্রান্তি মাত্র, ভাই ভুসুকু বলছেন, পৃথিবীতে ভাবাভাব কিছু নেই ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

খসমসভাবে = খসমোপম-সুখস্বভাবেন, মহাসুখময় শূন্যতা-স্বভাবে ॥ গঅণ সমাত্ম = গগনে সমাহিত ॥

॥ চর্যা ৪৪ ॥

॥ কঙ্কণপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅল-ধাম উইআ তবেঁ ॥
আচ্ছহুঁ[১] চউখন সংবোহী।
মাঝে নিরোহ[২] অণুঅর বোহী ॥

বিন্দুণাদ[৩] ণ হিএঁ[৪] পইঠা।
অণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥
জথাঁ[৫] আইলেসি তথা জান।
মাঝেঁ[৬] থাকী সঅল বিহাণ ॥
ভণই কঙ্কণ কলএল-সাঁদে।
সর্ব্ব বিচ্ছরিল[৭] তথতা[৮] নাদেঁ ॥

॥ **পাঠান্তর** ॥

১. আছ, আছই। ২. নিরোহেঁ। ৩. বিতুণাদ। ৪. নহি এঁ। ৫. জঠীং। ৬. মাসং। ৭. চুরিল, শুনিল। ৮. তধতা ॥

॥ **আধুনিক বাংলায় রূপান্তর** ॥

শূন্যের সঙ্গে শূন্য যখন মিলে গেল, তখন সকল ধর্ম উদিত হল। চতুঃক্ষণ (আমি) রয়েছি সংবোধিতে, মধ্যের নিরোধে (আমার) অনুত্তর বোধি হল। বিন্দুনাদ আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হল না; এক দিক চাইতে অন্য দিক বিনষ্ট হল। যেখান থেকে তুমি এলে তাকে জান; মাঝে থেকে সমস্ত বিধান। কলকল শব্দে কঙ্কণপাদ বলছেন, তথতা-নাদে সমস্তই বিচূর্ণ হল ॥

॥ **রূপকার্থ** ॥

শূন্যের সঙ্গে শূন্য, অর্থাৎ সহজমতে স্বাধিষ্ঠানশূন্যের সঙ্গে যখন প্রভাস্বরশূন্যতা মিলিত হয়, তখন বস্তুজগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে সকল ধর্মের সার মহাসুখ লাভ হয়। কবি সেই অবস্থায় উপনীত হয়ে চরমতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন, তখন গ্রাহ্যগ্রাহকভাব বিনষ্ট এবং দৃশ্যাদির উপলব্ধি না হওয়ায় চিত্তের অনুভব শক্তিও বিলুপ্ত। পরমার্থ বোধিচিত্ত থেকে সাধকের জন্ম তা তাঁকে অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে, আর চিত্ত থেকে বিষয়বিকল্প দূর করে মহাসুখ ভোগ করতে হবে। এই তথতা বা অতীন্দ্রিয় ধর্মে অন্যান্য সমস্ত মতবাদ চূর্ণ হয়ে যায়—এই কথাই কঙ্কণপাদ বলছেন ॥

॥ **শব্দার্থ ও টীকা** ॥

সুনে সুন = স্বাধিষ্ঠানশূন্যের সঙ্গে প্রভাস্বরশূন্যতার মিলনে ॥ সকল ধাম = সকল ধর্ম, যাবতীয় বস্তুজগৎ ॥ মাঝ নিরোহেঁ = সং. মধ্যমা নিরোধে, দৃশ্যাদির অস্তিত্বের জ্ঞান নিরোধ ॥

॥ চর্যা ৪৫ ॥

॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আশা বহল[১] পাতহ বাহা[২] ॥
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ[৩] ॥
বাটই[৪] সো তরু সুভাসুভ পানী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥
জো-তরু-ছের ভেবউ ণ[৫] জাণই[৬]।
সড়ি পড়িআঁ[৭] রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥
সুন তরুবর[৮] গঅণ কুঠার।
ছেবই সো তরু মূল ন ডাল ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. বহন। ২. পাত ফলাহা, পাত ফলবাহা। ৩. উইজউ। ৪. বাঢ়ই। ৫. ভেব নউ। ৬. জাইণ, জানই। ৭. পরিআ। ৮ সুতরু, সুন তরুবর ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

মন তরু, পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার ডাল, আশারূপ বহুল পত্রবাহী (বা, আশারূপ বহুল পত্রফলবাহী)। সদ্‌গুরু বচনরূপ কুঠারে তাকে ছেদ কর ; যাতে, কাহ্নুপাদ বলছেন, তরু আবার না জন্মাতে পারে। সেই তরু শুভ অশুভ জলে বৃদ্ধি পায় ; গুরু উপদেশে (প্রমাণে) সেই তরুকে বিজ্ঞজন ছেদন করে। যে ব্যক্তি তরুচ্ছেদের রহস্য জানে না, ওরে মূঢ় সরে পড়ে (খিন্ন হয়ে) তারাই সংসারকে মেনে নেয়। শূন্য তরুবর, গগন কুঠার। কেটে ফেল সেই তরু যাতে তার মূল ডাল কিছুই না থাকে ॥

॥ রূপকার্থ ॥

মন হচ্ছে তরু, পঞ্চেন্দ্রিয় তার শাখা, বাসনাগুলি তার পাতা এবং ফল। সদ্‌গুরুর উপদেশ হচ্ছে কুঠার—সেই উপদেশের কুঠারে এমনভাবে মনতরুকে ছেদন করতে হবে যেন সে আবার উৎপন্ন হতে না পারে। অর্থাৎ সদ্‌গুরু উপদেশে মনের বিকারগুলিকে এমনভাবে ধ্বংস করতে হবে যাতে সেই বিকারগুলি আবার জেগে উঠতে না পারে। এই চিত্ততরু শুভ-অশুভ জলসেকে বা

পাপপুণ্যের জলসেকে মনের ভূমিতে উৎপন্ন হয়। গুরুর উপদেশে সাধক তাকে এমনভাবে ছেদন করবেন যাতে সেই মনতরু আর বাড়তে না পারে। যারা সেই তরুচ্ছেদের রহস্য জানে না, তারা মোক্ষমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সংসারের দুঃখে পতিত হয়। কাহ্নুপাদ তাই অবিদ্যার, মনোবিকারের তরুকে এমনভাবে প্রভাস্বর কুঠারের দ্বারা ছেদন করতে বলছেন যাতে চিত্ত আর ইন্দ্রিয়াধীন না হতে পারে ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

মণ তরু = মন-রূপ তরু। অন্যত্র (চর্যা ১) দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ॥ আসা বহল—আশা বা বাসনা-বহুল ॥ সুভাসুভ = পাপ-পুণ্য ॥ সরি পড়িআঁ = সরে পড়ে, অর্থাৎ মোক্ষমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয় ॥

॥ চর্যা ৪৬ ॥

॥ জয়নন্দী ॥

॥ রাগ শবরী ॥

পেখই [১] সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ[২] তইসা ॥
মোহ[৩]-বিমুক্কা জই মণা[৪]।
তবেঁ তুটই অবণা গমণা ॥
নৌ[৫] দাটই[৬] নৌ তিমই ন ছিজ্জই।
পেখ মাঅ[৭] মোহে বলি বলি বাঝই ॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা।
বিণি[৮] পাখেঁ সোই বিণাণা[৯] ॥
চিঅ তথতাস্বভাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ[১০] ণ হোই ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. পেখ। ২. মোহ, সোভব। ৩. মোদ। ৪. মানা। ৫. নো। ৬. দাড়ই। ৭. মোঅ। ৮. বেণি। ৯. বিণা, বিণাণা, বিনানা। ১০. ফুড়অন, ফুড় অন ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

স্বপ্নে যেমন অদৃষ্ট (বা দর্পণ) দেখ, অন্তরালে মোহ (বা সংসার) তেমনি। যদি মন মোহবিমুক্ত হয়, তবে গমনাগমন টুটে যায়। না পোড়ে, না ভেজে, না ছিন্ন হয়; (তবু) দেখ বারবার মায়ামোহে সে বদ্ধ। ছায়া মায়া কায়া সমান;

বিনা পক্ষে (বা দুই পক্ষে) সেই বিশেষ জ্ঞান। চিত্তকে তথতাস্বভাবে শোধন কর। জয়নন্দী বলছেন, স্পষ্ট করে, অন্য কিছুতে নয়॥

॥ রূপকার্থ ॥

দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন অলীক, অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞানও তেমনি আমাদের চিত্তের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। মনের এই বিকার নষ্ট হলে তবেই সংসারে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়। এই চরম মোহমুক্ত মনকে ক্রোধের আগুন দগ্ধ করতে পারে না, শোকের অশ্রুজল ভেজাতে পারে না, বেদনার অস্ত্র ছেদন করতে পারে না! অথচ আশ্চর্য এই, তবুও লোকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে না। যাঁরা তা পেরেছেন তাঁদের কাছে অবাস্তব ছায়া, মায়া এবং এই দেহ—সব সমান, সব অস্তিত্বহীন। আত্মপরভেদ লুপ্ত হয়ে তখন তাঁরা সত্যিকার বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তথতা স্বভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ হলে তা আর বিচলিত হতে পারে না॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অদশ=অদৃষ্ট বা অন্য অর্থে আরশি॥ বিণি পাখেঁ=বিনা পক্ষে। টীকা অনুযায়ী 'বেণি' ধরলে 'দুই পক্ষে' অর্থাৎ আত্ম ও পর॥ ফুড় অণ ণ হোই—চিত্ত বাধা প্রাপ্ত হয় না॥

॥ চর্যা ৪৭ ॥

॥ ধামপাদ ॥

॥ রাগ গুঞ্জরী ॥

কমল-কুলিশ মাঝে ভই ম মিঅলী[১]।
সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী॥
ডাহ[২] ডোম্বী-ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর[৩] লই সিঞ্চহুঁ[৪] পাণী॥
নউ খর[৫] জালা ধূম ন দিশই।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই॥
দাটই[৬] হরি-হর-বাহ্ম ভড়ারা[৭]।
দাটা[৮] হই ণবগুণ শাসন পড়া॥
ভণই ধাম ফুড় লেহুঁ রে[৯] জাণী।
পঞ্চনালে উঠি[১০] গেল পাণী॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. মাইঅ গিঅলী। ২. দাহ। ৩. সহ ষলি, সসহরঁ। ৪. সিঞ্চহু। ৫. খড়। ৬. ফাটই। ৭. ভরা। ৮. ফীটা। ৯. লেঙ্গুরে। ১০. উঠে॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

কমল কুলিশ মাঝে আমি মিলিত হলাম, সমতা-যোগে চণ্ডালী প্রজ্বলিত। ডোম্বী ঘরে দাহ, আগুন লেগেছে, শশধর নিয়ে জল সিঞ্চন কর। খরজ্বালা, ধোঁয়া দেখা যায় না। সুমের শিখর নিয়ে গগনে প্রবেশ করে। হরিহর ব্রহ্মা ঠাকুর সব পুড়ছে, নয় ফলকবিশিষ্ট তাম্রশাসনপট্ট (কিংবা উপবীত ও তামার শাসনপট্ট) পুড়ে গেল। ধামপাদ বলছেন, স্পষ্ট করে জেনে নিলাম, পঞ্চনালে জল উঠে গেল॥

॥ রূপকার্থ ॥

প্রজ্ঞা ও উপায়রূপ কমল কুলিশের মিলনে কবি মহাসুখে বা সহজানন্দে প্রবিষ্ট। এই অবস্থায় চণ্ডালীরূপিণী কবির বিষয়ানুভূতি দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিশুদ্ধ চিত্তরূপ জল সিঞ্চনে সেই বিষয়ানুভূতির আগুন নেভাতে হবে। সাধারণ আগুনে খরজ্বালা, ধূম-শিখা দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানবহ্নির এসব বাহ্যিক লক্ষণ নেই। এই জ্ঞানবহ্নিতে সমস্ত দ্বৈতভাব এবং নবগুণ বা নয় প্রকার প্রাণবায়ু দগ্ধ হয়ে যায়। ধামপাদ বলছেন, তিনি এই মুক্তিতত্ত্ব স্পষ্টভাবে জেনেছেন, তাঁর পঞ্চনাল দিয়ে নির্বাণজল উর্ধ্বে উত্থিত হয়েছে॥

॥ চর্যা ৪৮ ॥

এই চর্যাটির রচয়িতা কুক্কুরীপাদ এবং রাগ পটমঞ্জরী, এইটুকুই জানা গিয়েছে। মূল চর্যাপদটি পাওয়া যায় নি। অবশ্য এই চর্যাগীতিটির বৃত্তিকৃত টীকা এবং তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে একটি পাঠও পরিকল্পনা করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য "চর্যাগীতি-পদাবলী"—ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ১১০)। এখানে তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে চর্যাগীতিটির আধুনিক বাংলায় রূপান্তর দেওয়া হল॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

বজ্রনিদ্রায় নিমগ্ন সমতাযোগে যুক্ত সেনামণ্ডলী। বিষয় ইন্দ্রিয়ের দুর্গগুলি জেতা হল, শূন্যে মহাসুখ রাজা হলেন। তূর্য শঙ্খ ইত্যাদির ধ্বনি অনাহত গর্জন করল, সংসার-মোহরূপ সৈন্য দূরে পালাল। সুখ নগরীতে প্রধান স্থান (অগ্রবর্তী স্থান) সব জয় করা হল। উর্ধ্বে আঙুল তুলে কুক্কুরীপাদ বলছেন, এই ত্রিলোকে সব মহাসুখের দ্বারা গৃহীত হল ; এই অর্থ (তত্ত্ব) কুক্কুরীপাদ নিনাদ করে বললেন॥

॥ চর্যা ৪৯ ॥

॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

বাজ[১] ণাব পাড়া[২] পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে[৩] ক্লেশ[৪] লুড়িউ ॥
আজি ভুসুকু[৫] বঙ্গালী[৬] ভইলী।
ণিঅ ঘরিনী চণ্ডালেঁ[৭] লেলী ॥
দহিঅ[৮] পঞ্চ পাটণ ইন্দি-বিসআ[৯] ণঠা।
ন জানমি[১০] চিঅ মোর কহিঁ গই গইঠা ॥
সোণ রুঅ[১১] মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ[১২] ॥
চউ-কোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস[১৩]।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. রাজ। ২. পাড়ী। ৩. বঙ্গালে, দঙ্গাল। ৪. দ্রেশ, দেশ। ৫. ভুসু। ৬. বঙ্গালি। ৭. চণ্ডালী, চণ্ডালে। ৮. ডহি জো, উডি জো। ৯. পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা, 'পঞ্চধাত শ ইন্দিবিসআ'। ১০. জাণসি। ১১. সোণত রুঅ। ১২. বুড়িউ। ১৩. লই অশেষ ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়ে পদ্মা-খালে বাওয়া হল, নির্দয় দস্যু ক্লেশ লুঠ করে নিয়ে গেল (বা দেশ লুঠ করে নিয়ে গেল)। ভুসুকু, আজ তুমি বাঙালী হলে, নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিয়ে গেল (বা, চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করলাম)। দগ্ধ হল পঞ্চপাটন, ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিনষ্ট; জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়ে প্রবেশ করল। সোনারূপা আমার কিছুই থাকল না, নিজের পরিবারে মহাসুখে থাকলাম। আমার চৌকোটি (চার কোটি) ভাণ্ডার নিয়ে শেষ করল, জীবনে মরণে (ইতর) বিশেষ নাই ॥

॥ রূপকার্থ ॥

প্রজ্ঞার পদ্মখালে, বজ্ররূপ নৌকা বেয়ে গিয়ে চিত্ত শূন্যতার মিলনে মহানন্দে প্রবেশ করল। অদ্বয়জ্ঞানরূপ জলদস্যু সমস্ত ক্লেশ লুঠ করে নিয়ে গেল; আজ ভুসুকু সত্যিকারের ধ্যানপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, নিজের অপরিশুদ্ধ চিত্তকে প্রভাস্বর

প্রকৃতিতে পরিস্রুত করে নিয়েছেন। রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ এবং ইন্দ্রিয়ের কামনাবাসনা সব দগ্ধ, এই নির্বিকল্পজ্ঞানের উদয়ে তাঁর চিত্ত কোথায় প্রবেশ করেছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সোনা রূপা বা শূন্যতা ও রূপের জগতের ধারণা সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—এখন তিনি সর্বশূন্যতায় লীন। এই অবস্থায় চার রকম বিচারবুদ্ধি অবলুপ্ত—তিনি বুঝতে পারছেন, অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে জীবনে মরণে কোনো ভেদজ্ঞান থাকে না।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

বাজ্‌ ণাব=বজ্রনৌকা॥ পউআঁ খালে=প্রজ্ঞারূপপদ্ম বিকশিত হয়েছে এমন খালে॥ অদঅদঙ্গালে=নির্দয় দস্যু (বোম্বেটে, নিঃস্ব, ভবঘুরে)। তুলনীয় "দঙ্গালিয়া যোগী"—"ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়"—অক্ষয়কুমার দত্ত॥ ণিঅ ঘরিনী=অপরিশুদ্ধ নিজপ্রকৃতি॥ চউ-কোড়ি=চতুষ্কোটি, সৎ, অসৎ, ন সৎ ন অসৎ, সদসৎ—এই চাররকম বিকল্প॥

॥ চর্যা ৫০ ॥

॥ শবরপাদ ॥

॥ রাগ রামক্রী ॥

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী[১] হিএঁ[২] কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে সুঘাড়ী[৩]॥
ছাড়[৪] ছাড় মাআ-মোহা বিষমে দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী[৫]॥
হেরি ষে মেরি তইলা বাড়ি খসমে[৬] সমতুলা।
যুকড়[৭] এবে[৮] রে কপাসু[৯] ফুটিলা[১০]॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না[১১] বাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ[১২]॥
কঙ্গুচিনা[১৩] পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা[১৪]॥
চারিবাসে গড়িল[১৫] রে[১৬] দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা[১৭] কান্দই[১৮] সগুণ[১৯] শিআলী॥
মারিল[২০] ভবমত্তা রে দহ-দিহে দিধলী বলী[২১]।
হেরি সে[২২] সবরো[২৩] নিবেরবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী॥

॥ পাঠান্তর ॥

১. বাড্‌ডী, বাঢ়ী। ২. হেঞ্চে। ৩. উপাড়ী। ৪. ছাড়ু। ৫. সুণমে হেলী। ৬. খঃসমে। ৭. মুকড়এ সেরে, মুকড় এসে রে। ৮. ইদানীং অর্থে এবে। ৯. কপাসঁ এবে রে মুকড় ফুটিলা। ১০. ফুলিটিলা। ১১. জোহ্ন। ১২. ফুলিলা। ১৩ কঙ্গুরি না। ১৪. ভোলা। ১৫. ভাইলা। ১৬. রেঁ। ১৭. হকএলা। ১৮. কান্দশ। ১৯. সগুণা। ২০. মরিল। ২১. দিধ লিবলী। ২২. হে রসে, হেরে যে। ২৩. শবরী ॥

॥ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ॥

গগনে গগনে তদ্‌লগ্ন (তৃতীয়) বাড়ি, হৃদয়ে কুঠার ; কণ্ঠে নৈরামনি বালিকা, জাগে সুগঠিত। ছাড় ছাড় মায়ামোহরূপ বিষম দ্বন্দ্ব, মহাসুখে বিলাস করে শবর শূন্যতা-মেয়েকে নিয়ে। সেই আমার তদ্‌লগ্ন (তৃতীয়) বাড়ি খসমের সমতুল, চমৎকার (কী সুন্দর) রে কার্পাস ফুল ফুটল। তদ্‌লগ্ন (তৃতীয়) বাড়ির চারপাশে জ্যোৎস্না, তখন দূর হল অন্ধকার, আকাশকুসুমের (মতো)। কংনি দানা পাকলো রে, শবরশবরী মাতলো ; দিনের পর দিন শবর মহাসুখে ভোর থাকার জন্য কিছুই টের পায় না। চার বাঁশে (খাট) গড়ল রে চেঁচাড়ি দিয়ে, তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল, কাঁদল শকুন শৃগালী। সংসার-মত্ত মরল ওরে, দশদিকে শ্রাদ্ধপিণ্ড দেওয়া হল, এই শবর নির্বাণ পেল, শবরত্ব ঘুচে গেল ॥*

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

তইলা = তৃতীয়া বা তদ্‌লগ্ন ॥ নৈরামণি = নৈরাত্মা দেবী ॥ বিষম দুন্দোলী— বিষম দ্বন্দ্ব বা গ্রন্থি ॥ মেহেলী = কন্যা। মেহেরী থেকে হলে অন্তঃপুর ॥ মুকড় = সু + কৃ থেকে সুকর, সুন্দর ॥ কপাসু = কার্পাস ; 'প্রভাস্বর হেতু কার্পাসের মতো শুভ্রবর্ণ বলে চতুর্থ শূন্যকে কাপাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে'—৺মণীন্দ্রমোহন বসু ॥ তাএলা = তদ্ বেলা, তখন ॥ চঙ্কালী = বাঁশের চাঁচাড়ি ॥ বলী = শ্রাদ্ধপিণ্ড ॥

* রূপকার্থের জন্য পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য ॥

॥ শব্দসূচী ॥

[শব্দগুলির পাশে যে-সংখ্যা দেওয়া আছে তার দ্বারা চর্যার সংখ্যা বোঝাচ্ছে। যেমন, ২৯ অর্থ ২৯নং চর্যায় ঐ শব্দটি আছে। আধুনিক বাংলা শব্দের সঙ্গে যেগুলির খুব মিল আছে সেগুলি দেওয়া হোল না।]

অইস ৪১। <ঈদৃশ। এমন ॥

অইসন ২। অইসন এবং অইসনি একই অর্থ। এমন, এইরকম ॥

অইসসি ১০। সং. আবিশসি>আই-সসি>অইসসি। আসে ॥

অকট ৩১, ২৯। আশ্চর্য, বিস্ময়কর ॥

অকাশ ৫০। আকাশ ॥

অকিলেসেঁ ৯। সং. অক্লেশেন। অক্লেশে ॥

অগে ১৫। অগ্রে ॥

অঙ্কবালী ৪। আলিঙ্গন ॥

অচার ২১। চংক্রমণ, যোগাচার ॥

অচারে ১১। আচারেণ>অচারেঁ ॥

অচ্ছ ৩৭। সং. √অস্>প্রাকৃত অচ্ছ >বাংলা আছ্। অনুজ্ঞা বা বর্তমানে আছ ॥

অচ্ছই ৪১। আছে, থাকে ॥

অচ্ছন্তে ৪২। থাকতে ॥

অচ্ছম ২০। আছি। √অস্ ॥

অচ্ছসি ৪১। আছিস বা আছ ॥

অচ্ছহু ৬। আছ বা আছিস ॥

অচ্ছিলেস ৩৭। ছিলে। √অস্, অতীত কাল, মধ্যমপুরুষ ॥

অচ্ছিলেঁ ৩৫। ছিলাম। √অস্, অতীত কাল, উত্তমপুরুষ ॥

অট ১৫। আট। সং. অষ্ট থেকে ॥

অঠক মারী ১৩। আটকে মেরে ॥

অঠ-কমারী ১৩। আট কামরা সংবলিত। কমারা বা আধুনিক বাংলায় কামরা এসেছে গ্রীক Komora থেকে ঈরানীয় ভাষার মাধ্যমে ॥

অণ ৪৪, ৪৬। অন্য ॥

অণহ ১৬, ১৭, ২৫। অনাহত, যোগ সাধনার অশ্রুতধ্বনি ॥

অণুঅনা ৪১। অনুৎপন্ন ॥

অনুঅর ৪৪। যার উপরে আর নেই। সং. অনুত্তর থেকে ॥

অদঅ ৪৯। দয়াহীন বা অদ্বয় ॥

অদঅভুঅ ৩৯। অদ্ভুত ॥

অদভুআ ৩০। ঐ ॥

অদশ ৪৬। আরশি, অদৃষ্ট।

অধরাতি ২৭। অর্ধরাত্রি ॥

অন ৩৮। অন্য ॥

অনহা ১১, ২৫। দ্রষ্টব্য অণহ॥

অনাবাটা ১৫। যে আর ফিরে আসে না। সং. অনাবর্ত্তক। উপনিষদেও আছে 'ন স পুনরাবর্ত্ততে'॥

অনুত্তরসামী ৫। সং. অনুত্তরস্বামী। যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাঁই আর নেই॥

অন্তউড়ী আন্তউড়ী ২০। Placenta বা গর্ভের ফুল (ডঃ সেন)। সং. অন্তঃস্ফুটি। বাংলায় আঁতুড় ঘর॥

অন্ধারী ৫০, ২১। অন্ধকার। স্ত্রীলিঙ্গে অন্ধারী। তুলনীয় বাংলা 'আলো-আঁধারি'॥

অপতিঠান ৩১। অপ্রতিষ্ঠান। যার প্রতিষ্ঠান নেই। পাঠান্তরে অপইঠান॥

অপনা ৬। নিজের (৬ষ্ঠী) ২৬ নং চর্যায় নিজেকে (কর্ম)। ৩৯ নং চর্যায় নিজে, স্বয়ং (কর্তা)॥

অপণে ৩, ২২, ৩২, ৩৭। নিজের দ্বারা (করণ)॥

অপা ৩১, ৩২, ৩৯। আত্মা। আত্মা >আত্‌পা>অপ্‌পা>অপা॥

অপ্‌পনা (অপ্যণা) ৩৯। দ্রষ্টব্য আপনা॥

অপ্‌পা ৪৩। দ্রষ্টব্য অপা॥

অপেঁ ৪১। জল দিয়ে (করণ), জল থেকে (অপাদান), অপ+এন॥

অভাগে ৩৫। সং. অভাগ্যেণ। অভাগ্যের দ্বারা॥

অভাব ২৯। অনুৎপত্তি॥

অভিন বারেঁ (অভিন-চারেঁ) ৩৪। অভিন্নাচারেণ, অভিন্ন আচারের দ্বারা (করণ)॥

অমন ২১। মনহীন॥

অমিঅ (অমিঅঁ) ৩৯। অমৃত॥

অমিয়া ৩৯। ঐ॥

অম্‌ভে ২২। অস্মাভিঃ। আমরা, আমি॥

অরু ৪। রাগিণীর নাম॥

অলখ, অলক্ষ ৩৪। অলক্ষ্য॥

অলক্‌খ ১৫। ঐ॥

অবকাশ ৩৭। স্থান॥

অবণাগমণ ৩৬। অবণাগমণা ২১, ৪৬, ৭, অবণাগবণ ৩৬। আনাগোনা॥

অবধূই ২৭, অবধূতী ১৭। শরীরের তিনটি প্রধান নাড়ীর অন্যতম॥ "বামনাসাপুটে চন্দ্রপ্রজ্ঞা সভাবেন ললনা স্থিতা দক্ষিণ নাসাপুটে উপায় সূর্যস্বভাবেন রসনাস্থিতা। অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা।" বাঁদিকে চন্দ্র বা প্রজ্ঞা বা ইড়া (অমৃতধারাবাহী); ডান দিকে বিষধারাবাহী সূর্য বা রসনা বা পিঙ্গলা; মধ্যদেশে শুক্রবাহী অবধূতী বা সরস্বতী বা মহাসুখাধার॥

অবর ১০, ৩৪। অপর॥

অবসরি ৩২। অপসৃত॥

অবিদারঅ ৩৯। অবিদারত॥

অবিদ্যাকরী ৯। অবিদ্যারূপ হস্তী॥

অহনিসি, অহিনিসি ১৯। অহর্নিশি॥

অহারিল ৩৫। আহার করল, সংগ্রহ করল॥

অহারিউ ১৯। ঐ। সং. আহারিত॥

অহেরি ৬। শিকার, শিকারী, সং. আখেটিক। প্রাচীন গুজরাটী আহেড়ী॥

আই-অনুঅণা ৪৩। আদিতেই অনুৎপন্ন, আদি+অনুৎপন্ন॥

আইএ ৪১। আদিতে॥

আইল ৩, আইলা ৭। এল॥

আইলেসি ৪৪। এসেছে॥

আইস ২৯, ৪১, ৪২। এমন, ঈদৃশ॥

আগমপোথী ৪১, আগমপোথা ৪১। আগমপুঁথি॥

আগম বেএঁ ২৯। আগমবেদেন। আগম বেদের দ্বারা॥

আগলী ১৮। শ্রেষ্ঠ স্ত্রী॥

আগি ৪৭। অগ্নি>অগ্‌গি>আগি।

আগে ১৫। অগ্রে>অগ্‌গস্মি> অগ্‌গম্হি>অগ্‌গহি> অগ্‌গই>আগে॥

আছহুঁ, আচ্ছহুঁ ৪৪। আছি॥

আজদেব ৩১। আর্যদেব; চর্যাকর্তার নাম। আজদেবেঁ—আর্যদেবেন॥

আণ ৪৪, ৪৬। অন্য॥

আণুত্তু ১৯। শ্রেষ্ঠ, অণুত্তর॥

আদয় (আদঅ) ৫। অদ্বয় দৃষ্টি॥

আলিকালি ১১, ১৭। পারিভাষিক অর্থ নিশ্বাস নেওয়া ও নিশ্বাস ত্যাগ। মৌলিক অর্থে অ-কারাদি ও ক-কারাদি বর্ণমালা। গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব॥

আলিএঁ কালিএঁ ৭। আলিকালির দ্বারা॥

আলাজালা ৪০। জঞ্জাল, তুচ্ছ বস্তু॥

আলে, আলেঁ ৪০। বৃথা॥

আবই, আবয়ি ৪২। আসে॥

আবেশী ৩৩। বেশ্যার প্রণয়ী। সং. আবেশিক। প্রাচীন গুজরাটীতে আইসি॥

আসবমাতা ৯। মদমত্ত॥

আঁসু ২৬। আঁশ, রোঁয়া। সংস্কৃত অংশু থেকে॥

ইন্দি ৪৫, ৩৬। ইন্দ্রিয়॥ তেমনি ইন্দিঅবণ (৩১) ইন্দ্রিয় পবন; ইন্দিআল (৩০) ইন্দ্রিয়জাল; ইন্দিবিসআ (৪৯) ইন্দ্রিয় বিষয়॥

ইন্দ্রতাল ২৪। রাগিণীর নাম॥

ইষ্টা ৪০। ইষ্ট॥

উআরি ১২। কাছারি, সদরমহল।

উআস ৭। উদাস॥

উইআ, উইত্তা ৩০। উদিত॥

উইএ ৩০। উদিত হয়॥

উইজঅ ৪৫। (উইজই) উৎপন্ন হয়। সংস্কৃত উদ্‌বীজয়তি থেকে॥

উএখী ১৬। উপেক্ষিত॥

উএস ১২। উপদেশ॥

উএসই ৪০। উপদেশ দেয়॥

উছলিঅাঁ ১৯। উচ্ছলিত হল॥

উছারা ১৪। পড়ন্ত বেলা॥

উজাঅ ৩৮। উজানে যায়॥

চিথিল ৫। কর্দমাক্ত, সং. চিথিল্ল ॥
চীঅন ৩। চিক্কণ ॥
চীরা ৪। পাগড়ি বা পতাকা তৈরীর কাপড ॥
চেঅণ ৩৬। চেতনা ॥
চেবই ৩৪, ৩৬, ৫০।<চেতয়তি, বুঝতে পারে ॥
ছডগই ৯। ষট্‌গতি ॥
ছন্তে, চ্ছন্তে ৪২। থাকতে ॥
ছাইলী ২৮। ছাওয়া হল ॥
ছান্দক ১। ছন্দের বাসনার ॥
ছিজই ৪৬। ছেদ করা হয় ॥
ছিণালী, চ্ছিণালী ১৮। ভ্রষ্টা, ছলনাময়ী ॥
ছুপই ৬। ছোঁয বা লুকায় ॥
ছেবই ৪৫। ছেদ করে ॥
জই ৫, ২৩, ৪০ ,৪১, ৪৬। যদি ॥
জইসণি (জইসনে) ৩৭। যেমন করে ॥
জইসা ৪০, ৪১। যেরূপ ॥
জউতুকে ১৮। যৌতুকরূপে ॥
জউনা ১৪। যমুনা ॥
জগ ৩৯, ৪১। জগৎ ॥
জথা ৪৪। যেথান থেকে ॥
জম্বু ৪০, জাম্বু ৩০, ৪৩। যাব ॥
জহি ৩১। যেথানে ॥
জাই ২। যায় ॥
জাগঅ ২। জাগে ॥
জাগন্তে ৫০। জেগে থাকতে ॥
জাণমি ৪৯। জানি ॥
জাম [illegible] ২২, ৪৩। জন্ম ॥
যাও ॥
জাহের ২৯। যায় ॥
জিণউর ৭, জিনউরা ১৪। জিনপুর ॥
জিণ-রঅন ৪০। জিনরত্ন ॥
জিতেল ১২। জয় করা হল ॥
জিম ৯, ১৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৪৩। যেমন ॥
জেতই ৪০। যতই ॥
জোই ২২। যে কেউ। সং. যোহপি ॥
জোই ১০, ১৪, ১৯, ২২, ৩০, ৩৭, ৪২। যোগী ॥
জোইনী ২৭। যোগিনী ॥
জোডিঅ ৫। জোডা হল ॥
জোহ্না ৫০। জ্যোৎস্না ॥
ঝাণ-বখানে ৩০। ধ্যানব্যাখ্যানের সাহায্যে ॥
ঝানে ১। ধ্যানের সাহায্যে ॥
টলিআ ৩৫। টলে পডল ॥
টানই ১৮। টানে ॥
টাল ৪০। ভুল, ভুল করে ॥
টালত ৩৩। টিলায ॥
ঠঠা ৪০। ঠাট, আডম্বর ॥
ঠাকুর ১২। রাজা, কর্তা ॥
ঠাবি ৮। স্থান, ঠাঁই ॥
ডমরুলি ৩১। ছোট ডমরু ॥
ডালী ২৮। ডালের স্ত্রীলিঙ্গ ॥
ডাহ ১৭, ৫০। অগ্নিকাণ্ড, দাহ ॥
ণঅণি ২৩। নিযে এল (?) ॥
ণইরামণি ২৮। নৈরাত্মা যোগিনী ॥
ণঠা ৩১, ৩৫, ৪৯। নষ্ট ॥
ণবগুণ ৪৭। নবগুণ ॥
ণাবী ১৩। নৌকা ॥

ণিঅমণে ২৮। নিজ মনে ॥

ণিঅড় ১২। নিকট ॥

ণিবাণে ২৭। নির্বাণের দ্বারা ॥

ণিবারিউ ৩১। নিবারিত ॥

তই ৩৯। তুমি ॥

তইছন ৩৭। তেমন ॥

তইসা ৪৬। ঐ ॥

তই ৪, ১৮। তোমার দ্বারা ॥

তউ ২৬। তবু ॥

তথতা ৯, ৩৬, ৪৪, ৪৬। তথতা, প্রজ্ঞাপারমিত অবস্থা ॥

তন্তে ৩৪। তন্ত্রের সাহায্যে ॥

তরঙ্গতেঁ ৬। লাফ দিয়ে দ্রুতগতির ফলে ॥

তরুঅ ৪৯। তরু ॥

তাএলা ৫০। তখন। সং. তদ্‌বেলা ॥

তান্তিধনি ১৭। তন্ত্রীধ্বনি ॥

তাল ৪। তালা ॥

তাহের ২৯। তার ॥

তাঁবোলা ২৮। তাম্বূল ॥

তিঅড়া (তিঅড্‌ডা) ৪। জঘন ॥

তিঅধাউ ২৮। তিনধাতু। রূপকার্থে কায়, বাক, চিত্ত ॥

তিনি ১৮ (তিনি)। তিনি ॥

তিম ৯, ৪৩। তেমন ॥

তিশরণ ১৩। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ॥

তুটই ৪৬। টুটে যায় ॥

তেতবি ৪০। ততই ॥

তৈলোএ ৩০, ৪২, ৪৩। ত্রিলোকে ॥

তোড়িঅ ৯। ভাঙা হল ॥

থাতী ২১। স্থিতি ॥

থাহা ১৫, থাহী ৫ ॥ গভীরতার শেষ, থই ॥

থির ৩, ৩৮। স্থির ॥

দঙ্গালে ৪৯। দস্যু, বোম্বেটে, ভবঘুরে, নিঃস্ব ॥

দমকুঁ ৯। দমনের জন্য ॥

দশবলরঅণ ৯। বুদ্ধরত্ন ॥

দহদিহ ৩৫। দশদিক ॥

দাঢ়ই ৩৬। দগ্ধ হয় ॥

দাণ্ডী ১৭। ডাঁটি ॥

দাপণ ৩২। দর্পণ ॥

দারী ২৮। গণিকা ॥

দায় ১২। দান ॥

দাহিণ ৫, ১৪, ১৫, ৩২। ডানদিক ॥

দিট ১, ৩, ১১, ৪১। দৃঢ় ॥

দিঢ ১, ৩, ১১, ৪১। দৃঢ। স্ত্রীলিঙ্গে দিঢ়ি (৫) ॥

দিশই ৪৭। দেখা যায় ॥

দুআ ১২। দাবার দুইয়ের চাল ॥

দুআন্তে ৫। দুই দিকে ॥

দুআরত ৩। দুয়ারে ॥

দুখোল ১৪। সৈঁউতি ॥

দুজ্জণ ৩২। দুর্জন ॥

দুঠ্‌ঠ ৩৯ দুষ্ট ॥

দুন্দোলী ৫০। যা খোলা যায় না এমন গ্রন্থি ॥

দুলক্‌খ ৩৪। দুর্লক্ষ্য ॥

দুলি ২। কচ্ছপ ॥

দুহিল ৩৩। দোওয়ানো। [illegible]২ ৪৬। [illegible] চিত্ত ॥

দেউ ৩। প্রদত্ত ॥

দেবক্রী ৪। রাগিণীর নাম ॥

দেশাথ ১০, ৩২। রাগিণীর নাম ॥

দেহ নঅরী ১১। দেহনগরী ॥

দ্বাদশ ভুঅণেঁ ৩৪। দ্বাদশভুবনে ॥

ধনি ৩৩। ধন্য। ১৭ ধ্বনি ॥

ধমণ ১। শ্বাসগ্রহণ, পূরক ॥

ধাম ২২, ১৯। ধর্ম। আবাস ॥

ধামার্থে ৫। ধর্মের জন্যে ॥

নঅবল ১২। নয়বল, দাবাখেলা ॥

নঈ ১৪। নদী ॥

নড়এডা ১০। নটের সজ্জা ॥

নণন্দ ১১। ননদ ॥

নাঅর ১৪। নাগর ॥

নাডিআ ১০। নেড়া বামুন ॥

নাল ৩। নল ॥

নাবী ৮। নৌকা ॥

নাবড়ী ৩৮। ছোট নৌকা ॥

নিঅড়ি ৩২। নিকট ॥

নিঘিণ ১০। নির্ঘৃণ ॥

নিচিত ১। নিশ্চিন্ত ॥

নিবিতা ৯। পরম সুখী ॥

নিবুধী ৩৩। নির্বোধ ॥

নিভর ৫। নিভর ॥

নিরালে ৩১। নিরলম্বে ॥

নিরাসী ২০। হতাশ্বাস ॥

নিলঅ ৬। উদ্দেশ। নিলয় ॥

নিসারা ৩। নিঃসার ॥

নিসি ২১, ৫০। রাত্রি ॥

[illegible] নূপুর ॥

জাণমি ৪[illegible] [illegible] নেব ॥

জাম [illegible] [illegible]৮। মাঝি ॥

[illegible] ১৬ (পইঠা)। প্রবিষ্ট ॥

পইসই ৬, ৭, ১৪, ৩১, ৪৭। প্রবেশ করে ॥

পইসি ৯। প্রবিষ্ট ॥

পথা ৪। পাথা ॥

পঞ্চজনা ২৩। পাঁচজনা। রূপকার্থে পঞ্চেন্দ্রিয় ॥

পটি ৫। পাটি ॥

পড়হ ১৬। পটহ ॥

পড়িবেষী ৩৩। পড়শী ॥

পড়িহাই ৪১। প্রতিভাত হয় ॥

পণালেঁ ২৭। মৃণালের দ্বারা ॥

পতবাল ৩৫। নৌকার পাল ॥

পতিআই ২৯। প্রত্যয় করে ॥

পতিভাসই ৩৫। দেখা যায় ॥

পরহিণ ২৮। পরিহিত ॥

পরিচ্ছিন্না ৭। পরিচ্ছন্ন ॥

পরিমাণ ১। প্রমাণ ॥

পসরিউ ২৩। প্রসারিত হল ॥

পহিল ২০। প্রথম ॥ তেমনি পহিলে = প্রথমে ॥

পঁউআ-খালে ৪৯। পদ্মখালে ॥

পাঅ-পএ ১৪, ৩৪। পাদপদ্মে ॥

পাকেলা ৫০। পাকলো ॥

পাখি ১। পল ॥

পাখুড়ী ১০। পাপড়ি ॥

পাখে ৪৬। পক্ষে ॥

পাণ্ডী ১, পিড়ি ১২, পিহাড়ী ১২। কাঠের আসন, পিঁড়ি ॥

পাণ্ডিআচাএ ৩৬। পণ্ডিতাচার্যেন ॥

পাণ্ডর ১৫। প্রান্তর ॥

পাবত ২৮। পর্বত ॥

পার-উআরেঁ ৩২। পারে উত্তীর্ণ হওয়া। অধিকরণে 'এ' ॥

পারগামি ৫। পারার্থী ॥

পারিম-কুলে ৩৪। অন্য তীরে ॥

পাবিঅই ২৬। পাওয়া যায়।< প্রাপ্যতে>পাঙ্গঅই>পাবিঅই ॥

পাখি ৩৬। পাশে ॥

পিটত ১৪। পীঠে ॥

পিটা ২, ৩৩। দুধ দুইবার কেঁড়ে ॥

পিবই ৬। পান করে।<পিবতি ॥

পিরিচ্ছা ২৯। প্রশ্নের উত্তর ॥

পীচ্ছ ২৮। পুচ্ছ, পালক.॥

পীবমি ৪। পান করি।<পিবামি ॥

পুচ্ছ ৫, ৪১। জিজ্ঞাসা কর (আদেশ) ॥

পুছমি ১০। জিজ্ঞাসা করি ॥

পুচ্ছসি ১৫। জিজ্ঞাসা কর। সাধারণ বর্তমান ॥

পুচ্ছিঅ ১। জিজ্ঞাসা করে। অসমাপিকা ক্রিয়া ॥

পুঞ্চআ ২৮। বাজপাখি (ডঃ সু. সেন) ॥

পুন্ন ৩৫। পুণ্য ॥

পুলিন্দা ১৪। সংস্কৃত পোলিন্দ, অর্থ মাস্তুল। সাংকেতিক অর্থ নপুংসক ॥

পেখ ৩০, ৪৬। দেখ, আদেশ বোঝাতে। সংস্কৃত প্রেক্ষস্ব ॥

পেখমি ৩৮। আমি দেখি ॥

পেস্ম, পেম্ম ২৮। প্রেম ॥

পোহাঅ ১৯, পোহাই ৪৮, ৪৬। রাত পোহালো ॥

পোথী ৪০। পুথি। পুস্তিকা ॥

পোহাইলী ২৮। পোহালো ॥

ফরই ৪২, ফড়িঅ ৪৩। স্ফুরিত হয়। স্ফুরতি>ফরই ॥

ফাড়িঅ ৫। ফাড়া হল। সং. স্ফাটিত ॥

ফিটঅ ২। খুলে যায় ॥

ফিটলেসু ২০। গর্ভমোচন করলাম ॥

ফিটিলি ৫০। দূর হল ॥

ফীটউ ১২। মুক্ত হোক ॥

ফুলিলা ৪১, ৫০। পুষ্পিত হল। ফুল থেকে নামধাতু (?) ॥

ফেড়ই ৩০। দূর করে ॥

বঅণ ৩৯। বচন ॥

বঅণে ৪৫। বচনে ॥

বইঠা ১। উপবিষ্ট ॥

বখানী ২৯, ৩৭। ব্যাখ্যাত ॥

বঙ্ক ৩২। বক্র>বঙ্ক। বাঁকা (পথ) ॥

বঙ্গালী ৪৯। বাঙালী, নিঃস্ব, দুর্গত। সাংকেতিক অর্থ—অদ্বয়জ্ঞান আছে যার ॥

বট ২৬। বাট ॥

বট্টই ৭। থাকে। সং বর্ততে ॥

বড়িআ ১২। দাবার বোড়ে ॥

বড্হিল ৩৩। বেড়ে গেল। সং. বর্ধিত>বড্হিঅ+ইল> বড্হিল ॥

বরগুরু-বঅনে ৪৫। বজ্রগুরুর উপদেশে ॥

বরিসঅ ৯। বর্ষণ করে।<বর্ষতি ॥

বতিস ১৭, ৩৭। বত্রিশ

বলআ ৩৮। বলবান ॥

বলদ্দে ৩৯। বলদের দ্বারা

বলী ৫০। শ্রাদ্ধপিণ্ড ॥
বসই ২৮। বাস করে। <বসতি ॥
বহই ১৪, ২৭। বহে। <বহতি ॥
বহল ২৫, ২৬। বহুল, প্রচুর ॥
বহিবা ১৪। বইতে, বহন করতে ॥
বহুড়ই ৮। প্রত্যাবৃত্ত হয়।
<ব্যাঘুটতি ॥
বহুবিহ ৪১। বহুবিধ ॥
বহুড়ী ২। বধূ ॥
বাক্‌পথাতীত ৩৭, ৪০। বাক্‌পথের অতীত ॥
বাকলঅ ৬। বাকলের দ্বারা ॥
বাখোড় ৯। হাতি বাঁধার থাম ॥
বাজ্জঅ ১৭। বাজে ॥
বাট ৭, ১৫। পথ। <বর্ত্ম ॥
বাণ ২১। বর্ণ ॥
বাণ-মুকা ৪৩। বর্ণমুক্ত ॥
বাণ্ড ৩৭। পুরুষাঙ্গ ॥
বাতাবর্ত্তে ৪১। বাত্যাবর্তের দ্বারা ॥
বান্ধিসুআ ৪১। বন্ধ্যাপুত্র ॥
বাপুড়ী ১০। কাপালিক ॥
বায়ুড়া ২০। লুপ্ত ॥
বারুণী ৩। মদ ॥
বালি ৫০। বালিকা ॥
বাসনয়ুড়া ২০। বাসনাপুট ॥
বাসসি ১৫। অনুভব করো ॥
বাসে ৫০। বাঁশ দিয়ে ॥
বাহবকে ৮। বাইতে ॥
বাহা ১৫। বহনকারী ॥
বাহুড়ই ৮। ফিরে আসে ॥
বাহ্ম ১০। ব্রাহ্মণ ॥

বাঝেঁ ১০। বন্ধ্যা। বাংলা বাঁঝা ॥
বিআঅল ৩৩। প্রসব করলো ॥
বিআণ ২০। প্রসব ॥
বিআতী ২। বিবাহিতা স্ত্রী, অবধূতী ॥
বিআপক ৯। ব্যাপক ॥
বিআর ৩০। বিচার ॥
বিআলী ৪। বিকাল। সাংকেতিক অর্থ কালরহিত ॥
বিকণঅ ১০। বিক্রয় করে। সংস্কৃত বিক্রীণাতি ॥
বিকসিউ ২৭। বিকশিত হল ॥
বিগোআ ২০। বিজ্ঞান ॥
বিচ্ছুরিল ৪৪। বিচূর্ণ হল ॥
বিটলিউ ১৮। অশুচিকৃত ॥
বিণঠা ৪৪। বিনষ্ট ॥
বিদুজণ ১৮। বিদ্বান লোক ॥
বিন্দারঅ ২১। যে বিঁধে দেয় ॥
বিন্দুনাদ ৪৪। বিন্দু ও নাদ ॥
বিমুত্তা ৩৭। বিমুক্ত ॥
বিবাহিআ ১৯। বিয়ে করে ॥
বিম্বাকারে ৩৯। বুদ্‌বুদ্‌ আকারে ॥
বিরমানন্দে ২৭। মহাসুখ তরঙ্গে ॥
বিশেষ ৪৯। পার্থক্য ॥.
বিলসই ১৭, ২৯, ৩৪, ৪২। বিলাস করে ॥
বিহরএ ১১। বিহার করে ॥
বিহাণ ৪৪। বিধান ॥
বিহুণে ১৩। বিনা ॥
বুঝঅ ৩০। বোঝ ॥
বুড়ন্তে ১৬। ডুবতে ডুবতে ॥
বুলই ১৪। ঘুরে বেড়ায় ॥

বেগেঁ ৫। বেগের দ্বারা ॥

বেঙ্গ ৩৩। ব্যাঙ। সাংকেতিক অর্থ বিগত অঙ্গ যার ॥

বেঢ়িল ৬। বেষ্টিত ॥

বেণি ১, ৪, ১৬, ১৭, ১৯। দুই ॥

বেণ্টে ৩৩। বাঁটে ॥

বোলথি ১৫। বলেন ॥

ভইল ১৪। হোল ॥

ভণথি ২০। বলেন ॥

ভতারি ২০। ভর্তা, ভাতার ॥

ভব-উলোলে ৩৮। সংসার-তরঙ্গে ॥

ভব-নিবাণা ২২। সংসার বন্ধন ও মুক্তি ॥

ভমন্তি ২২। ভ্রমণ করে ॥

ভরিতী (ভরিলী) ৮। ভরা, পূর্ণ ॥

ভাঙ্গ তরঙ্গ ৪২। তরঙ্গভঙ্গ ॥

ভাগেলা ৩৯। পলায়িত হল বা ভাঙল ॥

ভাঙ্গীঅ ১০। ভেঙে, ছিঁড়ে ॥

ভাভরিআলী ১৪। ছেনালি ॥

ভূঅঙ্গ ১৮। প্রেমিক, নাগর ॥

ভুঞ্জই ৩৪। ভোগ করে ॥

মঅগল ৯। মদকল ॥

মইলে ৪১। মরলে ॥

মউলিল ২৮। মুকুলিত হোল ॥

মকুঁ ৩৫। আমার ॥

মণ গোঅর ৪০। মনগোচর ॥

মণরঅণ ৪৩। মন-রতন ॥

মন্তেঁ ৩৪। মন্ত্রের দ্বারা ॥

মরিঅই ১। মারা পড়ে ॥

মহামুদেরী ৩৭। মহামুদ্রার ॥

মহাসিদ্ধি ১৫। অষ্ট মহাসিদ্ধি ॥

মাআ ১১। মা, মায়াজাল ॥

মাঙ্গত ৮। নৌকার গলুইয়ে ॥

মাঝেঁ ১৪। মাঝখানে ॥

মাতেল ৫০। মদমত্ত ॥

মাদেসি ১২। (দাবার) মাত কর ॥

মারিহাসি ২৩। মেরো ॥

মুকল ৩২। মুক্ত ॥

মূচ ১৪। মুক্ত করো ॥

মুসা ২১। ইঁদুর ॥

মূঢ়-হিঅহি ৬। মূঢ়ের হৃদয়ে ॥

মেহ ৩০। মেঘ ॥

মেহেরী ১৩। মহিলা-মহল ॥

মোড়িঅ (মোড়িউ) ১৬। ভাঙা হলো ॥

মোলাণ ১০। মৃণাল>মৃণাল>মোলাণ॥

মোহিঅহি ৭। আমার হৃদয়ে ॥

যোইআ ১৪। যোগী ॥

রঅণ ৯। রত্ন ॥

রক্ত ১৯। অনুরক্ত ॥

রসরসাণেরে ২২। রসরসায়নের জন্য ॥

রাআ ৩৪। রাজা>রাচা>রাআ ॥

রাউতু ৪১, ৪৩। রাজপুত্র, অশ্বারোহী যোদ্ধা ॥

রাজই ৩১। বিরাজ করে ॥

রিসঅ ৯। প্রেম করে ॥

রুঅ ৪৯। রূপা ॥

রুখের ২। গাছের। বৃক্ষ>রুক্খ> রুখ ॥

রুন্ধেলা ৭। রোধ করা হল ॥

লকখণ ১৫। লক্ষণ ॥

লড়্ ৪২। দুধের সর ॥

লাঙ্গ ১০। নগ্ন ॥

লেপ ৪। লেপন ॥
লেইঁ ১২। নিই। নাও ॥
লোঅ ৫। লোক ॥
শশহর ২৭। চাঁদ।<শশধর ॥
শাসু ১১। শাশুড়ী। শ্বাস ॥
শাসন ৪৭। ভূমিদান পট্ট ॥
শুণ্ডিনী ৩। শুঁড়ির স্ত্রী ॥
শূণ-মেহেরী ১৩। শূন্যতারূপ মহিলা-মহল ॥
ষবরালী ৫০। শবরগিরি ॥
ষামায় ৩৩। প্রবেশ করে ॥ <সমায়াতি ॥
ষিআলা ৩৩। শেয়াল ॥
ষোহই ৪৬। শোভা পায় ॥
সঅ-সম্বেঅণ ১৫। স্ব-সংবেদন ॥
সঙ্কেলিউ ১৫। সংকেতের সাহায্যে ॥
সংঘারা ২০। সংহার ॥
সনাইড় ২। প্রবিষ্ট ॥
সন্তারে ৩৭। নদী পারাপার কার্যে ॥
সমতাজোএঁ ৪৭। সমতাযোগে ॥
সমতুলা ৫০। সমতুল্য ॥
সমুদে ৩৫, সমুদা ১৫। সমুদ্রে ॥
সংবোহেঁ ২৯। সংবোধে : সংবোধেন ॥
সরুঅ বিআরেঁ ১৫। স্বরূপবিচারে ॥
সসরু ৪১। খরগোশ ॥
সসুরা ২। শ্বশুর ॥
সাঅর ৪২। সাগর ॥
সাঙ্কম, সাঙ্কমত ৫। সাঁকো ॥
সাঙ্গ ১০। সাঙা ॥
সাচ ২৯। সত্য>সাচ্চ>সাচ ॥
সানে ১। ইশারায় ॥
সাদ ১৯। শব্দ ॥
সান্ধে ৩। মদ খেতে ঢোকে ॥
সিঞ্চহ ১৪। সেঁচে ফেল ॥
সিঠি-সংহারা পুলিন্দা ১৩। পাল খাটানোর ও গুটানোর মাস্তল ॥
সিহ ৩৩। সিংহ ॥
সীস ৪০। শিষ্য ॥
সুঅণে ৪৬। স্বপ্নে ॥
সুঘাড়ি ৫০। সুঘটিত ॥
সুচ্ছড়ে ১৪। অনায়াসে ॥
সুজ ৪। সূর্য ॥
সুতেলা ৩৭। শুল ॥
সুন ৪৪। শূন্য ॥
সুনা পান্তর ১৫। শূন্য প্রান্তর ॥
সুনুপাখ ১। শূন্যপক্ষ ॥
সুরঅ ১৯। সুরত ॥
সুহে ৩৬। সুখে ॥
সোণ ৪৯। সুবর্ণ ॥
সোন্তে ৩৮। স্রোতে ॥
স্বমোহেঁ ৩৫। আপনমোহে ॥
হরিআ ৬। হরিণ (সম্বোধনে) ॥
হসই ৫৬। হাসে ॥
হাক ৬। হাঁকডাক ॥
হাঁউ ৩৫। আমি ॥
হিঅহি ৬। হৃদয়ে ॥
হুরুল পারুল ২১। হাঁচড়-পাঁচড় ॥
হিণ্ডই ২৮। ঘুরে বেড়ায় ॥
হেঞে ৫০। হিয়ায় ॥
হোন্তি ২২। হয় ॥
হোহ ৬, হোহি ৪২। হও ॥
হোহিসি ২৩। হয়ো।<ভবিষ্যসি ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা। দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ॥

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—Origin and Development of the Bengali Language। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—Buddhist Mystic Songs। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী—১। Materials for a Critical Edition of the old Bengali Caryapada (A Comparative Study of the text and the Tibetan translation) Part I, Journal of the Department of Letters. Vol XXX, Calcutta University ॥

২। Dohakosa, Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, Calcutta University ॥

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস। আদি পর্ব ॥

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার—মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ ॥

ডঃ সুকুমার সেন— ১। চর্যাগীতিপদাবলী ॥

২। Index Verborum of the old Bengali Carya Songs and fragments, Indian Linguistics, Vol. IX, Calcutta ॥

৩। Old Bengali Texts or Caryagitikosa, Indian Linguistics. Vol. X. Calcutta ॥

৪। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী ॥

মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—History of Bengal (Edited volume), Dacca University ॥

ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সাধনা ॥

—চিন্ময় বঙ্গ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানুষের ধর্ম ॥

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—Obscure Religious Cults ॥

অতীন্দ্র মজুমদার—মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য। ভাষাতত্ত্ব ॥

"নবান্ন"। ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা—চতুর্থ বর্ষ। প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৭ ॥

॥ অতীন্দ্র মজুমদার ॥

॥ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য ॥

। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ । ১১·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা

এটি একটি তথ্যবহুল সুলিখিত গ্রন্থ। এগ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট উপকারে লাগবে এ-কথা অনস্বীকার্য। লেখক পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; আলোচনাগুলি নির্ভরযোগ্য।······

যুগান্তর

সংস্কৃত থেকে পালি ও প্রাকৃতের এবং প্রাকৃত থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়েছে, এটা মোটামুটি জানা কথা। কিন্তু এই ভাষা বিকাশের ধারাটি সহজ করে জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের সামনে মেলে ধরার মতো কোনো সংক্ষিপ্ত বই এতদিন হাতের কাছে ছিল না। অতীন্দ্র মজুমদারের এই বই সেই অভাব সার্থকভাবে দূর করেছে। ······এই বই পড়ে ভালো লাগল এই কারণে যে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে বইএর পরিবেষণও হৃদ্য হয়েছে। লেখক কবি, তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি তাই এমন সরস শুদ্ধ ও সাহিত্যগুণান্বিত হয়েছে।······

দেশ

মধ্যযুগীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখক আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে একদিকে যেমন ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমটি ব্যাখ্যা করেছেন, অপর দিকে তেমনি তির্যক অথচ বলিষ্ঠ মনোভঙ্গির দ্বারা নিষ্ঠাবান গবেষকের মতো ভাষা ও সাহিত্যের পরিণতিকে সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

। ছন্দ ও অলঙ্কার । ২·৫০ ॥

······অতীন্দ্রবাবুর স্বচ্ছ কবিভাষা বইখানায় পঠনস্বাদিষ্ঠতা এনে দিয়েছে।

—পরিচয় ॥

যুক্তি ও আবেগ
বিচার ও বিস্তার
মনন ও হৃদয়ের
দুর্লভ সমন্বয়ে

অতীন্দ্র মজুমদারের

প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি
তথ্যে ও তত্ত্বে যেমন গভীর
সরস ও মধুর রচনাভঙ্গীতে
তেমনি প্রাঞ্জল ॥
বিজ্ঞানীর বুদ্ধি ও কবির হৃদয়
দিয়ে রচনা

চর্যাপদ

প্রয়োজনে ও রসসম্ভোগে
অদ্বিতীয় ॥
প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কবির হাতে
প্রাচীনতম বাংলাকাব্যের
আলোচনা
এই প্রথম ॥